মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

শিক্ষা ও সাহিত্য

Teachers' Journal

VOL. LXXXV NO.9 SEPTEMBER, 2006

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

THE ALL BENGAL TEACHERS ASSOCIATION
UNION IS STRENGTH

শিক্ষা ও সাহিত্য
Teachers' Journal

আশ্বিন, ১৪১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

৮৫তম বর্ষ ঃ নবম সংখ্যা

ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে ; মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। শরীর-মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা। এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানবসংস্রবের জোর তার 'পরে যতটা খাটে এমন আর-কোনো সময়েই নয়।

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শিক্ষা" গ্রন্থের 'ছাত্রসম্ভাষণ' নামক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত]

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

সমিতি কার্যালয় ঃ সত্যপ্রিয় ভবন, পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ ফোন ঃ ২২১৫-৯১৫৮
২২১৫-৮৮৫৬
ফ্যাক্স ঃ ২২১৫-৭৯৩২

সম্পাদক
শ্রীবিকাশ মণ্ডল

যুগ্ম-সম্পাদক
শ্রীমতী অপর্ণা সান্যাল (ব্যানার্জী)

শিক্ষা ও সাহিত্য

সূচিপত্র

Teachers' Journal
CONTENTS

প্রচ্ছদশিল্পী : রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল

সম্পাদকীয়

শিক্ষা আনে চেতনা

মুখপত্রের সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'শিক্ষাবীক্ষা' সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হলো। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাকে এবং দেশের বর্তমান শিক্ষাচিত্রকে দেখা এবং পাঠকের কাছে সেই দেখাকে উপস্থাপিত করার জন্যই এই প্রচেষ্টা। এর সাফল্যের বিচার পাঠককুলের হাতে। শিক্ষার পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে শিক্ষাকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা আমাদের সংগঠনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে শিক্ষা পণ্য নয়, শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। তাই তার সংগ্রাম সকলের জন্য সমমানের শিক্ষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পরিচালিত হয়। শিক্ষার দাবি জাতীয় দাবি, জাতীয় দাবি মানতে হবে — এই হলো সমিতির মূল ধ্বনি। এই ধ্বনিকে সামনে রেখে মহান শিক্ষক ও দার্শনিক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিন তথা 'শিক্ষক দিবস' এবং ৮ই সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস'কে মনে রেখেই সেপ্টেম্বর সংখ্যাকে 'শিক্ষাবীক্ষা' সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

এই মুহূর্তে আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'শিক্ষার অধিকার আইনের খসড়া-২০০৬'। বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় এই সংখ্যায় এ বিষয়ের উপর বিশদ আলোচনা করেছেন। আমরা আশঙ্কিত, এই খসড়া বিল আইনে পরিণত হলে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তথা ভবিষ্যত প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের সমূহ ক্ষতি হবে। সংসদকে এড়িয়ে এই বিলকে আইনে পরিণত করার অপকৌশল নিয়েছে কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার। এর বিরুদ্ধে গোটা দেশের জাগ্রত জনমতকে সংঘবদ্ধ করতে হবে। আমাদের সমিতি STFI-এর নেতৃত্বে এই বিলের বিরুদ্ধে আগামী ২২শে নভেম্বর দিল্লীতে সংসদ অভিযান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে। কেন এই সংসদ অভিযান এ বিষয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদকের একটি লেখা এই সংখ্যায় আছে। প্রাক্তন বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের লেখা — "সর্বজনীন শিক্ষার প্রতি কেন্দ্রের নজিরবিহীন অবজ্ঞা" প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। লেখক বিভিন্ন সূত্র থেকে নানা তথ্য ও সংখ্যাতত্ত্ব উপস্থিত করে সর্বজনীন শিক্ষার প্রতি কেন্দ্রের অবজ্ঞার কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। বোর্ড সভাপতি অধ্যাপক উজ্জ্বল বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত একটি প্রবন্ধ "সর্বশিক্ষা অভিযান ঃ নতুন প্রস্তাবনার স্বরূপ" এই সংখ্যায় যুক্ত আছে। সর্বশিক্ষা অভিযানের সাফল্য কামনায় শ্রীবসু নতুন প্রস্তাব রেখেছেন। কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী চক্রধর মেইকাপ বিদ্যালয় স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্ভাবনা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন 'রাজ্যের বৃত্তিমূলক শিক্ষা একটি নতুন সম্ভাবনা' প্রবন্ধে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রাবন্ধিক দীপঙ্করের আর একটি প্রবন্ধ এই সংখ্যায় সংযোজিত হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন অসিত কুমার ভৌমিক। বেসু'র ছাত্র সৌমিক বসুর মৃত্যু ও ছাত্র-রাজনীতি বিষয়ে লিখেছেন অশোক অধিকারী। 'বিদ্যালয়ে নাট্যচর্চা' শিরোনামে লিখেছেন উত্তম সাহা। হতাশাগ্রস্ত আত্মহত্যাপ্রবণ ছাত্র-ছাত্রীদের মানস সঙ্কটের উপর আলোকপাত করেছেন প্রবীণ শিক্ষক নেতা

বিশ্বরূপ কাঁঠাল তাঁর "বিপন্ন শৈশব — একটি পর্যালোচনা" প্রবন্ধে। শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত এইসব প্রবন্ধাবলী সহযোগে এই 'শিক্ষাবীক্ষা' সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে।

এবছর অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ১লা সেপ্টেম্বর 'বিশ্ব শান্তি দিবস' পালিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সচেতন জনগণের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীরা 'মানব বন্ধন' কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। যুদ্ধবিরোধী এই আন্দোলন কর্মসূচি পালনের সাথে সাথে সদস্যবন্ধুদের কিছু বাড়তি দায়িত্ব বহন করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাদানের সময় যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা উল্লেখ করে সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যুদ্ধবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। একাজ দু-একদিনের নয়, লাগাতার এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৫ই সেপ্টেম্বর সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যে শিক্ষক দিবস পালিত হলো। শিক্ষার পেশায় যুক্ত মানুষ আমরা এই বিশেষ দিনে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা কতখানি আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মানুষ করার কাজে সচেষ্ট আছি। তাদের সঙ্গে আমরা কতখানি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানসম্মত আচার-আচরণ করছি। তাদের যথাযথ জীবনশৈলী শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছি। তাদেরকে কুসংস্কার-মুক্ত করার কাজে আমরা কতখানি উদ্যোগ নিচ্ছি। দেবতাদের দুধ খাওয়া, সমুদ্রের নোনা জল মিষ্টি হওয়া প্রভৃতি ঘটনাগুলোর প্রকৃত কারণ তাদের কাছে ব্যাখ্যা করছি — এক কথায়, ছাত্রছাত্রীদের আমরা কতখানি বিজ্ঞানমনস্ক ও সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারছি সেই মূল্যায়ন আমাদের করতে হবে।

ছাত্র-রাজনীতি নিয়ে একশ্রেণির বুদ্ধিজীবীরা, বাজারী পত্রপত্রিকা জনমানসে ভুলবার্তা পৌঁছে দেবার অপচেষ্টা করছে। ছাত্ররা যদি সমাজ-সচেতন না হয়, রাজনীতি-সচেতন না হয়, ভাল-মন্দ, সাদা-কালো না বোঝে তাহলে তারা কীভাবে ভবিষ্যতে আদর্শ নাগরিক হয়ে উঠবে, দেশের দায়িত্ব কাঁধে নেবে। তাই তাদের মধ্যে দেশ সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করে দেবার দায়িত্ব শিক্ষক সমাজের। দেশ ও সমাজকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার ধারণা ও জ্ঞান অর্জিত হয় স্বচ্ছ রাজনীতি থেকেই। তাই রাজনীতি কখনই সমাজ-বিবর্জিত অপাংক্তেয় বিষয় নয়। স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থেই রাজনীতির গায়ে কালিমা লেপন করছে, রাজনীতির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে হেয় করতে চাইছে। এই অরাজনৈতিক তত্ত্বের অপপ্রচারের চোরাস্রোতের বিপরীতে সঠিক তত্ত্ব ও যুক্তিকে আমাদের দাঁড় করাতে হবে, যথাযথ পথ দেখিয়ে দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের গড়ে তুলতে হবে বহু আকাঙ্ক্ষিত শোষণহীন এবং হিংসাহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে — এ আমাদের সামাজিক দায়িত্ব, একে আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না।

কবি শামসুর রাহমান। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রণী সৈনিক কবি। আমাদের প্রেরণার আধার। তাঁর মৃত্যু বাংলা সাহিত্যে ইন্দ্রপতনতুল্য। অপূরণীয় ক্ষতি হলো বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের। আগ্রাসী মৌলবাদের বিরুদ্ধে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে লড়াই করেছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন — "আমরা যারা মুক্তচিন্তায় নিবেদিত, মনুষ্যত্ব অর্জনকেই জীবনের সাধনা বলে জেনেছি, সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করি...... ।" তাই মৌলবাদ যাতে কাঁটাতারের এপার-ওপার কোনো দেশেই মাথা তুলতে না পারে তারজন্য সম্প্রীতি রক্ষার লাগাতার সংগ্রামই হবে প্রয়াত কবির প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

১০ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬

সমিতির ডাক

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক

গত ১লা সেপ্টেম্বর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে মানববন্ধনে সামিল হয়েছে সমিতির সদস্য-বন্ধুরা। বামফ্রন্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ঐ মানববন্ধন অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে সারারাজ্যে। আজ মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। জর্জ বুশের নেতৃত্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গোটা বিশ্বকে পায়ের নিচে রাখতে চাইছে। লাগাতর প্রচারের মাধ্যমে দেশের সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে শামিল করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মান নিয়ে কোনো কোনো মহলে সংশয়ের উদ্রেক হয়েছে। বাস্তব চিত্র কিন্তু অন্যকথা বলে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মান সংক্রান্ত, জাতীয় শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ-প্রকাশিত একটি পুস্তকে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মান সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে মান উন্নয়নের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান পর্যালোচনা করে তারা বলেছে জাতীয় গড়ের তুলনায় তা উন্নতমানের। একইভাবে পঞ্চম শ্রেণির ক্ষেত্রে তারা বলেছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে পরিবেশ শিক্ষা, গণিত এবং ভাষা বিষয়ে গড় সাফল্য শতাংশহারে যথাক্রমে ৫৮.৬৫ (পঞ্চম স্থান), ৬০.১১ (তৃতীয় স্থান) এবং ৭০.৬৭ (তৃতীয় স্থান) ; যেখানে ভারতের গড় এক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫০.৩০, ৪৬.৫১ এবং ৫৮.৫৭ শতাংশ। অষ্টম শ্রেণির ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান, গণিত, সমাজবিজ্ঞান এবং ভাষা বিষয়ে যথেষ্ট ভাল মানের নজির রেখেছে। এই চার বিষয়ে শতাংশহারে গড় সাফল্য যথাক্রমে ৬৫.৪৮ (প্রথম স্থান), ৫৯.২৬ (দ্বিতীয় স্থান), ৬৬.৮৩ (প্রথম স্থান), ৭৪.৮২ (প্রথম স্থান) ; যেখানে জাতীয় গড় যথাক্রমে ৪০.৫৪, ৩৮.৪৭, ৪৫ এবং ৫২.৪২ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গে ৫০ হাজারের অধিক সম্পূর্ণ সরকারী সাহায্যে পরিচালিত স্কুল রয়েছে। ৫৭ হাজার মৌজার ৩৬ হাজার গ্রামে রয়েছে এই স্কুল। ফলে জনগণের বাস রয়েছে অথচ স্কুল নেই এমন উদাহরণ নেই।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক-ছাত্র আনুপাতিক হার প্রাথমিক স্তরের ক্ষেত্রে ১ ঃ ৪১.১২ এবং উচ্চ প্রাথমিকের ক্ষেত্রে ৪৭.৩৭। এরাজ্যে স্বচ্ছতা বজায় রেখে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এস এস সি'র ভূমিকা এক্ষেত্রে অন্য রাজ্যের কাছেও দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গুণগত শিক্ষাপ্রদানের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করে চলেছে বামফ্রন্ট সরকার। সর্বশিক্ষার মানকে কেন্দ্র করে যেসমস্ত সমীক্ষার কাজ চালানো হয়েছে তার রিপোর্টও উল্লেখযোগ্য। কোনো সমীক্ষাতেই জাতীয় গড়ের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে নেই। এরাজ্যে বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে তিন শতাংশ ছাত্রছাত্রী। এদের শিক্ষার অঙ্গনে আনার কাজও চলছে। একাজে সমিতির সদস্যবন্ধুদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

নব্বই-এর দশকে সাক্ষরতা আন্দোলনের সূত্রপাত। তারপর নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ১৭টি জেলাতে সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান এবং সাক্ষরোত্তর কর্মসূচির কাজ শেষ করে প্রবহমান কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রিসোর্স সেন্টার এবছর এন এল এম ইউনেস্কো পুরস্কার পাচ্ছে। সাক্ষরতার প্রসার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য জাতীয় সাক্ষরতা মিশন এই পুরস্কার দিচ্ছে। সুতরাং নিন্দুকেরা যাই বলুক, বামফ্রন্ট সরকারের জনমুখী শিক্ষানীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রসার ও মান উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবেই এগিয়ে রয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার গত জুন মাসে (২০০৬) সংসদকে না জানিয়ে রাজ্যগুলিকে মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬ পাঠিয়ে দিয়ে সর্বজনীন অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার ভার রাজ্যগুলির ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, কেন্দ্র এই সম্পর্কে আর কোনো আইন তৈরি করবে না। রাজ্যগুলিকেই আইন তৈরি করতে হবে। মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল সেই আইনেরই নির্দেশিকা। অতীতে এরকম

ঘটনা ঘটেনি। শিক্ষাকে রাজ্য তালিকা থেকে যুগ্মতালিকায় নিয়ে গিয়ে এখন শুধু রাজ্যগুলিকেই আইন করতে বলা হচ্ছে। এই বিল সর্বজনীন শিক্ষার প্রতি কেন্দ্রের এই নজীরবিহীন অবজ্ঞার নিদর্শন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রারম্ভিক শিক্ষাবিস্তারের সমস্ত আর্থিক এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব থেকে চতুরালি করে দূরে সরে যাচ্ছে। দেশব্যাপী এর বিরুদ্ধে শিক্ষা আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। জেলায় জেলায় কনভেনশন করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করতে হবে মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬ পুনরায় বিবেচনা করে সংসদে আইন প্রণয়ন করতে। সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের সমস্ত আর্থিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে—এই দাবিতে সোচ্চার হতে হবে।

এস টি এফ আই তার ঘোষিত কর্মসূচিতে বলেছে, আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬-এ ইউ পি এ সরকারের জনবিরোধী-শিক্ষাবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ১৪ই ডিসেম্বরের সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার সংগঠিত করতে। জেলায় জেলায় ঐদিন কনভেনশন ও সমাবেশ করে এই প্রচার-এর কর্মসূচি পালন করতে হবে।

২২শে নভেম্বর, ২০০৬ দিল্লিতে ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে দিল্লিতে সংসদ অভিযানের জন্য সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩রা নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে সমিতির কেন্দ্রীয় সমাবেশ। তার প্রচারপত্র ও পোস্টার শীঘ্রই পাঠানো হবে। বিদ্যালয়গুলিতে এই সমাবেশের বার্তা ছুটির আগেই পৌঁছে দিতে হবে।

আটটি বাম শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনের উদ্যোগে কলকাতায় ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচ্য বিষয় ঃ মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬। এই কর্মসূচির প্রচারপত্র শীঘ্রই পাঠানো হবে।

শারদোৎসব ও ঈদ উৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়ে 'সমিতির ডাক' শেষ করছি।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি জিন্দাবাদ।

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-ছাত্র-অভিভাবক ঐক্য জিন্দাবাদ।

৯.৯.২০০৬

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে

কেন্দ্রীয় সমাবেশ

স্থান ঃ রানি রাসমণি রোড, কলকাতা

তারিখ ঃ ৩রা নভেম্বর, ২০০৬

সময় ঃ বেলা ১টা

বক্তা ঃ মাননীয় পার্থ দে

বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ও সমিতির নেতৃবৃন্দ

এই সমাবেশকে বৃহত্তম সমাবেশে পরিণত করুন

এস টি এফ আই-এর আহ্বানে আগামী ২২শে নভেম্বর সংসদ অভিযানের গুরুত্ব

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিটিউশন, হাওড়া

গত ১১ই জুন, ২০০৬ হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত এস টি এফ আই-এর সম্পাদকমন্ডলীর সভায় ১৫দফা দাবির ভিত্তিতে আগামী ২২শে নভেম্বর দিল্লিতে সংসদ অভিযানের কর্মসূচির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই ১৫দফা দাবি নিয়ে সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা খুবই জরুরী। গত জানুয়ারী মাসে সারাভারত শিক্ষা কনভেনশনে এই ১৫দফা দাবি গৃহীত হয়েছে দু'দিন ব্যাপী আলোচনার পর। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষায় সবার জন্য গুণগতভাবে উন্নত কাঠামো তৈরির জন্য ১৫দফা দাবি নির্দিষ্ট করেছে কনভেনশন। প্রসারিত মঞ্চ গড়ে ১৫দফা দাবির সপক্ষে জনমত তৈরির উদ্দেশ্যে চলবে দেশজুড়ে ব্যাপক প্রচার। এ প্রচার কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এ প্রচার আমজনতার মধ্যেও নিয়ে যেতে হবে। এই কনভেনশনের মূল স্লোগান ছিল ঃ জ্ঞানের প্রসার ও উন্নয়নে সকলে যুক্ত হোক। সকলের জন্য গুণগত দিক থেকে উন্নতমানের শিক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হোক স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্য।

জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত দিল্লির সর্বভারতীয় শিক্ষা কনভেনশনে যে দাবিটি সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে সেটি হলো, একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের দাবি। শিক্ষার সমগ্র সমস্যা জাতীয় শিক্ষা কমিশনে এই মুহূর্তে পর্যালোচনা করার গুরুত্ব সারাদেশেই অনুভূত হচ্ছে। শিক্ষা কমিশন গঠনে কেন্দ্র অবহেলা দেখাতে পারে, কিন্তু পিছু না হটে এই দাবিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য যৌথ আন্দোলন জরুরী। তাই দিল্লিতে সর্বভারতীয় শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এস টি এফ আই, ডি ওয়াই এফ আই, এস এফ আই, এ আই পি এস-এর মতো শিক্ষক-অধ্যাপক-বিজ্ঞান সংগঠনের উদ্যোগে। এস টি এফ আই ২২শে নভেম্বরের সংসদ অভিযানে এই দাবিকে জোরের সঙ্গে তুলে ধরতে চায়।

দেশের জনসংখ্যার ৫৭ শতাংশ মানুষের বয়স ২৫বছরের কম। ভারতের শাসক শ্রেণির কাছে এই মানুষ বোঝা। আর প্রগতিশীল মানুষ মনে করে এরাই এ দেশের সম্পদ হয়ে উঠতে পারে যদি এদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। অর্থাৎ যুবদের এই বিপুল সংখ্যাটাকেই সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ নিতে হবে। রাষ্ট্রকে মানব সম্পদের উন্নয়ন না ঘটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেই কারণে ঐ যৌথ শিক্ষা কনভেনশনে সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে শিক্ষায় ব্যয়টা অপচয় নয়, বরং বিনিয়োগ। একুশ শতকের দাবি মেনে দেশ গড়ার পূর্বশর্ত। তাই গণশিক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতেই হবে। সকলের জন্য সমমানের শিক্ষার দাবিতে জাতীয় দাবি হিসাবে তুলে ধরতে হবে। স্বাধীনতার পর ভূস্বামী ও বড় বুর্জোয়াদের প্রতিভূ কংগ্রেস দল গণশিক্ষার দায়িত্ব পালন করেনি। বরং 'উৎকর্ষ কেন্দ্র' গড়ার নামে শিক্ষার সংকোচনের প্রস্তাব করেছিল প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সরকার। বারে বারে শিক্ষায় ব্যয় কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারও 'গণশিক্ষা'র জন্য আন্তরিকতা না দেখিয়ে নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নিচ্ছে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের দাবিতেই সংসদ অভিযান।

উল্লেখ্য, জানুয়ারীর সর্বভারতীয় শিক্ষা কনভেনশন থেকে সব সংগঠনের নেতাদের নিয়ে ১৫জনের কমিটি গঠিত হয়েছে। ঐ সমন্বয় কমিটিতে এস টি এফ আই-এর সাধারণ সম্পাদক কে রাজেন্দ্রন এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ কে চন্দ্রন প্রতিনিধিত্ব করছেন। আজ স্কুল টিচার্স ফেডারেশন অফ্ ইণ্ডিয়া সর্বভারতীয় শিক্ষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনে পরিণত হচ্ছে

দেশে শিক্ষার হাল

আমরা জানি, পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন এবং উদার আর্থিক নীতির আক্রমণের চরিত্র আন্তর্জাতিক। বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কোনো দায়বদ্ধতা নেই কোনো দেশের মানুষের প্রতি। নিজেদের স্বার্থেই তারা আক্রমণ করছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে। একই সঙ্গে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিরোধ আন্দোলনও চলছে। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এখন তীব্র সংকট। তাই সেই সংকট কাটাতে তারা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা গঠন করেছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার উদ্যোগে বর্তমানে পৃথিবীটাই পরিণত হয়েছে একটা বাজারে। বিভিন্ন দেশের শুল্ক প্রাচীর তুলে দিয়ে অর্থনৈতিক সীমানা ভেঙে ফেলা হয়েছে। এতে লাভবান হয়েছে সেই দেশগুলি যারা অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী। বিশ্বায়নী ফাঁদে পড়ে 'শিক্ষা'টা আজ বাজারী পণ্যে পরিণত হয়েছে। গ্যাটস্ (জেনারেল এগ্রিমেন্ট ইন ট্রেড ইন সারভিসেস) চুক্তিতে স্বাক্ষর করে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাকে পণ্য বলেই গণ্য করছেন। তাই দ্রুত ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ চান তাঁরা।

তাঁরা ভুলে গেছেন যে সুস্থ সমাজগঠন, সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন সাধনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার এই মৌলিক গুরুত্ব বিবেচনা করেই ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার ঘোষণায় বলা হয়েছিল, শিক্ষাকে সব মানুষের অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই বিশ্ব ঘোষণাপত্রের ২৬নং ধারার প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ Every one has the right to education। এই ১৯৪৮ সালেই স্বাধীন ভারতে বি জি খের-এর নেতৃত্বে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আর্থিক দায়িত্ব বন্টনের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠিত হয়। কমিটি কেন্দ্রীয় মোট ব্যয়-বরাদ্দের ১০ শতাংশ এবং রাজ্যগুলির ব্যয়-বরাদ্দের ২০ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করার সুপারিশ করেছিল। ১৯৫২ সালে নিযুক্ত হয় মুদালিয়র কমিটি এবং ১৯৬৪ সালে গঠিত হয় কোঠারি কমিশন। উভয় কমিশন তাদের মূল্যবান সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করে। ১৯৬৮ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে হতাশব্যঞ্জক অগ্রগতি দূর করে তাকে আরও গতিশীল করার সঙ্কল্প নেওয়া হয়। ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করে বলা হয়, ২০০০ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা হবে। অনেক ভাল ভাল কথা বলা হয়েছে এইসব কমিশনের রিপোর্টে। অনেক মুল্যবান প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হায়! রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে, গরিব মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার অভাবে এদেশে এখনও শিক্ষার সীমাহীন দুঃখজনক পশ্চাদ্পদতার অবসান হলো না।

ভারতে শিক্ষার বর্তমান হাল বর্ণনা করতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপিকা জয়তী ঘোষ সম্প্রতি লিখেছেন ঃ

"Even today, the official gross enrolment ratios for children aged between 6 and 14 is around 80 per cent and effective enrolment is much less. Currently only 56 per cent of children aged between five and nine are attending school according to Census data."

"More tellingly, dropout rates are very high : less than half of the children who join class I actually complete class VIII, and much less than 10 per cent pass the higher secondary examination. The situation is even worse because of social and economic divisions, which reduce access. For example, more than 80 per cent of Scheduled Caste girls and 90 per cent of Scheduled Tribe girls who join class I do not complete class X."

(সাম্প্রতিক জনগণনা অনুযায়ী ৬-১৪ বছরের ৮০ শতাংশ ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে পড়তে আসছে ঠিকই তবে বাস্তবে এটা আরও কম। আর ৫-৯ বছরের ছেলেমেয়ের মাত্র ৫৬ শতাংশ বিদ্যালয়ে পড়তে আসছে।

'বিদ্যালয়-ছুট'দের হার ভয়াবহভাবে উচ্চ। যে সব ছেলেমেয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হচ্ছে তাদের কেবল ৫০ শতাংশ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ছে এবং মাত্র ১০ শতাংশ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের কারণেই বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আসতে পারছে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ৮০ শতাংশের বেশি তফসিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত বালিকা এবং ৯০ শতাংশ তফসিলি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত বালিকা প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হলেও দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করতে সমর্থ হচ্ছে না।)

রাষ্ট্রসংঘের ২০০৫ সালের মানবোন্নয়ন রিপোর্টে ভারত সম্পর্কে কড়া মন্তব্য করে বলা হয়েছে, ভারত হয়তো কম্পিউটার সফ্টওয়্যার পরিষেবায় বিশ্বে অন্যতম অগ্রগণ্য দেশ হতে পারে, কিন্তু সবার জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে না পারলে শেষ পর্যন্ত তা বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের সম্ভাবনার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করবে।

ভারতের বর্তমান শাসক শ্রেণির কর্ণকুহরে এ সতর্কবাণী প্রবেশ করেনি। ২০০৪ সালের হিসাব অনুযায়ী চীনে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার হলো যথাক্রমে ৯৫.১৪ শতাংশ এবং ৮৬.৫৩ শতাংশ। সেক্ষেত্রের ভারতে এই হার হলো যথাক্রমে ৭৩.৮১ শতাংশ ও ৪৭.৮৪ শতাংশ।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন প্ল্যানিং অ্যাণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেশের বিদ্যালয় শিক্ষার যে বেহাল ছবি ফুটে উঠেছে তা যথেষ্ট নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক এবং লজ্জাজনক। যেমন ঐ সমীক্ষায় বলা হয়েছে, গোটা দেশে প্রায় ৪২ হাজার সরকারী স্কুলের কোনো নিজস্ব ভবন নেই। লক্ষাধিক স্কুলের রয়েছে মাত্র ১টি করে শ্রেণিকক্ষ। তাছাড়া বেশির ভাগ স্কুলেই মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অবিশ্বাস্য পরিমাণে অভাব রয়েছে। দেশে যত শ্রেণিকক্ষ আছে সেগুলির মধ্যে মাত্র ৬৫.৫৬ শতাংশ রয়েছে ভালো অবস্থায়। বাকিগুলির এখনই মেরামত জরুরী হয়ে পড়েছে। পানীয় জল, শৌচাগার, ব্ল্যাক বোর্ড, আসবাবপত্র ইত্যাদির ভীষণ অভাব। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গ্রামের গরিব পরিবারগুলি।

শ্রেণিকক্ষগুলি যদি সঠিকভাবে মেরামত এই মুহূর্তে না করা যায় তবে সেগুলি যে কোনো অবস্থায় ২০০৪ সালের কুম্ভকোণমের ট্র্যাজেডির রূপ নিতে পারে। সেখানে স্কুলে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছিল ৯৪ জন শিশু।

কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার যদি প্রকৃত অর্থে সবার জন্য শিক্ষার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে চায় তাহলে উপযুক্ত বিদ্যালয় কাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির ওপর যথেষ্ট নজরদারী রাখতে হবে।

সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো এই যে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করা হয়নি। ধারাবাহিক শিক্ষা আন্দোলন ও গণআন্দোলনের চাপে বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ২০০১ সালে সংবিধানের ৮৬তম সংশোধনের মাধ্যমে প্রারম্ভিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের তালিকায় নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু ০-৬ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর দায়টিকে মৌলিক অধিকারের দায় থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সুকৌশলে। অথচ রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে বলা হয়েছিল 'আগামী দশ বছরের মধ্যে' অর্থাৎ ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সব বালক-বালিকার জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র সবরকম চেষ্টা করবে।

সংবিধানে শিক্ষার অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে ঠিকই একে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন এখনও সংসদে পাশ করা হয়নি। ইতোপূর্বে সুপ্রিম কোর্ট উন্নিকৃষ্ণাণ বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ মামলায় ১৯৯৩ সালে শিক্ষা পাওয়ার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য করার যে আদেশ দিয়েছিলেন সে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হয়। আগেই বলা হয়েছে, শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য গণআন্দোলন ও শিক্ষা আন্দোলনের চাপ ছিলই। এখন তারসঙ্গে যুক্ত হলো সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ। এরপর শুরু হলো সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার কর্মসূচি কার্যকরী করার জন্য খরচের হিসাব নিকাশ। এরজন্য প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ তাপস মজুমদারের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার আরো একটি কমিটি নিয়োগ করে। কমিটি ১৯৯৯ সালে তার প্রতিবেদনে ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে ২০০৭-২০০৮ সাল সময়ের মধ্যে সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার কর্মসূচি কার্যকরী করার জন্য ১,৩৬,৯৯২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার জন্য সুপারিশ করে। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান ভূমিকার কথা বলা হয় এবং শিক্ষা সেস ধার্য করে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে সুপারিশ করা হয়।

কেন্দ্রের বি জে পি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার ফ্রি অ্যান্ড কমপালসরি এডুকেশন বিল, ২০০৩ তৈরি করে। ঐ বিলে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বজনীন শিক্ষার জন্য রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য দিতে অস্বীকার করে। কেবল ৬-১৪ বছর বয়সের শিশুদের সর্বজনীন শিক্ষা দেওয়ার কথা বলে। প্রয়োজনে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়ার অধিকার ঐ বিলে কেন্দ্রের হাতে দেওয়ার কথা বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আহ্বানে দিল্লিতে অ-বি জে পি শাসিত রাজ্যগুলির শিক্ষামন্ত্রীদের এক কনভেনশনে কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ উদ্যোগের বিরোধিতা করা হয়।

এরপর কিছুটা সংশোধন করে কেন্দ্রীয় সরকার ফ্রি অ্যান্ড কমপালসরি এডুকেশন বিল, ২০০৪ প্রকাশ করে। বি জে পি জোট সরকার অনুসৃত উদার অর্থনীতি ও শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ নীতির বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে জনগণ সাধারণ নির্বাচনে বি জে পি জোট সরকারের পতন ঘটায়।

কেন্দ্রে ইউ পি এ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এন ডি এ সরকার কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ বন্ধ করে দিয়েছিল। ইউ পি এ সরকার সেটা পুনরুজ্জীবিত করে। ঐ পর্ষদ থেকে

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল সিবাল-এর নেতৃত্বে অবৈতনিক সর্বজনীন আবশ্যিক প্রারম্ভিক শিক্ষা আইনের খসড়া তৈরি করতে কমিটি নিয়োগ করা হয়। কমিটির তৈরি খসড়ায় ৬ বছর বয়সের কম শিশুদের শিক্ষা, শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের কর্তব্যের কথা এবং রাজ্যগুলির সাথে আলোচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক দায়িত্ব ঠিক করার সংস্থান রাখা হয়। পূর্বের খসড়ায় আর কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কথা বলা হয়নি।

প্রস্তাবের সাথে একটি অভিমত পত্রে উল্লেখ করা হয়, ২০০৬ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ১৪ বছর পর্যন্ত সকলকে শিক্ষার আঙিনায় আনা এবং ধরে রাখার জন্য ৩,২১,১৯৬ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের সভায় ঐ খসড়া আইন অনুমোদিত হয়।

এল শিক্ষার অধিকার বিল, ২০০৫

এই বিলে সাধারণ বিদ্যালয় ব্যবস্থা (Common School System) স্থাপনের কী উদ্যোগ নেওয়া হবে সে ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য নেই।

শিক্ষার অধিকার বিল, ২০০৫-এর পরিধি শুধুমাত্র সরকারী বা সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি পর্যন্তই। বিশেষ বিদ্যালয় যেমন, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিদ্যালয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু পরিচালিত বিদ্যালয়ের ওপর এই বিলকে কার্যকারিতা থাকবে না। এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়া যায় না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, অন্যান্য বিদ্যালয়গুলি যেখানে ৬-১৪ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে বাধ্য থাকবে, সেখানে এই বিশেষ শ্রেণির বিদ্যালয়গুলিতে এই হার হলো ২৫ শতাংশ। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত বিদ্যালয়ে মাসিক ছাত্রবেতন ব্যবস্থা চালু আছে, সেইসব বিদ্যালয়ে এই ২৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর জন্য যে ব্যয় হবে, তা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার মিটিয়ে দেবে। এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সরকারী সহায়তায় 'বিদ্যাব্যবসা' বেশ জাঁকিয়ে বসবে।

এই বিলে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির হাতে শিক্ষকদের শাস্তি দেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যে শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে সেই শিক্ষককে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হবে না। কোর্টেও যেতে পারবেন না।

এই বিলে অদ্ভুত সব বিধান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি কোনো পিতামাতা বা অভিভাবক তাঁদের শিশুকে বিদ্যালয়ে না পাঠায় তবে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি সেই পিতামাতা বা অভিভাবকদের সমাজের কোন কাজে (কম্যুনিটি সারভিস) নিযুক্ত করে শাস্তি দেবে। সেই কাজটি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তা হলো শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ।

কোনো ব্যক্তি কোন শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা পাবার সুযোগে বাধা সৃষ্টি করলে শাস্তি পাবে। কী সেই শাস্তি? তাকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। তারপরেও যদি সে একই অপরাধ করে তবে প্রতিদিন পাঁচশত টাকা করে জরিমানা দিতে হবে।

কী তুঘলকি কাণ্ড! যে দেশে কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্য-সীমার নিচে বসবাস করছে; উদারনীতির কোপে পড়ে কৃষক যেখানে বিদেশী বীজ ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে এবং সেই বীজ ব্যবহারের ফলে ক্ষেতের ফসল ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় হাজার হাজার টাকা দেনা করে এই বীজ চাষ করতে গিয়ে শেষে মহাজনের কাছে দেনার দায়ে হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করছে সেই দেশে গরিব মানুষকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য এই হৃদয়হীন নির্দয় বিধান!

দু'হাজার ছয় সালের কেবল আগস্ট মাসে মহারাষ্ট্রে আত্মঘাতী হয়েছেন ১০৫ জন কৃষক। বিদর্ভ জন আন্দোলন সমিতি আত্মঘাতী কৃষকদের নথি রাখে। সমিতি এই তথ্য প্রকাশ করে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বিদর্ভ সফরে এসে প্যাকেজ ঘোষণার পর মৃত্যুর হার আরও বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সফরের পর ২রা জুলাই থেকে ২১৬ জন আত্মঘাতী হয়েছেন। চলতি বছরে বিদর্ভে ৭৭০-র বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। কীটনাশক খেয়েই মৃত্যুর সংখ্যা সর্বাধিক। সর্বশেষ তথ্য বলছে, প্রতি আট ঘন্টায় একজন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। বিদর্ভের তুলো চাষীরাই এই সংকটের মধ্যে। প্রধানমন্ত্রী বিদর্ভের ছয় জেলায় ৩৭০০ কোটি টাকা প্যাকেজ ঘোষণার পরও আত্মহত্যা ঠেকানো যায়নি। বিদর্ভের কৃষি সংকট সম্পর্কে তথ্যভিজ্ঞ বিশিষ্ট সাংবাদিক পি সাইনাথ বলেছেন : আসলে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কেউই এই সঙ্কটের একটি আসল কারণেও স্পর্শ করছে না। তুলোর দাম, ঋণ মকুব, ডাম্পিং আটকাতে শুল্ক কোনোটাতেই তারা হাত দেয়নি। রাজ্য সরকার এখন ভণিতা করছে যেন তারা এই আত্মহত্যার কারণ তারা কিছুই বুঝতে পারছে না।

তুলো চাষীরা ফসলের দাম পাচ্ছেন না। উদারনীতির পরিণতিতে গত পাঁচ বছরে ভারতে তুলোর দাম টন প্রতি ২৭হাজার টাকা থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১৭হাজার টাকা। বিদ্যুৎ, সারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ভরতুকি হ্রাস করায় দাম বেড়েছে দ্বিগুণ হারে। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কৃষকদের ঋণ দিতে অনাগ্রহী। প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্যাকেজ ঘোষণার সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ঋণ ছাড় দেননি, কেবলমাত্র ঋণের সুদ মকুব করেছিলেন। পরিণতিতে বিদর্ভের গ্রামাঞ্চলে ৬০ থেকে ১২০ শতাংশ সুদে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া অবাধে চলেছে।

একদিকে ইউ পি এ সরকার উদারনীতি অনুসরণ করে গরিব শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন, অন্যদিকে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মেরে বলছেন শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগে বাধা দিলে পিতামাতা/অভিভাবককে শাস্তি দেওয়া হবে। হায়! হায়!

প্রকৃতপক্ষে, সংবিধানে শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও সমাজের অন্য আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলির সুষ্ঠু সমাধান না হলে সর্বজনীন শিক্ষাকে সফল করা যায় না।

এন সি ই আর টি তার দলিলে এ বিষয়ে একটি অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন ঃ কথাটি এই —

" If 'free' education is understood as removal of constraints to education, then we must realise the importance of other sectors of the states social policy for supporting and facilitating the achievement of Universal Elementary Education".

বর্তমান উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়নের পটভূমিতে এই উক্তির গভীর তাৎপর্য বিদ্যমান। আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যে নীতিগুলির ফলে দারিদ্র্য বাড়ছে, বৈষম্য বাড়ছে, সেগুলিকে বহাল রেখে সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন অলীক কল্পনা!

মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬

এই যখন পরিস্থিতি তখন অকস্মাৎ ইউ পি এ সরকার চুপি চুপি সংসদে কোনো আলোচনা না করে রাজ্যে রাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন 'মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬'।

এই বিলটি জুন, ২০০৬-এ প্রস্তাবিত হয়েছে।

এই প্রস্তাবের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাসচিব চম্পক চ্যাটার্জীর একটি পত্র যুক্ত করা হয়েছে। ঐ পত্রে শ্রীচ্যাটার্জী বলেছেন ঃ

Instead of a Central legislation, a Model Right to Education Bill should be formulased and circulased as a framework for states to adopt the same by enacting new legislation if they do not have any or modifying suitably where necessary, their Act if they have already one.

অর্থাৎ কেন্দ্র এই সম্পর্কে আর কোনো আইন তৈরি করবে না। রাজ্যগুলিকেই আইন তৈরি করতে হবে। সেই আইনের একটি নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে। সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তার কোনো কথাই বলা হয়নি। উপরন্তু রাজ্যগুলিকে বলা হয়েছে রাজ্য বাজেটে ব্যয়ের প্রধান এবং প্রথম খাত হবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দ্বিতীয় প্রধান খাত হবে শিক্ষা। (The draft Model Bill on Right to Education, 2006 proposes that the first charge on the revenues of a State, next only to law and order, shall be that of matters related to free and compulsory elementary education.)

উল্লেখ করা যেতে পারে, বর্তমানে রাজ্যগুলি তার বাৎসরিক ব্যয়-বরাদ্দের ১২ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ ধার্য করে শিক্ষার জন্য আর কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান আর্থিক বছরে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করেছে তার মোট ব্যয়-বরাদ্দের ৪.৩ শতাংশ। সুতরাং রাজ্যগুলো তাদের নানা আর্থিক ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সাধ্যমতো ব্যয় করে চলেছে শিক্ষার জন্য। তাহলে রাজ্যগুলোকে কেন এই উপদেশামৃত পান করাতে চাইছে? উদ্দেশ্যটা কী?

শিক্ষাটা তো ছিল রাজ্য তালিকাতেই। কেন তাকে যুগ্ম তালিকায় নিয়ে যাওয়া হলো? শুধু খবরদারি করার জন্য?

চম্পক চ্যাটার্জীর পত্রে বলা হয়েছে ঃ

" Funding under Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) be made contingent upon enactment of appropriate State Acts on free and compulsory education where none exists, or suitable adaptation of the existing Acts, States, which adopt the Model Right to Education Bill, 2006 in toto, by adopting their existing Act suitably or enacting new legislation, should

continue to be provided funding under SSA on 75:25 basis (90:10 in case of North Eastern States and Jammu & Kashmir) during the 11th Five year plan also. States, which fail to do so, could however be entitled to funds under SSA on a 50:50 basis only in accordance with the MOU signed with the Central government."

অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার বলতে চাইছে যে রাজ্য কেন্দ্রের বর্তমান প্রস্তাব পুরোপুরি মেনে নেবে সেই রাজ্য একাদশ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্প বাবদ অনুমোদিত ব্যয়ের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাবে এবং যে রাজ্য অক্ষরে অক্ষরে কেন্দ্রীয় প্রস্তাব মেনে নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তারা ঐ প্রকল্প বাবদ অনুমোদিত ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ পাবে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে। বোঝাই যাচ্ছে, Right to Education Bill, 2004 এবং Right to Education Bill, 2005-এর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে যাবার পর কেন্দ্রীয় সরকার এখন Carrot & Stick Policy অনুসরণ করছে। তারা তাদের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ ভারটা সুকৌশলে রাজ্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। বি জে পি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত করেছে আর ইউ পি এ সরকার শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকায় রেখে দিয়েও তার শিক্ষার প্রতি সাংবিধানিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করছে। দেশব্যাপী এর বিরুদ্ধে শিক্ষা আন্দোলনকে সংগঠিত করতে হবে। সমগ্র জাতির স্বার্থে এই আন্দোলন জরুরী। সংসদ অভিযান এই আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই বিলে Responsibility of the State বলে একটি আছে কিন্তু Responsibility of the Central govt.-এর কোনো উল্লেখ নেই। অথচ শিক্ষাটা যুগ্ম তালিকায়।

কপিল সিবাল কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০৫-০৬ বছরে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের ১ কোটি ৭৯ লক্ষ শিশু এবং ১১ থেকে ১৩ বছর বয়সের ২ কোটি ৭৪ লক্ষ শিশু মোট ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ শিশু শিক্ষার অঙ্গনের সম্পূর্ণভাবে বাইরে রয়ে গেছে। ঐ রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, ২০১১-১২ বছরের মধ্যে সারা দেশে ৬-১৩ বছরের শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ২ কোটি ৭২ লক্ষ। এদেরও বিদ্যালয়ে আনতে হবে। এর আর্থিক দায়িত্ব কি শুধু রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে বহন করা সম্ভব ? তাই Model Right to Education Bill, 2006 পুনর্বিবেচনা করতে হবে। এ বিষয়ে উপযুক্ত আইন কেন্দ্রীয় সরকারকেই প্রণয়ন করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার অতি শৈশবকালীন অবস্থায় শিশুর যত্ন ও শিক্ষা পাওয়ার অধিকারকে সর্বজনীন করতে অনাগ্রহী। তাই এই দাবিটি ১৫ দফায় স্থান পেয়েছে। দাবি রাখা হয়েছে প্রচলিত অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাকে উন্নীত করতে হবে। যেখানে এই ব্যবস্থা চালু নেই সেখানে চালু করতে হবে। সুনিশ্চিত করতে হবে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে।

National Curriculum Framework (NCF),2005-এর রচয়িতারা শুধু স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য পাঠক্রম রচনা করেছেন। হতদরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের কথা ভাবা হয়নি। অথচ তাদের জন্য সাধারণ বিদ্যালয় (Common School) প্রতিষ্ঠার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিল Kothari Commission. NCF-এর ১৩ নম্বর মাথায় শুধু এর উল্লেখ আছে। এইভাবে ঃ

" We urgently need to take steps for realising goal that Kothari Commission has placed before us by recommending a system of common schools which would serve all children in the neighbourhood irrespective of their social origins and economic backgrounds." (NCF, 2005, p-13) সেই কারণে ১৫ দফা দাবির অন্যতম দাবি হলো ঃ সাধারণের বিদ্যালয় ব্যবস্থা (Common School System)-কে প্রসারিত করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। প্রতি এক কিলোমিটারের মধ্যে দেশে একটি করে রাষ্ট্রীয় খরচায় এমন বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে যার শিক্ষাদানের মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। সাম্প্রতিককালে লগ্নীপুঁজির স্বার্থরক্ষায় কেবল ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা লাভের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এটা বেদনাদায়ক ! তাই দাবিতে মাতৃভাষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা সেস বসিয়েছে ইউ পি এ সরকার। বছরে ১০ হাজার কোটি টাকা শিক্ষা সেস বাবদ অর্থ সংগৃহীত হচ্ছে। তাই দাবি করা হচ্ছে শিক্ষা সেস থেকে প্রাপ্ত অর্থের সবটাই রাষ্ট্রীয় খরচায় গড়ে ওঠা বিদ্যালয়গুলির জন্য খরচা করতে হবে।

সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচিতে ইউ পি এ সরকার ঘোষণা করেছিল যে জি ডি পি'র ৬ শতাংশ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হবে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান আর্থিক বছরে তার মোট ব্যয়-বরাদ্দের মাত্র ৪.৩ শতাংশ বরাদ্দ করেছে। তাই সর্বজনীন শিক্ষার প্রতি এই অবহেলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারকে জি ডি পি'র ৬ শতাংশ ব্যয় করতে বাধ্য করতে হবে।

গ্যাটস্ চুক্তিতে ভারত সরকার স্বাক্ষর করার ফলে শিক্ষা এখন পণ্যে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ ক্রমশ বাড়ছে। বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি 'শিক্ষা-পণ্য' বেচে মুনাফা লাভ করতে আসছে। শিক্ষার লক্ষ্য যে 'মানুষ' তৈরি করা, শিক্ষকরা যে মানুষ গড়ার কারিগর এ চেতনা বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির থাকতে পারে না। তাই দাবি করা হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বিদেশী অর্থ বিনিয়োগ করা চলবে না। শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে। শিক্ষাকে গ্যাটস্ চুক্তির আওতায় রাখা চলবে না। প্রাথমিকভাবে ভারত সরকার যে গ্যাটস্ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তা প্রত্যাহার করতে হবে।

সারাভারতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার অধ্যাপকের পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। সেইসব শূন্যপদ পূরণ না করে চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে হায়ার অ্যাণ্ড ফায়ার নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। নিয়মিত পূর্ণসময়ের শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। এর একটাই উদ্দেশ্য নিয়মিত পূর্ণসময়ের শিক্ষকদের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে শিক্ষকদের দরকষাকষির ক্ষমতা (bargaining power) কমিয়ে দেওয়া। বিশ্বায়নের লক্ষ্য সফল করতেই এ কাজ করা হচ্ছে। বিশ্বায়ন চায় ট্রেড ইউনিয়নমুক্ত বিশ্ব।

তাই ২২শে নভেম্বরের সংসদ অভিযানের দাবিপত্রে বলা হয়েছে, নিয়মিত পূর্ণসময়ের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করতে হবে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বিলুপ্ত করতে হবে।

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিতে দেশের শ্রমজীবী ও দরিদ্র মানুষের স্বার্থরক্ষায় যেসব কাজ করার কথা ঘোষণা করেছিল তারথেকে সরে গিয়ে নয়া উদার অর্থনীতির পথেই অগ্রসর হচ্ছে। সংস্কার নীতি প্রয়োগের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ দরিদ্র মানুষ ও শ্রমজীবী জনগণ। এটা তাঁরা খেয়ালই করছেন না, ধনীদের স্বার্থরক্ষার দিকেই তাঁরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। আর্থিক সংকটের বোঝা চাপাচ্ছেন সাধারণ মানুষের ওপর। খাদ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি জনজীবনকে বিপর্যস্ত করছে। সরকার নিজেই রেশনের জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে। পেট্রোল-ডিজেলের পাঁচদফা মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করেছে। পেট্রোপণ্যের করকাঠামো পুনর্বিন্যাসের বাস্তবসম্মত প্রস্তাবকে অবহেলা করা হয়েছে। সরকার গণবন্টন ব্যবস্থায় অর্থবরাদ্দ কমিয়েছে। খাদ্যশস্য সংগ্রহের কাজও যথাযথ দ্রুততার সঙ্গে সঠিকভাবে করা হয়নি। ফলে মজুতদারী ক্রমবর্ধমান। এখন সরকার অনেক টাকা খরচা করে গম আমদানি করছে, মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে কেন্দ্রের সরকারের ভুল নীতি ও কার্যক্রমের ফলেই। নয়া উদার অর্থনীতির প্রভাবেই কৃষিক্ষেত্রের সংকট আজ চরমে পৌঁছেছে। কৃষিতে সরকারী বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে হ্রাসমান। সেচব্যবস্থার প্রসারে বরাদ্দ করা হয়েছে সামান্য টাকা। বন্যা নিয়ন্ত্রণেও ব্যর্থ এই সরকার। কৃষি সরঞ্জাম-সার-বীজ প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধি ও ফসলের ন্যায্য দাম না পাবার ফলে হাজার হাজার কৃষকের ঋণগ্রস্ততা ও দারিদ্র্য বাড়ছে। বাড়ছে অনাহার ও আত্মহত্যার ঘটনা।

ভূমিসংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেয়নি ইউ পি এ সরকার। পরন্তু চুক্তিপ্রথায় চাষ, ১০০ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগ সহ কর্পোরেট প্রথায় চাষ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ না দেবার ঘটনাও প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। এরই সাথে চলছে বেসরকারীকরণ, আউট সোর্সিং, ঠিকাকর্মী নিয়োগ। এর ফলে সরকারী-বেসরকারী ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সঙ্কুচিত হচ্ছে, কমছে শ্রমজীবী মানুষের আয়।

অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিতে বিলগ্নীকরণ করা হবে না ঘোষণা করা হলেও লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শেয়ার বিক্রি করে বেসরকারীকরণের পথ প্রশস্ত করে চলেছে ইউ পি এ সরকার। ব্যাঙ্ক, বিমানবন্দর, বীমা ও টেলিকম ক্ষেত্রে বিদেশী লগ্নীবৃদ্ধির পথ হতে সরকারকে সরানো যায়নি। বিদেশী লগ্নীকারকেরা গ্রামীণ ক্ষেত্রে টেলিব্যবস্থা প্রসারে যেমন কোন উদ্যোগ নেয়নি, তেমনি বিদেশী বীমা কোম্পানিগুলিও আমাদের দেশের পরিকাঠামো নির্মাণে বছরে প্রতিশ্রুত ২৫কোটি টাকার বদলে একটি পয়সাও খরচ করেনি। খুচরো ব্যবসায় ১০০শতাংশ বিদেশী লগ্নী দেশের ৪ কোটি খুচরো ব্যবসায়ীর স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করবে। তাদের রুটি- রুজির পথ বন্ধ হয়েছে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার আইন নিয়ে টালবাহানা করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিষেবার ঢালাও বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ সাধারণ মানুষকে এইসব পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করছে। তাই শিক্ষার বিষয়টি সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনার জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠনের দাবিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

গত ১৮ই আগস্ট, ২০০৬ নয়া পেনশন ব্যবস্থা ও পেনশন বিল প্রত্যাহারের দাবিতে দিল্লিতে যন্তরমন্তরে 'সংসদ অভিযান' হয়। এই সংসদ অভিযানের উদ্যোক্তা ছিল সারাভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন, কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশন, ডিফেন্স এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, ভারতের স্কুল টিচার্স ফেডারেশন এবং সারাভারত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক ফেডারেশন। এস টি এফ আই-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় ৪০০ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এই সংসদ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এস টি এফ আই-এর সাধারণ সম্পাদক কে রাজেন্দ্রন জোরালো ভাষায় পেনশন বেসরকারীকরণের বিরোধিতা করেন। ঘোষণা করা হয়, পেনশন বিল সংসদে পেশ করা হলেই দেশব্যাপী একদিনের ধর্মঘট হবে।

এই ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তাই ২২শে নভেম্বরের সংসদ অভিযানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি হলো ঃ সরকারী কর্মচারী সহ শিক্ষক ও সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক আক্রমণের বিরুদ্ধে এই সংসদ অভিযান। শারদোৎসব ও ঈদ উৎসবের ছুটির আগে এবং পরে যে সময়টুকু পাওয়া যাবে তার সদ্ব্যবহার করে এস টি এফ আই-এর নেতৃত্বে ২২শে নভেম্বরের সংসদ অভিযানের কর্মসূচির পক্ষে ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করতে হবে।

নিন্দা, প্রতিবাদ, ধিক্কার

বি জে পি-র ছাত্র সংগঠন এ বি ভি পি-র কর্মীদের হাতে অধ্যাপক এইচ সাভারওয়াল নিহত হওয়ার ঘটনাকে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি তীব্র নিন্দা করছে। অধ্যাপক হরভজন সিং সাভারওয়াল-এর মৃত্যু আমাদের দেশের ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্কের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করল। সমিতি সমবেদনা জানাচ্ছে প্রয়াত অধ্যাপকের পরিবারবর্গকে ; ধিক্কার জানাচ্ছে উজ্জয়িনীর এই গৈরিক হামলাকে।

●

কালনা কলেজের অধ্যাপক অরুণ চৌধুরী গত ৫ই সেপ্টেম্বর' ০৬ শিক্ষক দিবসে যখন ক্লাস নিচ্ছিলেন তখন নির্বাচন কমিশনের জনৈক পর্যবেক্ষক তাঁর কোনো অনুমতি না নিয়ে ক্লাসে ঢুকে পড়ে ছাত্রদের সামনে তাঁর প্রতি অপমানসূচক উক্তি করেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি শিক্ষকের প্রতি পর্যবেক্ষকের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং নিন্দা করছে।

এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তারজন্য নির্বাচন কমিশনকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমিতি অনুরোধ করছে।

তারিখ ঃ ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

শিক্ষার অধিকার আইনের খসড়া, ২০০৬ ঃ আশা ও আশঙ্কা

রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়

প্রাক্তন উপাচার্য, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সূচনা

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে দেশের ওয়াকিবহাল মহলে প্রত্যাশা জেগেছিল যে সংসদের এবছরের (২০০৬ সাল) বাদল অধিবেশনে শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইনের খসড়া পেশ করা হবে। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখা গেল সংসদে বিল আনার পরিবর্তে গত ২১শে জুন তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রারম্ভিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের সচিব রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তরকে একটি চিঠি পাঠালেন যার মূল বক্তব্য হলো, শিক্ষার অধিকার প্রসঙ্গে কোনো কেন্দ্রীয় আইন পাশ করা হবে না। তার পরিবর্তে একটি নমুনা বা মডেল আইনের খসড়া পাঠানো হলো। কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে রাজ্যগুলি এই খসড়াকে অনুসরণ করে নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে নেবে ; যে-সব রাজ্য ইতোমধ্যেই এই বিষয়ে আইন তৈরি করেছে তারা এই খসড়ার নিরিখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের চিঠি এবং মডেল আইনের খসড়াটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার আগে সমগ্র বিষয়টির পূর্বাপর পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

পুরনো কথা

১৯৫০ সালে গৃহীত ভারতীয় সংবিধানে সর্বজনীন শিক্ষার দায়িত্বকে রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতির অধ্যায়ে রাখা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল একটি দশকের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সব বালক-বালিকার জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্র করবে। এরপরে অনেকগুলি দশক এসেছে এবং চলে গেছে, কয়েকবার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ বাড়াবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেশবাসীর তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো আজ পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করা হয়নি, লক্ষ্যও অধরা থেকে গেছে। তাই আজ প্রায় ৪০ কোটি বয়স্ক ভারতবাসী অক্ষরজ্ঞানটুকুর সুযোগ পাননি। এখনও স্কুলে যাবার বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে কয়েক কোটি স্কুলের নাগাল পায় না। এই লজ্জাজনক ব্যর্থতার কারণ হিসেবে রাষ্ট্রের কৈফিয়ৎ—অর্থের অনটন। তবে বিশিষ্ট গবেষকদের মতে আন্তরিক চেষ্টা থাকলে এবং জাতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষাকে যথাযথ অগ্রাধিকার দিলে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। অভাব আসলে রাজনৈতিক সদিচ্ছার।

সংবিধান সংশোধন

এটিও বর্তমানে আমাদের পরিচিত কাহিনি। শিক্ষার দাবীকে জাতীয় দাবী হিসেবে মেনে নিয়ে রাষ্ট্র যথাযথ দায়িত্ব পালন করুক — এই জোরালো বক্তব্য নিয়ে সারাদেশে, বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে দীর্ঘদিন আন্দোলন চলেছে। এই সংগ্রামে অন্যান্য সমাজমনস্ক নাগরিকদের সঙ্গে প্রগতিশীল শিক্ষক সংগঠনসমূহের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ক্রমশ দেশের সব অংশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার চাহিদা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। তাঁরাও এই দাবীতে সোচ্চার হ'ন, আন্দোলনের জোয়ার অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিরাট সংখ্যক নরনারীকে শিক্ষার অঙ্গন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার বিপজ্জনক পরিণাম নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগের প্রকাশ দেখা গেল। বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার সময়সূচি নির্ধারণ করে ঘোষণাপত্র গৃহীত হলো, ভারত সরকারও তার অংশীদার। সুতরাং শিক্ষার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দেশের গন্ডী

পেরিয়ে আন্তর্জাতিক রূপ নিল। এই বিষয়ে আমরা সারা পৃথিবীর কাছে দায়বদ্ধ হয়ে গেলাম। দেশে-বিদেশে ব্যাপ্ত এই চাপ সকলের জন্য শিক্ষার আয়োজনের কাজটিকে নতুন করে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করল। এই পরিস্থিতিতে ১৯৯৩ সালে সুপরিচিত উন্নিকৃষ্ণণ মামলায় দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের যুগান্তকারী রায়ের পরে রাষ্ট্রের সামনে আর বিকল্প রইল না। ২০০২ সালে সংসদে গৃহীত হলো সংবিধানের ৮৬তম সংশোধন, যার বলে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সব ছেলেমেয়ের জন্য অবৈতনিক আবশ্যিক প্রারম্ভিক শিক্ষাকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া হলো। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সংশোধনটি উদ্ধৃতির উপযুক্ত— "The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6-14 years in such manner as the State may, by law, determine."

দেশের শিক্ষানুরাগী সব মানুষই এই ইতিবাচক পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। নাগরিকদের দীর্ঘদিনের একটি চাহিদা মিটল, কিন্তু একটি দুঃখজনক অপূর্ণতাও রয়ে গেল। রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতির যে সূত্র ছিল তাতে কোনো নিম্নতম বয়সের উল্লেখ ছিল না। সংশোধনের বয়ানে ৬ বছরের নিচের শিশুদের মৌলিক অধিকারের পরিধির বাইরে রাখা হলো। এদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে সেই ৪৫নং ধারাতে, অর্থাৎ নির্দেশাত্মক নীতির পর্যায়েই রেখে দেওয়া হলো। পরে আমরা লক্ষ্য করলাম কেন্দ্রীয় সংস্থা এন সি ই আর টি-ও এই বিচ্যুতি দেখে আক্ষেপ করেছে। ২০০৫ সালে প্রকাশিত জাতীয় পাঠক্রমের খসড়া সুপারিশে তারা বলেছে, "..........it is hence unfortunate that the o to 6 age-group has been excluded from the purview of Article 21."

সংবিধানের এই সংশোধনের প্রধান তাৎপর্য

সংবিধানের ৮৬তম সংশোধনের কয়েকটি তাৎপর্য নিজেদের বিবেচনা দিয়ে বুঝে নেবার চেষ্টা করা যাক।

(ক) এই সংশোধনের আগে শিক্ষার সুযোগ নাগরিকদের আইনগত অধিকার বা রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ দায়িত্ব ছিল না। ৮৬তম সংশোধন সেই ব্যবস্থা করে দিল। নির্দিষ্ট বয়ঃক্রমের সব শিশুর জন্য অবৈতনিক শিক্ষার আয়োজন করাটা এখন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক কর্তব্য। এই কর্তব্যপালনে ব্যর্থ হলে সেজন্য কোনো ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য হবে না। আর্থিক বা অন্য কোনো বাধা থাকলে তা রাষ্ট্রকেই দূর করতে হবে, কোনো অজুহাতেই নাগরিকদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যাবে না।

(খ) সংবিধানে উচ্চারিত 'free' শব্দটিকে বাংলায় সাধারণত অবৈতনিক বলা হয়। কথাটির প্রকৃত অর্থ বোধহয় আরও ব্যাপক। 'Free education' কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভবত এই যে রাষ্ট্র এমন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করবে যাতে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবার জন্য মাতা-পিতা বা পরিবারের ওপর কোনরকম আর্থিক চাপ না আসে। আমরা জানি শিক্ষার সুযোগকে ইংরাজিতে 'access' বলা হয়। এন সি ই আর টি ১৯৮৮ সালে তাদের পাঠক্রম সংক্রান্ত দলিলে আমাদের সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের কথা উল্লেখ করে বলেছিল যে শিক্ষার সমান সুযোগের অর্থ শুধু স্কুল খুলে দেওয়া নয়, শিক্ষার সুযোগকে সার্থকভাবে কাজে লাগাবার জন্য যে সামগ্রিক অবস্থার প্রয়োজন তাকে সকলের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত করা।

(গ) আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক শিক্ষার ধারণাটিও স্পষ্ট হওয়া দরকার। যে প্রশ্নটির নিরসন করা জরুরী তা হলো এই বাধ্যতা কার ? যার অধিকার সেই শিশু বা তাদের অভিভাবকের, না কি যার সাংবিধানিক দায়িত্ব সেই রাষ্ট্রের ? আইন-আদালতের মঞ্চে এ নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট অভিমত আছে কিনা জানি না। তবে আমরা বুঝি যে অধিকারের সঙ্গে বাধ্যতার ধারণা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সর্বজনীন শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যে পৌছতে গেলে এটি রাষ্ট্রেরই অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য, বাধ্যতা রাষ্ট্রের। যে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের স্কুলে পাঠান না তাঁরা শিক্ষার ব্যাপারে অনিচ্ছুক বা অনাগ্রহী নন, তাঁরা নিতান্তই অপারগ। বহুবিধ আর্থ-সামাজিক বাধা তাঁদের জীবনযাত্রাকে সঙ্কটে জর্জরিত করে রেখেছে। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে কোনোমতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার রসদ যোগাবার তাগিদেই তাঁরা কাঁচা বয়সের পুত্র-কন্যাকে রোজগারের পথে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হ'ন। নারীর মূল্য সম্পর্কে সমাজের ধারণা ও বিশ্বাস এমন নেতিবাচক পর্যায়ে রয়ে গেছে যে বিত্তবান মাতা-পিতা অর্থব্যয় করে কন্যাভ্রূণ হত্যা করেন, আর অসহায় গরিব বাবা-মা কন্যাকে অল্পবয়সে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দায়মুক্ত হ'ন। এই চরম লজ্জাজনক চিত্র তো আইন করেও পাল্টানো যায়নি। সুতরাং দরিদ্র বঞ্চিত পরিবারের মূল আর্থিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি দূর করে শিক্ষার অধিকারকে কাজে লাগাবার জন্য তাদের সক্ষম করে তোলা তো রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। এবং এজন্য শুধু শিক্ষানীতি নয়, সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতিসমূহ অনুসরণ করছে তার গুরুত্বও উপলব্ধি করতে হবে। ঠিক এই কথাই শোনা গেল

এন সি ই আর টি-র কণ্ঠে। ২০০৫ সালে পাঠক্রম সংক্রান্ত দলিলে তারা বলছে, "If 'free' education is understood as 'removal of constraints' to education, then we must realise the importance of other sectors of the states' social policy for supporting and facilitating the achievement of VEE।" বাস্তবিকই, উদারীকরণের রন্ধ্রপথে যদি সাধারণ মানুষের জীবনে চরম দারিদ্র্য নেমে আসে, দেশের চারটি অপেক্ষাকৃত অগ্রসর রাজ্যে যদি হাজার হাজার কৃষক বেঁচে থাকার উপায় না পেয়ে আত্মহননে বাধ্য হ'ন, তবে স্কুলে আসবে কাদের সন্তান ?

(ঘ) রাষ্ট্র মানে কে ? কেন্দ্রীয় না রাজ্য সরকার ? সংবিধানের 'The State' কথাটি থেকে আপাতবিচারে মনে হতে পারে যে এই বিধান কেন্দ্রীয় সরকারকেই বোঝাচ্ছে। তবে আইনের ব্যাখ্যা অন্যরকম। 'The State' গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকেই বোঝায়, দুই স্তরের সরকারই যার অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু সঙ্গত প্রশ্ন থেকেই যায়—রাষ্ট্রকাঠামোয় ক্ষমতা ও সম্পদের যে বিন্যাস রয়েছে তাতে মূল দায়িত্ব কার ? এই বিশাল জাতীয় কর্তব্য পালনে নেতৃত্ব কে দেবে ? অর্থ সংস্থান কার করার কথা ? তর্কাতীতভাবেই এ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। সংবিধানের ক্ষমতাবলে দেশ চালানোর পরিকল্পনা করা এবং তাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য সম্পদ সংগ্রহ ও তার কাম্য সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে। দেশের অর্থনীতি স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে চলবে না উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছে আত্মসমর্পণ করা হবে, বাণিজ্যিক স্বার্থচালিত সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ও উদারনীতি গলাধঃকরণ করে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণাকে বিসর্জন দেওয়া হবে কিনা — এসব তো কেন্দ্রই নির্ধারণ করে। রাজ্য সরকারগুলি ও দেশের সাধারণ মানুষ তো এই সিদ্ধান্তের অসহায় ভুক্তভোগী ! মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রবল আঘাতে দেশীয় শিল্প ও কৃষিব্যবস্থার যদি নাভিশ্বাস ওঠে, দারিদ্র্য ও বেকারী যদি মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে, তা'হলে তার থেকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা তো কোনো রাজ্য সরকারের নেই। তাদের আয়ের উৎস অত্যন্ত সীমিত। গরিব মানুষের ওপর করের বোঝা না চাপিয়ে নিজেদের কোষাগারকে পুষ্ট করা তাদের পক্ষে দুরূহ কাজ। ফলত যে সরকার যত গরিবের স্বার্থ রক্ষা করতে চাইবে সেই সরকার তত গরিব হবে। রাজ্যের অধিবাসীদের জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিয়ে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটাবার দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই। বিশেষ করে নবম অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন পাবার পরে কেন্দ্রীয় সরকার যেসব নীতি গ্রহণ করেছে তা রাজ্য সরকারগুলির অসহায়তা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশিষ্ট অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে কেন্দ্রের এই নীতির ফলে প্রায় সব রাজ্য সরকারই দেউলিয়া হতে বসেছে। এই নীতি না পাল্টালে তাদের আর্থিক সঙ্কট ক্রমশ তীব্রতর হবে। স্পষ্টতই রাজ্য সরকারগুলির আর্থিক সঙ্গতির চেহারাটাও নির্ধারিত হয় কেন্দ্রের নীতির দ্বারা। সুতরাং সর্বজনীন শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান কেন্দ্রীয় সরকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে — এ দাবী অবশ্যগ্রাহ্য।

(ঙ) ৮৬তম সংবিধান সংশোধনে উল্লেখ না থাকলেও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বরাবর উচ্চারিত ও স্বীকৃত হয়ে এসেছে তা হলো, সব শিশুর জন্য সমমানের শিক্ষার আয়োজন করা। জাতি-ধর্ম-ভাষা-লিঙ্গ-আর্থিক অবস্থা-ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্নতার বিচারে শিক্ষার সুযোগে বৈষম্য জাতীয় নীতি ও সংবিধানের নির্দেশের পরিপন্থী। বিভিন্ন সময়ে সরকারী দলিলে ও ঘোষণায় একথা দ্ব্যর্থহীন ও নিঃশর্তভাবে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার-প্রবর্তিত সর্বশিক্ষা অভিযানের মূল আহ্বানেও আমরা দেখি সব শিশুকে স্কুলে আনা এবং ধরে রাখার সঙ্গে উৎকৃষ্ট শিক্ষার কথাও বলা হয়েছে —সেটাও সকলের জন্য। এ বিষয়ে আরো ক'টি কথা পরে বলা যাবে।

রাষ্ট্রের উদ্যোগ

(ক) ৮৬তম সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়ার সূচনা হতেই বি জে পি'র নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চার (এন ডি এ) সরকার অর্থনীতির প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ তাপস কুমার মজুমদারকে সভাপতি করে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিল। এই কমিটির দায়িত্ব ছিল সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করতে হলে দশম পরিকল্পনাকালে কত অর্থ ব্যয় করতে হবে তার একটি আনুমানিক হিসেব করে দেওয়া। বিষয়টির বিভিন্ন দিক অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে পর্যালোচনা করে এই কমিটি ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে তার মূল্যবান প্রতিবেদন পেশ করে। কমিটির সুবিন্যস্ত সামগ্রিক সুপারিশের মধ্যে একটি অংশ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে, কারণ পদক্ষেপ নিতে বিলম্ব হয়ে যাবার ফলে অর্থের হিসেবগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। প্রাসঙ্গিক কথাটি হলো, সব শিশুর অভিন্ন গুণমানের শিক্ষার অধিকারকে কমিটি চরম গুরুত্ব দিয়েছে। সমাজের সুযোগপ্রাপ্ত শ্রেণির জন্য প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয়, আর অর্থাভাবের চিরপরিচিত অজুহাতে যুগ-যুগ

ধরে বঞ্চিতদের জন্য সস্তা (গৌরবে cost-effective) প্রথামুক্ত খন্ডকালীন বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা অনুমোদনযোগ্য নয়।

এখানে একটু মন্তব্য প্রয়োজন। মুক্ত বিদ্যালয় আমাদের প্রবর্তন করতে হয়েছে সেইসব শিক্ষাবঞ্চিত মানুষদের জন্য যাঁরা বয়স এবং পেশা প্রভৃতি বা অন্য আর্থ-সামাজিক, শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য বিদ্যালয়ে আসতে পারবেন না। কিন্তু বিদ্যালয়ে যাবার বয়ঃক্রমের ছেলেমেয়েদের সমাজের সুস্থ সফল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কাজে এই শিক্ষা আদৌ কাম্য নয়। তা সামাজিক ন্যায়বিচারের পরিপন্থী, সুস্থ সমাজ গঠনের অনুপযুক্ত। পরিতাপের বিষয়, বিগত ৬/৭ বছর ধরে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা গবেষণা সংস্থায় নিযুক্ত কতিপয় সম্মানিত আধিকারিক এই তত্ত্ব প্রচার করে চলেছেন যে প্রথাগত বিদ্যালয়টি পুরনো, অকেজো, ওটা বর্জন করার সময় এসেছে। তার পরিবর্তে মুক্ত বিদ্যালয় ব্যবস্থা শিক্ষার গুণগত মানের প্রশ্নে অনেক উন্নত এবং ওটাই ভবিষ্যৎ। আরো দুঃখের বিষয়, চটকদার কথায় বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের রাজ্যেও কিছু প্রগতিশীল বন্ধুর মধ্যে এই তত্ত্বটিকে সাদরে বরণ করার ঝোঁক দেখা গিয়েছে। মজুমদার কমিটিকে প্রতিবেদন রচনার মধ্যে এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করতে হলো কেন? রিপোর্টেই বলা হয়েছে স্বল্পব্যয়ের বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে—এটা ধরে নিয়ে সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসেব করার জন্য কমিটির ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল।

(খ) সংবিধানের নির্দেশ উপযুক্ত আইন ছাড়া কার্যকর করা যায় না। সেই সময়কার বি জে পি চালিত জোট সরকার সংবিধান-প্রদত্ত নতুন দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইনের খসড়া তৈরি করেছিল। ঐ সরকারের যা চরিত্র তার প্রতিফলন দেখা গেল প্রস্তাবিত আইনের নানা ফাঁক-ফোকড়, ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যে। তীব্র বিতর্ক ও সমালোচনার মুখোমুখী হয়ে খসড়াটি অন্তত তিনবার পাল্টানো হলো। এই বিল সম্পর্কে যে প্রধান আপত্তিগুলি উঠেছিল সংক্ষেপে তার কয়েকটি এইরকম ঃ

● বিলটি অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। জোরালো দাবী থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের (CABE) কোনো সভা আহ্বান করা হয়নি।

● অর্থব্যয়ের প্রশ্নে কেন্দ্রের দায়িত্ব সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। খসড়া আইনে সংশ্লিষ্ট ধারার বয়ানটি এই, "Central government <u>may</u> render financial and other assistance to State government......in the discharge of their functions under this Act." (নিম্নরেখা লেখকের)। 'May' শব্দটি ব্যবহার করে দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হলো। সাহায্য না দেবার পথও খোলা রইল।

● খসড়াটিতে অন্তত তিন ধরনের বিদ্যালয়ের কথা বলা হয়েছে। এরদ্বারা সরকার-পোষিত অবৈতনিক শিক্ষার সমান্তরাল ব্যয়বহুল ভিন্ন ধারাকে বৈধতা দেওয়া যাবে। শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে শ্রেণিবৈষম্য প্রকট হয়ে উঠবে।

● বিশেষ সুবিধা দেবার ক্ষেত্র বাছাইয়ের মাপকাঠি হিসেবে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী পরিবারের কথা বলা হয়েছে। এটা ন্যায়সঙ্গত নয়। ঐ সীমার ওপরে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা সবাই সচ্ছল নন। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা স্কুলে না গিয়ে উপার্জনের কাজে নিযুক্ত আছে বলেই হয়ত তাঁরা 'দরিদ্র' বলে চিহ্নিত হননি। এর বদলে 'সমাজের দুর্বল অংশ'-কে গণ্য করা সমীচীন।

● পানীয় জল, শৌচাগার প্রভৃতি অপরিহার্য ব্যবস্থাগুলিকে অনুমোদনযোগ্য বিদ্যালয়ের পক্ষে 'অত্যাবশ্যক' তালিকায় না রেখে 'বাঞ্ছনীয়' বলা হয়েছে।

পটপরিবর্তন

বি জে পি'র জোট সরকারের প্রস্তাবিত আইনের খসড়াটি মুলতুবী থাকা অবস্থাতেই লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। জনগণের সুস্পষ্ট রায়ে জনবিরোধী কাজে প্রবৃত্ত ঐ সরকার অপসারিত হলো। গঠিত হলো কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে সম্মিলিত প্রগতিশীল জোটের সরকার যাকে বামপন্থী দলগুলি বাইরে থেকে সমর্থন করছে। সমর্থনের কারণ এই নয় যে তাদের বিচারে কংগ্রেস দল জনগণের বন্ধু, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি নিঃসন্দেহে অনেক বেশী বিপজ্জনক শত্রু। মানুষের কাছে জোট সরকারের দায়বদ্ধতার দলিল হিসেবে রচিত হলো 'অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি'। এটাই বামপন্থীদের সরকারের প্রতি সমর্থনের মূল ভিত্তি।

নতুন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার সূচনাপর্বেই দেশবাসীর প্রতি কিছু প্রতিশ্রুতির বাণী উচ্চারিত হলো।

জাতীয় অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিতে ইউ পি এ সরকার স্পষ্ট ভাষায় অঙ্গীকার করল যে শিক্ষার জন্য সরকার জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ ব্যয় করবে যার অন্তত অর্ধাংশ ব্যয় হবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রে। বিগত লোকসভা নির্বাচনের অল্পদিন পরেই ২০০৪ সালের ৭ই জুন মাননীয় রাষ্ট্রপতি সংসদে তাঁর ভাষণে সরকারের এই প্রতিজ্ঞারই পুনরুচ্চারণ করেন। সেইসঙ্গে তিনি উন্নতমানের মৌলিক

শিক্ষাকে সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার সরকারী দায়িত্বসম্পন্ন করার জন্য সমস্ত কেন্দ্রীয় করের ওপর শিক্ষা সেস্ আরোপ করার প্রস্তাব দেন। এতে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে নতুন আশা জাগল।

এরপরে সরকার লক্ষণীয় তৎপরতার সঙ্গেই কাজ শুরু করল। ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসের শেষদিকেই সংবিধানের নতুন নির্দেশ অনুসারে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার খসড়া আইন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের কাছে পাঠিয়ে দিল। এবার তারা গণতান্ত্রিক পথ ধরে এগোতে চেষ্টা করল, অর্থাৎ CABE পনর্গঠন করল। ১০-১১ই আগস্ট এই পর্ষদের (CABE) সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে খসড়াটি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। এই খসড়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে সভায় উত্তপ্ত বিতর্ক হলো, গভীর মতপার্থক্য দেখা দিল। বোঝা গেল সরকার পাল্টালেও শ্রেণিচরিত্রগত মূল ঝোঁকটি অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। কথা ও কাজের অমিল আইনের খসড়ায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত CABE-র এই সভা স্থির করল যে, এই সভার আলোচনা ও পরামর্শের সূত্র ধরে একটি নতুন খসড়া রচনা করা হোক। তারজন্য তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় শ্রীকপিল সিবালকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি করা হলো। ২০০৫ সালের জুন মাসে সিবাল কমিটি তাদের প্রতিবেদন এবং সেইসঙ্গে আইনের একটি নতুন খসড়া পেশ করল। অবশ্য সিবাল কমিটি এপ্রিল মাসের খসড়াটির সামগ্রিক সংশোধন করেননি, শুধু একান্ত অপরিহার্য বিষয়গুলিই বিবেচনা করেছে। এই বিবেচনায় কমিটি যে মূল নীতিগুলির দ্বারা চালিত হয়েছে তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। শিক্ষার অধিকারের অর্থ হলো প্রত্যেক শিশুর জন্য প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয়ে পূর্ণ সময়ের এবং সন্তোষজনক ও অভিন্ন গুণমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাকে প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে সক্ষম করে তুলতে হবে।

২। শিক্ষার অধিকার আরও বোঝায় যে সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষাগত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, শারীরিক প্রভৃতি যতরকম প্রতিবন্ধকতা শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষায় সার্থকভাবে অংশগ্রহণ ও ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার সবগুলি দূর করা রাষ্ট্রের আবশ্যিক দায়িত্ব।

৩। শিক্ষার অধিকারকে কেবলমাত্র শিক্ষাব্যবস্থা বা শিশুর প্রয়োজন মেটাবার জন্য নয়, তাকে দেখতে হবে সাম্য, ন্যায়-বিচার, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক সংহতি প্রভৃতি সংবিধানের অন্যান্য লক্ষ্যগুলি অর্জনের উপায় হিসেবে।

অন্য কয়েকটি মুখ্য বিষয়ে কপিল সিবাল কমিটির সুবিবেচিত পরামর্শও প্রণিধানযোগ্য। এগুলি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কয়েকটির পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যায়—

১। যদিও শিক্ষার প্রসঙ্গে কমিটির বিচার্য বিষয় ৬-১৪ বছর বয়ঃক্রমের শিশুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল, কমিটি সদিচ্ছা ও দায়িত্বের পরিচয় দিয়ে একটু স্বাধীনতা নিয়েছিল। তারা প্রাক্-প্রাথমিক স্তরটিকেও (ECCE) গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছে। তারা প্রাক্-প্রাথমিকে শিক্ষাকে যতটা সম্ভব প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার সুপারিশ করেছে। এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারলে ৮৬তম সংশোধনের ঘাটতিটি হয়ত কিছুটা পূরণ করা যাবে।

২। অর্থসংস্থানের বিষয়টি সিবাল কমিটি গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন। প্রথমেই তাঁরা ১৯৮৬ /৯২ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেছেন। আমরাও এখানে সেটি তুলে ধরছি—"The National Policy on Education, 1968, had laid down that the investment on education be gradually increased to reach a level of 6 per cent of the national income as early as possible. Since the actual level of investment has remained far short of that target, it is important that greater determination is shown now to find the funds for the programmes laid down in this Policy. While the actual requirements will be computed from time to time on the basis of monitoring and review, the outlay on education will be stepped up to ensure that during the Eight Five year Plan and onwards it will uniformly exceed 6 per cent of the national income."

এরপরে কমিটি ইউ পি এ সরকারের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির অঙ্গীকার ও মাননীয় রাষ্ট্রপতির সংসদে প্রদত্ত ভাষণের উল্লেখ করেছে, যার কথা এই নিবন্ধে ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি। গত ২০০৩-২০০৪ আর্থিক বছরের হিসেব বিশ্লেষণ করে সিবাল কমিটি দেখিয়েছে যে ঐ বছর প্রারম্ভিক শিক্ষায় সরকারী ব্যয় ছিল জাতীয় আয়ের মাত্র ২%। এই অর্থের ৮৮% এসেছিল রাজ্যগুলির রুগ্ন কোষাগার থেকে, কেন্দ্র ব্যয় করেছিল মাত্র ১২ শতাংশ। এই চরম লজ্জাজনক ব্যর্থতার কাহিনি বোধহয় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বড়ই

অস্বস্তিকর! বর্তমানে বাড়তি সম্পদের উৎস হিসেবে কমিটি শিক্ষা সেস বাবদ ৬,৯৭৫ কোটি টাকার সম্ভাব্য আয়ের কথা বলেছেন।

খসড়া বিলে যে ব্যবস্থাগুলির বিধান দেওয়া হয়েছে সেগুলির বাস্তব রূপ দিতে হলে একাদশ পরিকল্পনার শেষ বছর (অর্থাৎ ২০১১-১২ অর্থবর্ষ) পর্যন্ত কত অর্থ ব্যয় হতে পারে তার একটি হিসেব প্রস্তুত করার জন্য সিবাল কমিটি শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জাতীয় সংস্থাকে (NIEPA) অনুরোধ করেছিল। NIEPA শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অনুপাত এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনক্রমের চারটি বিকল্প বিন্যাস ধরে নিয়ে সম্ভাব্য ব্যয়ের যে হিসেব করে দেয় তার চিত্রটি এই রকম ঃ

কমিটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারের মৌলিক দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃতিযোগ্য—"The very substantial financial implications of the recommended provisions may have to be borne almost entirely by the Central government as financial condition of all State governments is unsatisfactory." [নিম্নরেখিত অংশটিতে কমিটিই জোর দিয়েছেন।] রাজ্য সরকারদের আর্থিক দুর্বলতার যে কারণ আমরা দেখিয়েছি তা এখানে নেই। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রীর কাছ থেকে তেমন স্বীকারোক্তি আশা করাও সঙ্গত নয়। তবে কাজের কথাটি তো যথার্থই আছে!

তবে এই কমিটির কর্মপদ্ধতিতে একটি সীমাবদ্ধতার কথা

চিত্র	শর্ত-বিন্যাস	২০০৬-১২ সময়কালে অনুমোদিত মোট ব্যয় (কোটি টাকায়)	মোট ব্যয় জাতীয় আয়ের শতাংশ হিসেবে
১।	শিক্ষকপিছু শিক্ষার্থী—৩৫ জন; কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের বেতনক্রম	৪,৩৬,৪৫৯	১.৫১
২।	শিক্ষকপিছু শিক্ষার্থী—৩৫ জন; রাজ্যে প্রচলিত গড় বেতনক্রম	৩,৯৩,৩০৭	১.৩৬
৩।	শিক্ষকপিছু শিক্ষার্থী—৪০ জন; কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের বেতনক্রম	৩,৪৬,২৯৯	১.২০
৪।	শিক্ষকপিছু শিক্ষার্থী—৪০ জন; রাজ্যে প্রচলিত গড় বেতনক্রম	৩,২১,১৯৬	১.১১

তবে সিবাল কমিটি NIEPA-র এই হিসাবকে পূর্ণাঙ্গ ও অভ্রান্ত বলে গণ্য করেনি। তারা দেখেছে যে এই হিসাব কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক অনুমানের ভিত্তিতে করা হয়েছে যা পরিবর্তনসাপেক্ষ। আরো গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দুর্বলতর পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা দেবার জন্য প্রস্তাবিত আইনে যে ব্যবস্থাগুলির বিধান দেওয়া হয়েছে তার আয়োজন করতে হলে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারকে যে বাড়তি ব্যয়ভার বহন করতে হবে সেই অংশটি NIEPA-র হিসেবে উপেক্ষিত হয়েছে। সুতরাং কমিটি চেয়েছে আলোচনার মাধ্যমে খসড়াটি চূড়ান্ত করার সময় সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাবটিকে নির্ভুল করে নিতে হবে।

এই বাস্তবোচিত বিশ্লেষণে কমিটির আন্তরিক সদিচ্ছা ও তন্নিষ্ঠ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে উঠেছে। এজন্য অবশ্যই আমরা কপিল সিবাল কমিটিকে সাধুবাদ জানাতে পারি! কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে আর্থিক দায়িত্ব বন্টনের প্রশ্নেও এই প্রতিবেদনেই স্বীকার করা হয়েছে। কমিটির অনেক সদস্যই জোরালোভাবে দাবী করেছিলেন যে খসড়াটি চূড়ান্ত করার আগে আঞ্চলিক সম্মেলন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাপক জনমত সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সময়াভাবে এই বাঞ্ছনীয় পদক্ষেপটি গ্রহণ করা যায়নি। আমরা দেখেছি কমিটি কার্যকাল খুব স্বল্প ছিল না—২০০৪-এর আগস্ট থেকে পরের বছরের জুন মাস!

সিবাল কমিটি-রচিত সি এ বি ই-র খসড়ায় বেশকিছু ইতিবাচক বিধান দেখা গেল। দারিদ্র্যসীমার উল্লেখ না করে দুর্বলতর অংশের কথা বলা হলো। শিশুশ্রমিকের সংজ্ঞায় মজুরীর জন্য যারা কাজ করছে তাদের সঙ্গেই নিজের বাড়ীর কাজে নিযুক্ত থাকার জন্য যারা স্কুলে যেতে পারছে না সেইসব ছেলেমেয়েদেরও গণ্য করা হয়েছে। অবৈতনিক শিক্ষার সংজ্ঞাতেও বলা হয়েছে যে পিতামাতাকে যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো টাকা দিতে না হয় এবং অন্য এমন কোনো অর্থব্যয়

না করতে হয় যা শিশুটির প্রারম্ভিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও তা সম্পূর্ণ করাকে ব্যাহত করতে পারে। এই খসড়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় বোধহয় প্রারম্ভিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক দায়িত্ব সংক্রান্ত বিধানটি। গুরুত্বের বিচারে এই ৯ নম্বর ধারাটি উদ্ধৃতির দাবী রাখে— "9. Responsibility of the Central government –Provision of Free and Compulsory education shall be the concurrent responsibility of the Central and appropriate কেন্দ্রীয় সরকারের governments with the Central governments' responsibility consisting of the following :

i) Provision of financial assistance to state governments in accordance with such formula regarding sharing of costs of implementation of this Act, as the Central government may determine from time to time in consultation with them........."

এই ধারাটিতে এরপরে আরো চারটি উপধারা আছে, এখানে সেগুলি উল্লেখ করা হলো না। একথা ঠিক যে উদ্ধৃত অংশটিতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব বহন করবে এমন কথা বলা হলো না। অথবা কত অর্থব্যয় করবে সে সম্পর্কেও কোনো স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হলো না। তবে দু'টি বিষয়ে আপেক্ষিক অগ্রগতি দেখতে পাওয়া গেল।

প্রথমত, ইংরাজি 'may' ক্রিয়াটির বদলে 'shall' বলা হলো, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব ঐচ্ছিক নয়, আবশ্যিক।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারদের কতখানি অর্থ সাহায্য দেবে তা কেন্দ্র একতরফাভাবে ঠিক করবে না, রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা করেই সেই সূত্র নির্ধারণ করা হবে। বাস্তবে এই পারস্পরিক আলোচনার ফল কী হবে তা নিয়ে হয়ত খুব উচ্চাশা পোষণ করা যায় না। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই শ্রেণি-অবস্থানের রাষ্ট্রের কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করাও অবাস্তব।

এরপর ঘটনা স্বাভাবিক পথে এগোতে লাগল। সিবাল কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইনের একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া রাজ্য সরকারগুলির কাছে পাঠানো হলো ২০০৫-এর ২৬শে আগস্ট। আমাদের রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর থেকে এর ওপর মতামত পাঠিয়ে দেওয়া হলো ১৯শে সেপ্টেম্বর। এই পরিস্থিতিতে এটা ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক যে রাজ্যগুলি থেকে পাওয়া প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় রেখে চূড়ান্ত বিলটি সংসদে উত্থাপিত হবে। কিন্তু ঠিক এই পর্যায়েই ঘটনাস্রোত সম্পূর্ণ অভাবিত এক নজিরবিহীন দিকে বাঁক নিল। এই পথবদলের বার্তাটি বয়ে আনল কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবের ২১শে জুন তারিখের চিঠিটি যার কথা এই নিবন্ধের দ্বিতীয় বাক্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং দেখতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রারম্ভিক শিক্ষা ও সাক্ষরতার দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় আধিকারিক মহোদয়ের চিঠির বিষয়বস্তু কী! এই চিঠিতে ৮৬তম সংবিধান সংশোধনের উল্লেখ করে ২০০৪-এর এপ্রিল থেকে ২০০৫-এর আগস্ট মাস পর্যন্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, "কপিল সিবাল কমিটির সুপারিশগুলির ভিত্তিতে শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ বিল যেটি ২৬শে আগস্ট, ২০০৫ তারিখে রাজ্যগুলির কাছে পাঠানো হয়েছিল, তার ওপর প্রতিক্রিয়া কয়েকটি মাত্র রাজ্য থেকে পাওয়া গেছে। তারপরে এ বিষয়ে আরো পরামর্শ করে প্রস্তাব করা হচ্ছে যে :

● একটি কেন্দ্রীয় আইনের পরিবর্তে শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত একটি নমুনা (মডেল) বিল প্রণয়ন করে রাজ্যগুলির কাছে পাঠানো হবে। রাজ্যগুলি এই কাঠামোটি ধরে নিয়ে যাদের এ বিষয়ে আইন নেই তারা নতুন আইন করে নেবে, আর যেসব রাজ্য ইতোমধ্যেই আইন করেছে তারা যথাযথ সংশোধন ও পরিমার্জন করে নেবে।

● এই খসড়া বিল প্রস্তাব করছে যে কোনো রাজ্যে রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিঃশুল্ক ও আবশ্যিক প্রারম্ভিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে কেবলমাত্র আইনশৃঙ্খলার পরেই।

● কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য নির্ভর করবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা সম্পর্কে রাজ্যের উপযুক্ত আইন করার ওপর (যাদের আইন নেই), অথবা বিদ্যমান আইনের যথাযোগ্য পরিবর্তনের ওপর। যেসব রাজ্য আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে এই মডেল আইনটি হুবহু গ্রহণ করবে তাদের ক্ষেত্রে সর্বশিক্ষা অভিযানের অর্থ বরাদ্দ একাদশ পরিকল্পনাকালেও ৭৫ : ২৫ ভিত্তিতে চলবে। অবশ্য যেসব রাজ্য এটা করতে পারবে না তারা সর্বশিক্ষা অভিযান বাবদ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে ৫০ : ৫০ ভিত্তিতেই পাবে। (ভাবানুবাদ এই নিবন্ধকারের)

এই চিঠির সঙ্গে মডেল বিলের কপি পাঠিয়ে রাজ্য সরকারকে বিলটি এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবগুলি সযত্নে পরীক্ষা করে সুচিন্তিত মতামত তিনসপ্তাহের মধ্যে পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছে। আমরা জানি, আমাদের রাজ্য সরকার শিক্ষাসংক্রান্ত এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মতামত স্থির করে। সেভাবে এগোবার জন্য তিনসপ্তাহ সময় আদৌ যথেষ্ট

নয়। তবে দিল্লীশ্বরদের এটাই অভ্যাস।

মডেল বিলটিতে কয়েকটি বিশেষ ইতিবাচক বিধান আছে যেগুলি বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার। বিলের তৃতীয় অধ্যায়ে শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। সরকারের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে 'যথোপযুক্ত সরকার' (appropriate state)-এর কথা। প্রথম অধ্যায়ে এই যথোপযুক্ত সরকারের সংজ্ঞা বলা হয়েছে ঃ

১) রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ;

২) যে-সব কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নিজস্ব আইনসভা আছে তাদের ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলের সরকার ;

৩) অন্যান্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার।

সঙ্গে যোগ করা হয়েছে যেসব বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা বা তার অর্থে পরিচালিত হয় তাদের ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সরকার হবে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পর্বে যথাযোগ্য সরকার, রাজ্য সরকার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষ, এমনকি বিদ্যালয়ের দায়িত্বের কথাও বিবৃত হয়েছে। সন্তর্পণে বাদ দেওয়া হয়েছে শুধু একটি অংশ—কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব!

কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব-প্রেরিত ২১শে জুনের চিঠির বক্তব্য এবং মডেল আইনের খসড়াটি সম্পর্কে আমাদের কিছু মৌলিক প্রশ্ন স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে।

প্রথমত, পত্রে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় আইন না করে একটি মডেল আইন করে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি 'আলোচনা করে নেওয়া হয়েছিল'। আমাদের প্রশ্ন—কবে, কার সঙ্গে, কী পদ্ধতিতে এই আলোচনা করা হয়? সি এ বি ই-র সভা ডেকে এই প্রস্তাব করা হয়েছিল কি? সিবাল কমিটির সুপারিশ থেকে যে মৌলিক বিচ্যুতি ঘটানো হলো তা কোন্ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে? এইসব তথ্য না দিলে বিষয়টিতে যথেষ্ট স্বচ্ছতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে কি? এন ডি এ সরকার সি এ বি ই'র সভা না ডেকে অন্যায় করেছিল। এখন সেই গণতান্ত্রিক মঞ্চের সুপারিশকে একতরফাভাবে অমর্যাদা করা কি অনৈতিক নয়?

দ্বিতীয়ত, আইন করার অধিকার রাজ্যকে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সহায়তায় বৈষম্যের হুমকি দিয়ে মডেল আইনটি অবিকল মান্য করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে কেন? পরোক্ষ বাধ্যতা কি স্বাধিকারের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক দায়িত্ব কি সর্বশিক্ষা অভিযানের খাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে? তাহলে অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির অঙ্গীকার এবং সেই মর্মে মাননীয় রাষ্ট্রপতির সংসদে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কী হল? শিক্ষা সেস থেকে সংগৃহীত অর্থেরই বা হিসেব কোথায়? শিক্ষাখাতে সরকারের সাধারণ বরাদ্দের টাকাও কি সর্বশিক্ষা অভিযান নামক সময়সীমাবদ্ধ প্রকল্পের গর্ভে চলে গেল?

চতুর্থত, রাজ্য সরকার তার ব্যয় পরিকল্পনায় শিক্ষাকে দ্বিতীয় স্থানে রাখবে একমাত্র আইনশৃঙ্খলার পরে—এটা শুধু পরামর্শ নয়, পরোক্ষ বাধ্যতামূলক বিধান, কারণ এই নির্দেশটি মডেল আইনের ৫(১)নং ধারায় রাখা হয়েছে যা না মানলে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য কম পাবে। এই ব্যবস্থা কি রাজ্যের সীমিত আর্থিক স্বাধীনতায় নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ নয়?

পঞ্চমত, কেন্দ্রীয় আইন না করে মডেল আইন করা এবং তারসঙ্গে শর্ত যোগ করার সিদ্ধান্ত কি সংসদে পেশ করা হবে? যদি না হয় তবে এর আইনগত মান্যতা কোথা থেকে আসবে?

আমাদের বোধহয় এখন এইসব প্রশ্নে তৎপরতার সঙ্গে সরব হওয়া ও সংগঠিত আন্দোলনের চাপ দিয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সদুত্তর নিয়ে আসা জরুরী হয়ে উঠেছে। আর সেইসঙ্গে নিম্নোক্ত চারটি দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যাপক জনমত গঠনের কাজটিতে বিশেষ জোর দেবার কথা বিবেচনা করতে হবে।

১। শিক্ষাসংক্রান্ত আইন করার অধিকার রাজ্যের হাতে দেবার প্রস্তাবকে আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। প্রকৃতপক্ষে আমরা বরাবরই শিক্ষাকে যৌথ তালিকায় রাখার সিদ্ধান্তের বিরোধী। এবং আমরা চাই শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাকে যেন স্থায়ী করা হয়। আমরা এটাও দাবী করব যে রাজ্যের এই অধিকারের সঙ্গে কখনই কোনো শর্ত আরোপ করা চলবে না যা আসলে স্বাধিকারকেই খর্ব করে।

২। সর্বজনীন শিক্ষার সংবিধান-প্রদত্ত অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকেই বহন করতে হবে। এরপক্ষে যেসব যুক্তি বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন সেগুলি একান্ত বাস্তব ও অকাট্য। কপিল সিবাল কমিটিও দ্ব্যর্থহীনভাবে এই অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এখান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চাদপসারণ জাতির পক্ষে বিপর্যয়কর হবে। এটা কোনোমতেই মেনে নেওয়া যাবে না।

৩। সর্বজনীন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে অনুসৃত নীতির ওপর নির্ভর করে না, সমাজের অন্যান্য বিষয়ে রাষ্ট্র কোন্ পথে চলছে তারসঙ্গেও এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। দুর্বলতর অংশের মানুষের দারিদ্র্যমোচনের

জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত প্রসার ঘটানো অসম্ভব। এবং এই সামগ্রিক পরিস্থিতি গড়ে তোলার দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতেই আছে, রাজ্যের নয়। সুতরাং কেন্দ্রের আর্থিক নীতির অভিমুখ মুক্ত বাজার থেকে জনকল্যাণের দিকে ফেরাতে হবে।

৪। ৮৬তম সংবিধান সংশোধনের নির্দেশ পালনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করুক না কেন তা সংসদে আইন পাস করেই করতে হবে, প্রশাসনিক আদেশের বলে নয়।

এখানেই আলোচনার ইতি টানতে চাইছি। জানি আপত্তি উঠবে—"এ তো ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেটের অভিনয়ের মত! 'মডেল বিল' নিয়ে আলোচনায় মূল প্রসঙ্গেই তো প্রবেশ করা হলো না!" এই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক, অনুযোগ শিরোধার্য। মডেল বিলটির প্রত্যেক ধারা নিয়ে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তো করতেই হবে। বিশেষ করে এই সম্ভাবনাটি মাথায় রেখে যে শেষপর্যন্ত আইন হয়ত রাজ্য সরকারকেই করতে হবে, ভাল ভাল বিধান রাখতে হবে। কেন্দ্র থেকে কী পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা থাকবে না। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে দিল্লীর অনুসৃত নীতির ফলে বেকার বাড়বে, সর্বস্তরে দারিদ্র্য গভীরতর হবে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রোজগারে বেরোতে বাধ্য হবে। আর এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের মহান রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হবে নিরন্ন পরিবারের সন্তানদের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে রেখে দেওয়া, শিক্ষায় প্রকৃত অংশগ্রহণ করানো। ক্ষমতাহীন দায়িত্বের যাঁতাকলের কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে, সংহত হতে হবে। তাই এখন বিলটির বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে পটভূমিকাটি বুঝে আশু দাবী নির্ধারণ করাটাও বোধহয় কম জরুরী নয়।

সর্বজনীন শিক্ষার প্রতি কেন্দ্রের নজিরবিহীন অবজ্ঞা

কান্তি বিশ্বাস

রাষ্ট্রসঙ্ঘের শাখা সংগঠন ইউনেস্কো সকল শিশুর জন্য শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করার মহতী উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ সালে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশগুলিকে এই মহাসম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমন্ত্রিত দেশগুলি ছিল চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মিশর, মেক্সিকো এবং নাইজেরিয়া। আমন্ত্রিত দেশগুলির প্রত্যেকটির অতীব দায়িত্বশীল পদাধিকারীগণের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল উক্ত মহাসম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি মহানগরীতে ডিসেম্বরের ১২ থেকে ১৬ (১৯৯৩) তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলন থেকে প্রারম্ভিক শিক্ষা (৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের)-কে নিশ্ছিদ্রভাবে সর্বজনীন করা এবং নিরক্ষতা দূর করার জন্য সার্বিক প্রয়াস গ্রহণের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল। যেহেতু ভারতের মাটিতে ঐ মহাসম্মেলন হয়েছিল সেজন্য প্রথা অনুসারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহাসম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণ দিয়েছিলেন। ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও গীতার একটি শ্লোক উচ্চারণ করে ভাষণ শেষ করেছিলেন। শ্লোকটি ছিল—

ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং ন হি বিদ্যতে
তৎ যোগসংসিদ্ধঃ কালেন আত্মনি স্বয়ং বিন্দতি।

(ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছু নেই। কর্মযোগে সিদ্ধপুরুষ সেই জ্ঞান কাল সহকারে আপনিই অন্তরে লাভ করেন)। সকলে বজ্রকঠিন শপথ গ্রহণ করে সম্মেলন শেষ করলেন। প্রারম্ভিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। ভারতের মাটিতে নতুন ইতিহাসের সূচনা হলো।

তারপর একে একে বারটি বছর আমরা পার করে এসেছি। ইউনেস্কোর সর্বশেষ তথ্য অনুসারে ১৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে যারা আছেন তাদের সাক্ষরতার গড় হার বিশ্বে ৮১·৯ শতাংশ। উন্নয়নশীল দেশে ৯৮·৭ শতাংশ, ভারতে ৬১ শতাংশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের যে শিশুরা এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে রয়ে গেছে সারা বিশ্বে তাদের সংখ্যা ১০ কোটি ৩০ লক্ষ—তার মধ্যে ভারতে আছে ২ কোটি ১০ লক্ষ। বিশ্বের ১৭ শতাংশ মানুষের বাস যে ভারতে, সেখানে বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা বিশ্বের মোট শিশুদের ২০·৪ শতাংশ রয়ে গেছে। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত হয়েছেন, কিন্তু একই দলের শাসন থাকার ফলে ঐ দলেরই প্রধানমন্ত্রী এখন ঐ পদে আসীন। সেই সময়ে যিনি ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, অনেক দিনের বিরতির পর সেই অর্জুন সিংহ এখন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী। সেই সরকারের পক্ষ থেকে সেই শিক্ষামন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে গত ১৬ই জুন সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক (৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্তদের শিক্ষা) শিক্ষা সম্পর্কে একটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব রাজ্য সরকারগুলির নিকট পাঠানো হয়েছে। এই প্রস্তাব এই স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু চরম হতাশব্যঞ্জক নয়, শিক্ষা সম্প্রসারণের দায়িত্ব থেকে নজিরবিহীনভাবে হাত গুটিয়ে নেওয়ার এক ভয়ঙ্কর প্রয়াস এবং এই সরকারের ঘোষিত অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির প্রতি এ এক নিদারুণ আঘাত। সর্বজনীন অবৈতনিক প্রারম্ভিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে-সকল উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা উচিত—তার অভাব বর্তমান প্রস্তাবে কোথায় কোথায় আছে, সে আলোচনায় যাওয়ার আগে যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এই প্রস্তাব এসেছে তা একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

অবৈতনিক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য মহামতী গোখেল ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে দ্বিতীয়বার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন ১৯১২ সালে। ১৯শে মার্চ প্রস্তাব ভোটাভুটিতে নাকচ হয়ে যায়। ১৯১৩ সালে ব্রিটিশ সরকার গরিব এবং অনগ্রসর পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের জন্য সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিন্তু তার দায়িত্ব

অর্পণ করা হয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের উপর। ১৯৩৮ সালে গান্ধীজীর উদ্যোগে প্রবর্তন করার চেষ্টা করা হয় বুনিয়াদি শিক্ষা বিস্তারের জন্য। স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮ সালে বি জি খের-এর নেতৃত্বে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আর্থিক দায়িত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠিত হয়। কমিটি কেন্দ্রীয় মোট ব্যয়-বরাদ্দের ১০ শতাংশ এবং রাজ্যগুলির ব্যয়-বরাদ্দের ২০ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করার সুপারিশ করেছিল। ১৯৫১ সালে পুনরায় বি জি খের-এর সভাপতিত্বে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি রাজ্য সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শিক্ষা বিস্তারের ভূমিকা পর্যলোচনা করে তাকে গতিশীল করার জন্য কিছু সুপারিশ করে। ১৯৫২ সালে নিযুক্ত মুদালিয়র কমিটি এবং ১৯৬৪ সালে গঠিত কোঠারি কমিশন তাদের মূল্যবান সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করে। ১৯৬৮ সালে ঘোষিত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি। শিক্ষার ক্ষেত্রে হতাশাব্যঞ্জক অগ্রগতি দূর করে তাকে উজ্জীবিত করতে ১৯৮৬ সালে নতুনভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়। ঐ ঘোষণায় ২০০০ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়। কমিটি এবং কমিশনের সুপারিশগুলি যত মূল্যবান হোক না কেন, সরকারের নেতিবাচক এবং দুঃখজনক ভূমিকার জন্য এদেশে শিক্ষার চরম পশ্চাদপদতার কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। ১৯৯০ সালে রামমূর্তিকে সভাপতি করে জাতীয় শিক্ষানীতিকে রূপায়িত করার বিষয়ে দুর্বলতার দিকগুলি চিহ্নিত করতে এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করতে এক পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৯৬ সালে মুহিরাম সাইকিয়ার নেতৃত্বে আরো একটি কমিটি গঠন করে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য করে তাকে বাস্তবায়িত করতে সুপারিশ করতে বলা হয়। বর্তমান প্রবন্ধকারকে এই কমিটির পক্ষ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা এবং প্রতিবেদন রচনা করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। ইতিপূর্বে সুপ্রিম কোর্ট উন্নিকৃষ্ণাণ বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ মামলায় ১৯৯৩ সালে শিক্ষা পাওয়ার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য করার জন্য যে আদেশ দিয়েছিলেন, সে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হয়। বিষয়টি বাস্তবায়িত করার জন্য তাপস মজুমদারের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার আরো একটি কমিটি নিয়োগ করে। কমিটি ১৯৯৯ সালে তার প্রতিবেদনে ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে ২০০৭-২০০৮ সাল সময়ের মধ্যে সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার কর্মসূচি কার্যকরী করার জন্য ১,৩৬,৯৯২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার জন্য সুবিন্যস্ত সুপারিশ করে। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান ভূমিকার কথা বলা হয় এবং শিক্ষা সেস ধার্য করে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে সুপারিশ করা হয়।

কেন্দ্রে বি জে পি-র নেতৃত্বে গঠিত সরকার "ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন বিল-২০০৩" তৈরি করে। সেখানে সংবিধানের ৪৫ অনুচ্ছেদে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের পরিবর্তে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুদের সর্বজনীন শিক্ষার যে কথা সংবিধানের ৮৬তম সংশোধনেতে (২০০২) রাখা হয়েছে তাকে সমর্থন করা হয়। সর্বজনীন শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে আর্থিক সহায়তা করতে পারবে বলে নিজ দায়িত্বকে অস্বীকার করার সংস্থান ঐ 'বিলে' রাখা হয় এবং প্রয়োজনে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়ার অধিকার ঐ বিলে কেন্দ্রের হাতে দেওয়ার কথা বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আহ্বানে দিল্লিতে অ-বি জে পি শাসিত রাজ্যগুলির শিক্ষামন্ত্রীদের এক কনভেনশনে কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ উদ্যোগের বিরোধিতা করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার মূল বিষয়বস্তু ঠিক রেখে কিছু প্রসাধনী সংশোধন করে ২০০৪ সালে একটি খসড়া 'বিল' প্রকাশ করে। পরে ঐ সরকারের পতন ঘটে। বিষয়টিও থমকে থাকে।

কেন্দ্রে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্যদ পুনরুজ্জীবিত হয়। ঐ পর্যদ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল সিবাল-এর নেতৃত্বে অবৈতনিক সর্বজনীন আবশ্যিক প্রারম্ভিক শিক্ষা আইনের খসড়া তৈরি করতে কমিটি নিয়োগ করা হয়। কমিটির তৈরি খসড়ায় ৬ বছর বয়সের কম শিশুদের শিক্ষা, শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের কর্তব্যের কথা এবং রাজ্যগুলির সাথে আলোচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক দায়িত্ব ঠিক করার সংস্থান রাখা হয়। পূর্বের খসড়ায় আর কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কথা বলা হয় না। প্রস্তাবের সাথে একটি অভিমত পত্রে উল্লেখ করা হয় ২০০৬ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ১৪ বছর পর্যন্ত সকলকে শিক্ষার আঙিনায় আনা এবং ধরে রাখার জন্য ৩,২১,১৯৬ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্যদের সভায় ঐ খসড়া আইন অনুমোদিত হয় না।

এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশেষ প্রস্তাব, জুন, ২০০৬, বিবেচনা করতে হবে। এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, কেন্দ্র এই সম্পর্কে আর কোনো আইন তৈরি করবে না। রাজ্যগুলিকেই আইন তৈরি করতে হবে এবং সেই আইনের একটি নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। তার সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাসচিব চম্পক চ্যাটার্জির একটি চমকপ্রদ

চিঠি রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে। সর্বজনীন আবশ্যিক প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তার কোনো কথাই বলা হয়নি। উপরন্তু রাজ্যগুলিকে বলা হয়েছে, রাজ্য 'বাজেটে' ব্যয়ের প্রধান এবং প্রথম খাত হবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং দ্বিতীয় প্রধান খাত হবে শিক্ষা। বর্তমানে রাজ্যগুলি তার বাৎসরিক ব্যয়-বরাদ্দের ১২ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ ধার্য করে শিক্ষার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান আর্থিক বছরে বরাদ্দ করে তার মোট ব্যয়-বরাদ্দের ৪·৩ শতাংশ। রাজ্যগুলির কাছে ঐ নির্দেশ শুধু অবাস্তবই নয়, কেন্দ্রের প্রগলভতাপূর্ণ প্রলাপ। এইসাথে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, যে রাজ্য কেন্দ্রের বর্তমান প্রস্তাব পুরোপুরি মান্য করবে না, সেই রাজ্য একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্প বাবদ অনুমোদিত ব্যয়ের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাবে, আর যে রাজ্য অক্ষরে অক্ষরে কেন্দ্রীয় প্রস্তাব মেনে নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তারা ঐ প্রকল্প বাবদ অনুমোদিত ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ পাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে। এর একটাই নির্গলিতার্থ বিষয় কোনো রাজ্যই ঐ টোপ গলাধঃকরণ করে কেন্দ্রের ৭৫ শতাংশ অর্থ পাবে না। কপিল সিবাল কমিটির হিসাবে বলা হয়েছে, ২০০৫-০৬ বছরে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের ১ কোটি ৭৯ লক্ষ শিশু এবং ১১ থেকে ১৩ বছর বয়সের ২ কোটি ৭৪ লক্ষ শিশু একুনে ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ শিশু শিক্ষার অঙ্গনের সম্পূর্ণভাবে বাইরে রয়ে গেছে। ঐ রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, ২০১১-১২ বছরের মধ্যে সারাদেশে ৬ থেকে ১৩ বছর বয়সের শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ২ কোটি ৭২ লক্ষ। স্বাভাবিকভাবে এদেরও শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আনতে হবে।

বলতে দুঃখ হয় কিন্তু এটাই নিষ্ঠুর সত্য, এই প্রথম, কেন্দ্রীয় সরকার প্রারম্ভিক শিক্ষা বিস্তারের সমস্ত আর্থিক এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব থেকে সুকৌশলে দূরে থাকতে প্রয়াসী হয়েছে। বি জে পি পরিচালিত সরকার শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহাওয়ায় কলুষিত করতে উদ্যত হয়েছিল, আর বর্তমান সরকার শিক্ষাকে সংবিধানের যুগ্ম-তালিকায় রেখে দিয়েও তার প্রতি কর্তব্যপালনে অস্বীকার করতে সচেষ্ট হয়েছে। এত শিক্ষা কমিটি/কমিশনের সব সুপারিশকে অগ্রাহ্য করার নিকৃষ্ট উদাহরণ রচিত হলো। দেশব্যাপী এর বিরুদ্ধে শিক্ষা-আন্দোলন সংগঠিত করার প্রশ্ন আজ জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। শিক্ষা তথা দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

সৌজন্যে ঃ গণশক্তি, ২৫শে আগস্ট, ২০০৬

এস টি এফ আই-এর নেতৃত্বে আগামী ২২ শে নভেম্বর, ২০০৬,
১৫-দফা দাবির ভিত্তিতে
সারা ভারতের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক
শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের দিল্লীতে

সংসদ অভিযান

সফল করুন

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

সর্বশিক্ষা অভিযান ঃ নতুন প্রস্তাবনার স্বরূপ

[প্রবন্ধটি অধ্যাপক উজ্জ্বল বসু (সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ)-র সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত]

সর্বশিক্ষা অভিযানের মৌলিক লক্ষ্য দুটি —

(এক) শিক্ষার অঙ্গনে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে শামিল করা। এই আশু কাজটি প্রাথমিকভাবে সম্পন্ন হয় প্রথম শ্রেণিতে সমস্ত খুদে পড়ুয়াদের অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যদিয়ে ; অর্থাৎ শতকরা একশো ভাগ নথিভুক্তিকরণ বা enrolment। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় 'নিপা' (NIEPA) জানাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মোট enrolment ছিল ৯৩,৯৪,৮৩৬। এর মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা হলো ৪৬,৪৭,৫০৫। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে এই সংখ্যা হলো যথাক্রমে ৩৪,৭৫,৬৫৬ ও ১৬,৮২,২৮৫। এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতাভুক্ত।

(দুই) শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি-হওয়া ছাত্রছাত্রীদের ধরে রাখা (Retention)। রিটেনশন-এর ক্ষেত্রে সমস্যা হলো স্কুল-ছুট বা drop-out-এর। স্কুল-ছুট বা drop-out-এর সঙ্গে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো আর্থ-সামাজিক চালচিত্রটি। রাজ্যের চালচিত্রের উপর, বলা বাহুল্য, সর্বভারতীয় আর্থ-সামাজিক অভিঘাত অনস্বীকার্য। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ সাক্ষরতা ও বালিকা-শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা লক্ষণীয় জোয়ার এনেছে। ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে শিক্ষাঙ্গনে পাঁচ থেকে চোদ্দ বছরের শিশু-কিশোর-কিশোরীদের প্রবেশ। এই জোয়ারকে ঠিকমতো ধরে রেখে উৎকৃষ্ট শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে পড়ুয়াদের প্রস্তুতিকরণ (স্টুডেন্ট প্রিপারেশন)। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে সামাজিক পুনর্গঠনের হাতিয়ারে পরিণত করা ; অর্থাৎ মানবসম্পদের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সদ্ব্যবহার।

ইউনেস্কোর মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিবেদন যে নির্গলিত সত্যটিকে হাজির করেছে তা হলো পৃথিবীর যে-সব দেশে সাক্ষরতা ও নারীশিক্ষার কাঙ্ক্ষিত পথে অগ্রগতি হয়েছে সে-সব দেশে সামাজিক সমানাধিকার ও পুনর্গঠন ইতিবাচক বাঁক নিয়েছে। যে-সব দেশে শিক্ষার গুণগত মানের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে-সব দেশে মানবসমাজে দেখা দিয়েছে উল্লেখযোগ্য সুষম উন্নয়ন। সর্বশিক্ষা অভিযান এই ভারসাম্য রচনার এক শক্তিশালী হাতিয়ার।

একবিংশ শতকের তথাকথিত বিশ্বায়ন শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে এক প্রতিযোগিতামূলক আবহ রচনা করেছে। আজকের দুনিয়ায় শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ ব্যতিরেকে এই প্রতিযোগিতায় অস্তিত্ব বজায় রাখা দুষ্কর। সর্বশিক্ষা অভিযানের উদ্যোগ শিক্ষা পরিচালনার উৎকর্ষসাধনে এক বিশেষ অভিমুখ নির্দেশে দৃঢ়সংকল্প।

এই প্রেক্ষায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে নানা প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সর্বশিক্ষার যে দু'টি মাত্রা প্রধান হয়ে উঠেছে তা হলো পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ ও মানবিক ক্ষমতায়ন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক জ্ঞানের উন্মেষ ও বৃত্তিগত অবস্থানকে দৃঢ়ভূমিতে সংস্থাপন। প্রাচীন রোমান রাজনীতিক, বাগ্মী সিসেরো মন্তব্য করেছিলেন যে মানুষের জীবনে দুটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো ঃ 'কী হবো' ও 'কেমন হবো'। অর্থাৎ সমাজে ব্যক্তি-মানুষের বৃত্তিগত অবস্থান কী হবে এবং সামাজিক অবস্থান কী রকম হবে। সর্বশিক্ষা অভিযানে শিক্ষাকে সঠিক বৃত্তি অনুসরণের হাতিয়ার করা ও মানুষের যথার্থ মানবিক গুণগুলির উন্মেষ ঘটানোর আয়োজন সর্বাত্মক করে গড়ে তোলার উদ্যোগের সংকল্প সুস্পষ্ট।

সঠিক বৃত্তি নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন হলো প্রাথমিক ও

মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষায় হাতে-কলমে জ্ঞানার্জন ও কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থা করা। এরজন্য প্রয়োজন সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষা (learning by doing) এবং সমবায়িত শিক্ষা (participatory learning) সুনিশ্চিত করা। অংশগ্রহণমূলক শিখনের ভিত্তি হলো একটা সুষ্ঠু পাঠক্রমের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সম্মিলিত প্রচেষ্টা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা গঠন এই প্রচেষ্টার মূল কথা। কী শিখতে হবে সে সম্পর্কে তার ধারণা স্বচ্ছ হওয়া জরুরি। সেজন্য চাই পাঠ্য উপাদানগুলিকে সামর্থ্যসূচক করে গড়ে তোলা। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুগুলি সম্পর্কে যথার্থ ধারণা শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত করা দরকার। আর সে কাজ সম্পাদনে শিক্ষকসমাজকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করা (teacher empowerment) বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষক নিজে যদি যথার্থ জ্ঞানাধিকারী না হন তাহলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানান্বেষণে প্রভূত ঘাটতি থাকার সম্ভাবনা। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ায় এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছিল। জ্ঞানার্জনের সঠিক মানসিকতা গঠনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়পক্ষের কাছেই এক জরুরি প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয় এক নতুন চিন্তাধারার মাধ্যমে। সোভিয়েতে এই চিন্তাধারাটি Pedagogic Psychology নামে পরিচিতি লাভ করে। এই চিন্তাধারায় শিক্ষকের জ্ঞানার্জনের (teacher cognition) চিন্তাধারার ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করে ঘোষণা করেন — দু'টি প্রধান গুণ শিক্ষকের মধ্যে সমন্বিত হলে জনশিক্ষা প্রসারে তিনি সঠিক ভূমিকা পালনে সমর্থ হবেন। এই অনপনেয় গুণ দুটি হলো ঃ শিক্ষকের থাকবে নিরন্তর জ্ঞানস্পৃহা এবং সম্পূর্ণভাবে সংস্কারমুক্ত চেতনা। সর্বশিক্ষা অভিযান শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষককে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়াসী। এবং সেই মর্মে সামগ্রিক শিক্ষক অভিমুখীকরণ কর্মসূচি সর্বশিক্ষা অভিযানের এক অনিবার্য অনুষঙ্গ।

শিক্ষক অভিমুখীকরণের যে কর্মসূচি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গ্রহণ করেছে তার যথার্থ সুরক্ষার জন্য দু'ধরনের জরুরি দলিল রচিত হয়েছে। একটির মধ্যে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের বিবিধ অনুষঙ্গ ও সেগুলির প্রায়োগিক কৃৎকৌশল বিধৃত হয়েছে এবং অপর ধরনের দলিল বিষয়ভিত্তিক। এগুলির সাধারণ নাম প্রশিক্ষণ সহায়িকা (নতুন অভিমুখ)। সেই সঙ্গে ইংরেজি (দ্বিতীয় ভাষা) শিক্ষণ-শিখনের অনুকূলে A PRACTICE MODULE FOR TEACHER TRAINING-ও প্রকাশ করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সহায়িকা (নতুন অভিমুখ)গুলি নির্দিষ্ট বিষয়শিক্ষার শ্রেণিকক্ষে সুস্পষ্ট প্রতিফলনের জন্য 'মডিউল' আকারে গ্রথিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক অভিমুখীকরণ কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে শ্রেণিকক্ষে পাঠক্রম পরিচালনার জন্য পাঠ্যবিষয়কে চারটি নির্দিষ্ট ভাগে বিন্যস্ত করে সক্রিয়তাভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক শিখন-শিক্ষণ সম্পন্ন করার প্রয়াস নেওয়া হয় ১৯৮৯ সালের স্কুলভিত্তিক কর্মশালার মাধ্যমে। প্রতিটি বিষয়ের পাঠক্রমকে জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ, দক্ষতার মানদন্ডে একক এবং উপ-এককে ভাগ করে পাঠগ্রহণ ও পাঠদানকে পরিচালনা করার নির্দিষ্ট প্রকৌশল রচনা করা হয়। সমগ্র দলিলটি 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' নামে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ১৯৮৯সালে প্রকাশ করে। সর্বশিক্ষার মঞ্চে নতুন প্রশিক্ষণ সহায়িকার দলিলটি গৃহীত হয়েছে। ১৯৮৯-এর দলিলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা (scholastic learning) ও সহ-পাঠক্রমিক (co-scholastic) ও পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম (non-scholastic) দুইয়েরই ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। সর্বশিক্ষা অভিযানের নিরিখে বর্তমান দলিলটিতে নতুন অভিমুখ সংযোজিত হয়েছে।

১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন-এ "এডুকেশন ফর্ অল্" বা "ই এফ্ এ" প্রস্তাবনা গৃহীত হয়। Access, Retention, Quality এবং Social Guarantee নির্দেশাত্মক নীতি হিসেবে 'ই এফ্ এ' কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। তখন এই কর্মসূচি পশ্চিমবাংলায় সর্বজনীন শিক্ষা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পটি সর্বজনীন শিক্ষার কর্মসূচির যুগলবন্দি বলা চলে। কোঠারি কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে Broad-based general education হিসেবে আখ্যাত করেছিলেন। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমে Representative Man হিসেবে প্রতিটি নাগরিককে গড়ে তোলা শিক্ষা পরিকল্পনার আদর্শ হওয়া উচিত বলে কোঠারি কমিশন মন্তব্য করেন। সাধারণভাবে দু'টি ভাষায় দক্ষতা ; গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান ও সচেতনতা এবং গুরুত্বপূর্ণ মানবিক গুণাবলির উন্মেষ যথার্থ মনুষ্যত্ব বিকাশের ভিত্তিভূমি — এই হলো

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। সর্বশিক্ষা অভিযান এই লক্ষ্যে নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে। আজকে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বে এক মানবিক সংকট উপস্থিত। জাতিবিদ্বেষ ও দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, হিংসাশ্রয়ী সন্ত্রাস তথাকথিত বিশ্বায়ন-পরবর্তী মনুষ্যসমাজকে দীর্ণবিদীর্ণ করে চলেছে। শিক্ষাকে হাতিয়ার করে এই সংকট ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শিক্ষকই শিক্ষার বিধান। প্রণালী-প্রকরণ ফাঁক পূরণ করতে পারে মাত্র। সর্বশিক্ষা অভিযানের নতুন দলিলটিতে, বিশেষ করে বিষয়ভিত্তিক মডিউলগুলিতে, শিক্ষাদানের নানাবিধ প্রণালী-প্রকরণ তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রানুসারী বঙ্গসমাজের অনুভূতি আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিয়ে শিক্ষককুল যাতে দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরির কাজে যথার্থভাবে প্রয়াসী হতে পারেন তার জন্য মূল 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' (নতুন অভিমুখ) দলিলটিতে আদর্শ মানুষ গড়ার নির্দিষ্ট সনদ উপস্থাপিত হয়েছে। দলিলটির তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে মানুষের 'কী হবো' ও 'কেমন হবো'-র স্বপ্নসাধনের সূত্রগুলি উন্মীলিত হয়েছে। সচ্চিন্তা ও কর্মসম্পাদনে পারঙ্গম মানুষ হিসেবে পড়ুয়াদের যাতে আত্মবিকাশ ঘটে তারজন্য পঠন-পাঠন ও মূল্যায়নের সামর্থ্যভিত্তিক অভিমুখের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াস নতুন দলিলটিতে সুস্পষ্ট। ছেলেবেলা থেকেই যাতে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণে সমর্থ হয় এবং তারজন্য সাথী-সঙ্গীরা যাতে মিলেমিশে শিখন-পঠনে সুপটুত্ব অর্জন করে তার সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনাও এই দলিলটির অন্যতম লক্ষ্য। এরই সম্প্রসারিত আয়োজন হিসেবে নির্দিষ্ট সামাজিক প্রতিবেশে গড়ে-ওঠা বিদ্যালয়সমূহ পারস্পরিক সহযোগিতার বাতাবরণে যাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে (বিদ্যালয়গুচ্ছ) তার যোগসূত্র এই দলিলের অন্যতম অবদান। যান্ত্রিক পরীক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার সঞ্চালন এক স্থবিরতায় (mental cramp) পৌঁছে গেছে। অহৈতুকী এবং অসুস্থ প্রতিযোগিতার রুদ্ধশ্বাস বাতাবরণ সামাজিক বিকাশকে বদ্ধ জলাভূমিতে নিক্ষেপ করতে উদ্যত। পরীক্ষার মানসিক চাপ থেকে ছাত্রসমাজকে উদ্ধার করা একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। পরীক্ষা সংস্কারের প্রশ্নটি আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ব্যবস্থা কার্যকর করে এই চাপের থেকে ছাত্রসমাজের শাপমুক্তি একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে শিক্ষকদের উদ্যোগী হবার সুযোগ নতুন দলিলটিতে রচিত হয়েছে। মানসিক চাপ নিরসন ও সংশোধনী পাঠের প্রয়োজনে গ্রেডিংয়ের ভাবনাও উঠে এসেছে।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার পরিকল্পনা-প্রকৌশল দলিলটির অন্যতম দিক। ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা, সংকীর্ণ দেশাচার ও লোকাচারের আবর্ত থেকে সমাজকে বেরিয়ে আসতে ভবিষ্যতের নাগরিক আজকের এই ছাত্রসমাজই নেতৃত্ব দিতে পারে। বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত পরিচালককুল পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, লিঙ্গ সমতার বাস্তবায়ন, মানুষের অধিকার তথা নারীর সমানাধিকার, ইত্যাদির আশু সামাজিক মূল্যবোধ গঠনের সংস্থান রেখে শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্যকে ভাস্বর করে তুলতে যাতে বিশেষভাবে প্রয়াসী হন তারও সুলুকসন্ধানের সনদ নতুন অভিমুখ আখ্যায়িত সর্বশিক্ষার এই প্রশিক্ষণ সহায়িকা দলিলটি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ শিক্ষক অভিমুখীকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে এই দলিলটির সুরক্ষা ও কার্যকর সঞ্চালনে উদ্যোগী হয়েছে।

অনুলিখন ঃ **বংশীধর সাহু**
সদস্য, খাতড়া মহকুমা কমিটি, বাঁকুড়া
নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

[উপলক্ষ্য ঃ ১২-১৫ জুলাই, ২০০৬ সময়কালে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আয়োজিত ও মুকুটমণিপুরে অনুষ্ঠিত সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পের অন্তর্গত শিক্ষক অভিমুখীকরণ কর্মসূচি (ইংরেজি) চলাকালীন গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত।]

রাজ্যের বৃত্তিমূলক শিক্ষা একটি নতুন সম্ভাবনা

চক্রধর মেইকাপ

রাজ্যে প্রতিবছর মাধ্যমিক-পরবর্তী স্তরে আর্থ-সামাজিক কারণে এবং প্রথাগত শিক্ষার ভার সহ্য না করতে পেরে দুই থেকে তিনলক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অষ্টম শ্রেণি-উত্তীর্ণ বেশ কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রীও একই কারণে বিদ্যালয় শিক্ষার মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিক্ষার মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মধ্যদিয়ে সামাজিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। অন্যদিকে বর্তমান সময়ে নগরায়ন ও শিল্পায়নের সম্ভাবনা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবার সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। রাজ্য সরকার এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রাজ্যের কারিগরি দপ্তরের অধীনে তৈরি করছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংসদ। রাজ্যে অষ্টম শ্রেণি-উত্তীর্ণ এবং মাধ্যমিক-পরবর্তী স্তর থেকে পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে পরবর্তী জীবনে আত্মমর্যাদা বাড়িয়ে তুলে স্বনির্ভর করার লক্ষ্য নিয়ে এই সংসদ গঠন করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সঠিক পরিচালনা ও প্রয়োগের লক্ষ্যে ২০০৫ সালের মে মাসে "West Bengal Act VII of 2005" অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের অধীনে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পর্যদ কাজ শুরু করেছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিকার তৈরি না হওয়া অবধি সরকারী আদেশনামায় কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিকারের উপর উক্ত শিক্ষার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্মে পরিচালনার ভার অর্পিত হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে রাজ্য স্তরে একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সারা দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এবং অষ্টম শ্রেণি-পরবর্তী স্তরে কয়েকটি শাখাকে নির্বাচন করা হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ২০০৫ সালের শিক্ষাবর্ষে চালু হওয়া ৪টি শাখার নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে "ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি", "এগ্রিকালচার", "বিজনেস অ্যান্ড কমার্স" এবং "হোমসায়েন্স"। সংসদ আগামীদিনে "প্যারামেডিক্যাল" শাখায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে অষ্টম শ্রেণির পরবর্তী স্তরে ৬ মাস মেয়াদী মোট ৩৭টি যুগোপযোগী বৃত্তিমূলক ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ডঃ অশোক মিত্র কমিশন (১৯৯১-৯২) অষ্টম শ্রেণি-উত্তীর্ণ স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের প্রস্তাবনা করেছেন। আমাদের বিশ্বাস, এই স্তরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা এলাকার চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন বৃত্তিতে ৬ মাস মেয়াদী এই সব কোর্সে প্রশিক্ষণান্তে স্বনিযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বনির্ভর এবং সহায়ক গোষ্ঠীতে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার (১০+২) স্তরে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা উচ্চমাধ্যমিক সমতুল্য শংসাপত্র পাবে। এই স্তরের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষান্তে বিভিন্ন শিল্পসংস্থার অ্যাপ্রেনটিসশিপ ট্রেনিং ও চাকরির পাশাপাশি উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ যাতে নিতে পারে তারজন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। আশা করছি, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা ইতিবাচক সাড়া পাবো। এই রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি শাখায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পরিচালিত বিভিন্ন পলিটেকনিকে ২০টি আসন প্রথমবর্ষে সংরক্ষিত আছে। আমরা চেষ্টা করছি উক্ত ছাত্রছাত্রীরা যাতে সরাসরি দ্বিতীয়বর্ষে ভর্তি হতে পারে এবং এই আসনসংখ্যা আরো কিছু বাড়িয়ে (মোট আসনের ১০%) বৃত্তিমূলক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ কিছুটা বাড়ানো যায়। "এগ্রিকালচার" শাখায় বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শাখায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা চলছে। অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রেও আমরা উচ্চশিক্ষার কিছুটা সুযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছি।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আরো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এর সঙ্গে আলোচনা করছি। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছি। বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ভোপালের পণ্ডিত সুন্দরলাল শর্মা সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ভোকেশনাল এডুকেশন এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও রাজ্যের কারিগরি শিক্ষার

সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত গণ-সংগঠনের সঙ্গে এই রাজ্যের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণের লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, সে নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছি। আমি মনে করি, এরাজ্যে স্বনিযুক্তি প্রকল্প ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের কাজে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সহায়ক ভূমিকা পালনের কর্মসূচি আগামীদিনে গ্রহণ করা হবে।

উচ্চমাধ্যমিক (১০+২) স্তরে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক বিষয় স্থির করা হয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলি থেকে ছাত্রছাত্রীরা একটি বিষয় নির্বাচন করে ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পাবে। সংসদ-নির্দেশিত এইসব বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি — সিভিল কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেন্টেন্যান্স টেকনোলজি, অটোমোবাইল মেকানিক, কনজিউমার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিকস মেকানিক, এয়ারকন্ডিশনার অ্যান্ড রেফ্রিজারেটর মেকানিক, আই টি এনাবেল সার্ভিস, কম্পিউটার অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড মেন্টেন্যান্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন।

এগ্রিকালচার — মাশরুম কালচার, হর্টিকালচার, নার্সারি ম্যানেজমেন্ট, ডেয়ারি ফার্মিং, ফ্রুট প্রিজারভেশন অ্যান্ড প্রোসেসিং, কমপোস্ট অ্যান্ড ভার্মি কমপোস্ট ইত্যাদি।

হোমসায়েন্স — ফ্রুট প্রিজারভেশন অ্যান্ড প্রোসেসিং, হেল্থ কেয়ার, ইন্টেরিয়ার ডেকরেশন, গারমেন্ট ডিজাইন, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট।

বিজনেস অ্যান্ড কমার্স — লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্স, মার্কেটিং অ্যান্ড সেলসম্যানশিপ, ট্রাভেল ট্যুরিজম, ফার্নিচার অ্যান্ড ক্যাবিনেট মেকিং, স্টোর অপারেশন ইত্যাদি।

বিভিন্ন এলাকার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বৃত্তিমূলক বিষয় আরো সংযোজনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের পরামর্শ আহ্বান করছি।

অষ্টম শ্রেণি-উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংসদ যে স্বল্পমেয়াদী বৃত্তিমূলক শিক্ষা নির্দিষ্ট করেছে সেগুলি হলো — আমিন সার্ভে, ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়্যারিং অ্যান্ড মোটর ওয়াইন্ডিং, সার্ভিসিং অফ ডোমেস্টিক ইলেকট্রিক্যাল প্রোডাক্টস ২/৩ হুইলার মেকানিক, অটো ইলেকট্রিশিয়ান, অটোমোবাইল চেসিস পেইন্টিং অ্যান্ড মেন্টেন্যান্স, ডিজেল পাম্প সেট রিপেয়ারিং, রুরাল স্যানিটেশন অ্যান্ড স্যানিটারি প্লাম্বিং, মেকানিক রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন, মেকানিক নন-কনভেনশনাল ইলেকট্রিফিকেশন, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি, প্লাম্বিং, উডেন ফার্নিচার মেকিং, টেলিফোন অ্যান্ড মোবাইল সেট রিপেয়ারিং, মেরিন ফিশারিজ, অর্নামেন্টাল ফিস কালচার, এগ্রিকালচার ইমিপ্লিমেন্টস মেকানিক, মাশরুম কাল্টিভেশন অ্যান্ড ভার্মি কমপোস্টিং, টেলারিং, কমার্শিয়াল আর্ট, ম্যানুফ্যাকচার অফ জ্যাম, জেলি অ্যান্ড পিকল্স, সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং, ক্রেশ ম্যানেজমেন্ট, জরিওয়ার্ক অ্যান্ড কাঁথা এমব্রয়ডারি, টয় মেকিং, রুরাল মার্কেটিং, ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস, প্যাকেজিং অ্যান্ড মার্কেটিং, ব্লাড কালেকশন অ্যাসিস্টান্ট অ্যান্ড হেল্থ ওয়ার্কার ইত্যাদি।

সংসদ এই রাজ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রসারের লক্ষ্যে ২০০৫-০৬ সালে মোট ৫০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দিয়েছে। এদের মধ্যে ৮৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গত শিক্ষাবর্ষে পাঠক্রম শুরু করেছে। অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমান বছরে জুলাই মাস থেকে ছাত্রভর্তি শুরু করেছে। এই আর্থিক বছরে আরও ১০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার অধীনে আনার পরিকল্পনা নিয়েছি। ইতোমধ্যে অষ্টম শ্রেণি-উত্তীর্ণ স্বল্পমেয়াদী কোর্সে ৮০০ জন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজ্যের মোট ১২টি পলিটেকনিকে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও যেসব অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বৃত্তিতে উপযুক্ত সার্টিফিকেট না থাকা সত্ত্বেও দক্ষ কারিগরি হিসাবে প্রশিক্ষক চিহ্নিত করেছেন, তাদের বিভিন্ন আই টি আই ও অন্যত্র দক্ষতা যাচাইয়ের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ইউনেস্কোর কারিগরি বৃত্তিমূলক শাখার রিপোর্টে উন্নত দেশগুলি থেকে চীন, ভারতের মতো দেশগুলিতে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সেইসব ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রিপোর্টে মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ইউরোপে ৫০% এবং পূর্ব এশিয়ার ৩৪% ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের যে সুযোগ তৈরি হচ্ছে এই পরিসংখ্যান তারই একটি ইতিবাচক প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার সামাজিক সম্মান প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাপক জনমত সংগঠিত করতে হবে। রাজ্যের বিভিন্ন গণ-সংগঠন, শিক্ষাব্রতী মানুষের সম্মিলিত প্রয়াস রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে একটি পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বগ্রাসী আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের এই নতুন সোপান প্রকৃত অর্থেই বিকল্প পথের সন্ধান দেবে এই আমার বিশ্বাস।

(লেখক পশ্চিমবঙ্গের কারিগরি শিক্ষাদপ্তরের মন্ত্রী)

সৌজন্যে ঃ গণশক্তি, ২৪শে জুলাই, ২০০৬

বিদ্যালয় স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ঃ শিক্ষার নতুন দিগন্ত

আজকের প্রসঙ্গ যখন লিখতে বসেছি তা যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হবে তার চারদিনের মাথায় ভারতের 'স্বাধীনতা দিবস' ; ক্যালেন্ডারে তারকা-চিহ্নিত দিন। আমার বা আমাদের মনেও ষাট বছর আগে ঐ দিনের আগমনের শুভক্ষণে যে আকাশ লাখ লাখ উজ্জ্বল তারকার দূরাগত দ্যুতিতে ঝলমল করে উঠেছিল, যা আজও স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে বহন করে চলেছি। তারও পিছনে তাকালে পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের সেই রক্তঝরা দিনগুলিকে মনের পর্দা উঠলেই দেখতে পাচ্ছি। ২৯শে জুলাই। মনে পড়ছে মৃত্যুপথযাত্রী সুকান্ত ভট্টাচার্যের যে প্রত্যয়-ভাস্বর কালজয়ী কবিতা ঃ 'অনুভব'।

আবার দেখছি — আকাশ ছেয়ে গিয়েছে কালো ধোঁয়ায়। মহানগরীর রাস্তায় পড়ে আছে শবের সারি। কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান ; নোয়াখালি, বিহার। গান্ধীজী হেঁটে চলেছেন ঐ দুই দাঙ্গাবিধ্বস্ত পথে।

তারই মধ্যে এলো ঐ দিন — এলো ১৫ই আগস্টের উপর আলো। ওপারের ভাইরা ১৪ই আগস্ট অর্থাৎ একদিন আগে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করলেন। ওঁরা করলেন পাকিস্তানে। আমরা করলাম হিন্দুস্থানে। পরবর্তীকালে ভারত ইউনিয়ন।

সেই স্বাধীনতা আজ 'বৃদ্ধ'। 'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজ্যে'। তবে বন কেটেছি। কিন্তু নরপশুদের জন্মহার বেড়েছে। অযোধ্যা, ভাগলপুর, মুম্বাই, গুজরাট — কত জনপদের পথেঘাটে শুনছি নারকীয়তা ও বর্বরতার কাহিনি। ধর্মান্ধ মানুষ আজ হিংস্রতা, বর্বরতা ও অমানুষিকতাকে 'ধর্মীয়' কার্য বলে মনে করছেন। তাঁদের মধ্যে আমারও আত্মজন ক'জন আছেন জানি না। আগে তোমার 'ধর্ম', তারপর তোমার আর সবকিছু, বুদ্ধ, যীশু, হজরত মহম্মদ প্রকৃতপক্ষে বরবাদ। বরবাদ শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ, বাতিল নানক, কবীর, দাদু, রবিদাস, মৈনুদ্দিন চিস্তি প্রমুখ সব সাধকপুরুষ। যাঁরা মানুষের কল্যাণ কামনা করেছেন সারা জীবন। সিরাজ সাই — লালন ফকির, রামমোহন, ডিরোজিও, দীনবন্ধু মাইকেল, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র-শিবলাল কায়কোবাদ-মীর মোশারফ হোসেন-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুল ইসলাম আজ তাঁরা 'কেবলি ছবি'। তিতুমীর-দুদু মিঞা-সিধো-কানহু-দিগম্বর বিশ্বাস — একই পরিণতি তাঁদের সকলের।

আজাদ হিন্দ ফৌজের শাহনওয়াজ-সায়গল ধীলন, তেভাগার শহীদরা, রামেশ্বর, সালামরা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে।

না একেবারে হারায়নি। ভাঙ্গা তরী ছেঁড়াপাল নিয়েও স্বপ্ন দেখছি — এ নহে কাহিনী/এ নহে স্বপন/আসিবে সেদিন আসিবে।

এ পিন্টোগ্রাফ দেখেছিলাম কালীঘাটে কমরেড মণিকুন্তলা সেনের বাড়িতে। সে তো চল্লিশের দশকের কথা। আজও তা মনের মণিকোঠায় রেখেছি সমাজতন্ত্রের সূর্যোদয় হবেই। তবে, রাতের অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করে তা ছিনিয়ে আনতে হবে।

আজ লেখার ইচ্ছা কারিগরি শিক্ষা নিয়ে। 'মন বনের নাও' ভারতরঙ্গে ভেসে পৌঁছাল ষাটবছর আগে। ঠেকানো গেল না। কোনো কোনো জিনিস ঠেকানো যায় না। আমার চিন্তা, আমার আদর্শ, আমার কাজ — এর সবকিছুর মধ্যেই তো সেই অতীতও মুখর হয়ে আছে। সত্য হয়ে আছেন কার্ল মার্কস-ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-ভি আই লেনিন-স্তালিন-মাও সে তুং-হো চি মিনরা। আবার কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। কমরেড আবদুল হালিম-কমরেড রেবতী বর্মণ সহ অনেক কমিউনিস্ট।

এবার আপাতত যেটা 'আসল কথা' আমার তার দিকে তাকানো যাক।

গত ২৪শে জুলাই সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী চক্রধর মেইকাপ 'গণশক্তি' পত্রিকায় একটি বিশেষ প্রবন্ধ লিখেছেন।

তিনি লিখেছেন — "পশ্চিমবঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সঠিক পরিচালনা ও প্রয়োগের লক্ষ্যে ২০০৫ সালের মে মাসে "West Bengal Act VII of 2005" অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষাদপ্তরের অধীনে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পর্যদ কাজ শুরু করেছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিকার তৈরি না হওয়া অবধি সরকারী আদেশনামায় কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিকারের উপর উক্ত শিক্ষার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনার ভার অর্পিত হয়েছে।"

এরপরে শ্রীমেইকাপ কীভাবে রাজ্য সরকার বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তরে প্রসারিত করার কথা ভেবেছে এবং ঐ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করে তা প্রবর্তনে এগিয়েছে, তার

বিবরণও দিয়েছেন। রাজ্য সরকার বিগত শতকের নব্বই-এর দশকের প্রথমভাগে এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক একটা পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। অধ্যাপক ডঃ অশোক মিত্রের নেতৃত্বে ঐ কমিশন গঠিত হয়। ঐ কমিশন শিক্ষার বিভিন্ন দিকের সমস্যাদি পর্যালোচনা করে যে সুপারিশ পেশ করেন, তার অন্যতম বিষয় ছিল বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষা, যার অর্থ হলো — প্রথাগত যে শিক্ষা, যার লক্ষ্য চাকরি, বি এ, এম এ বা বি এসসি, এম এসসি বা বি কম, এম কম পাশ করা। ঐ অভিজ্ঞানপত্র সম্বল করে অফিসে আদালতে বা ডালহৌসি স্কোয়ারে (বর্তমানের বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ)-র সওদাগরি অফিসে, ব্যাঙ্ক কিংবা বীমা কোম্পানিতে কনিষ্ঠ কেরাণি (স্মরণ করুন, রবীন্দ্রনাথের হরিপদ কেরাণি) বা জন্মের ষষ্ঠদিবসে যদি মা ষষ্ঠী দেবী কপালে লিখে থাকেন, তাহলে অফিসার পদের চাকরি জোটা, স্কুলে বা কলেজের মাস্টারি (সেটা অগ্রগতির গতি। যার নাই কোনো গতি, সে করে পতিতি) যোগাড় করে — এই হলেই জীবন ধন্য। দারোগাবাবু হবার সুযোগ হলে আরও ধন্য (এক গেঁয়ো বুড়ি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন 'সাহেব তুমি দারোগা হও'।)

রাজ্য সরকার ঐ সুপারিশ গ্রহণ করে, তার ভিত্তিতে উচ্চ মাধ্যমিকের পরিবর্তিত পাঠ্যসূচিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যে ফার্মাসিউটিক্যাল শিক্ষার উপর জোর, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির (আই টি) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা, বেশ কয়েকটি বেসরকারী কিংবা বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগের সমন্বয়ঘটিত ঐ বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, প্রাণীসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা এবং মৎস্যর উৎপাদন কীভাবে বাড়তে পারে প্রভৃতি বিষয়ক শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতির দিকে নজর দেয়।

তবে মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, তা উপলব্ধি করে ঐ ক্ষেত্রের অগ্রগতি সাধনের যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপের কাজও শুরু করা হয়।

২০০১ সালে রাজ্য সরকার এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বার পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করে অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। তাঁর নেতৃত্বাধীন ঐ কমিটি বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও অতীত ইতিহাস আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় তার ভূমিকার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করলেন। 'জাতীয় শিক্ষা আইন, ১৯৮৬' — ঐ শিক্ষা কীভাবে দেওয়া হয়েছে, পরবর্তীকালে তার প্রয়োগ কীভাবে হয়েছে, তাও উল্লেখ করেছেন। আজকে কী তার গুরুত্ব, কেন এ পুনর্ভাবনা। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কমিটি তার বিশ্লেষণ করেছেন। মাধ্যমিক স্তরে কীভাবে ঐ শিক্ষা দেওয়া হতে পারে, তাও তুলে ধরেছেন। অনেকটা বিশদভাবেই তা করেছেন।

ঐ কমিটির প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার জন্য রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগী হয়েছে। সেই লক্ষ্যে পূর্বোল্লিখিত আইন রচিত হয়েছে। ঐ আইনের ভিত্তিতে এই সময়কালে রাজ্যের সব জেলারই কিছুসংখ্যক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এগিয়ে এসেছে। তাদের আবেদন অনুযায়ী নতুন তৈরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংসদও অনুমোদন দিয়েছে।

এই বিষয়ের আলোচনায় যাবার আগে কয়েকটি মৌলিক বিষয় আজকের এ প্রসঙ্গে আনতে চাইছি।

শিক্ষা রাষ্ট্রের শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গির অধীন। শিক্ষা প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার উপরিকাঠামোর বস্ত্র। এজন্য তারও একটা রাজনৈতিক রূপ আছে। শিক্ষাকে রাজনীতির আঙিনায় আনতে যাঁদের ঘোর আপত্তি, তাঁরা গান্ধীজী-সুভাষচন্দ্র-জওহরলাল নেহরু — এঁদের চিন্তাকেও অস্বীকার করছেন।

বলা বাহুল্য, আজকের যুগে ভারতের বুর্জোয়া জমিদার শাসকশ্রেণি তাদের ভঙ্গুর রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কোনোভাবে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে ও তাগিদে তা করছেন। যার সর্বনাশা পরিণামে শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতি দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক শিক্ষাচিন্তা ভীষণভাবে আক্রান্ত। যেখানে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার প্রতিনিয়ত চক্রান্ত হচ্ছে, সেখানে গণতান্ত্রিক চিন্তাকে রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা কীভাবে সহ্য করবেন।

ভারতে আধুনিক শিক্ষাকে প্রথম রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হলো ১৮৫৪ সালের উড্স ডেসপ্যাচ-এ। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা এদেশের কাঁচামাল নিয়ে গিয়ে বিলাতের নতুন গড়া কল-কারখানায় শিল্পজাত পণ্য তৈরি করে আবার স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতবর্ষের বাজারেই নিয়ে আসবেন। সস্তায় কাঁচামাল নেবেন, আর বেশি দামে শিল্পজাত পণ্য বেচবেন।

এ সময়ে চাই ব্রিটিশের নতুন তৈরি কলকারখানা ও অফিস আদালতের কিছু কর্মচারী। তাদের তো আধুনিক শিক্ষা দিতে হবে। তাই, আপামর ভারত সন্তান, তোমার লেখাপড়ার তেষ্টা নিবারণের জন্য মহামান্য কোম্পানি বাহাদুর দয়াপরবশ হয়ে সর্বসাকুল্যে এক লাখ টাকা মঞ্জুর করল।

ঐ অর্থের কীভাবে সদ্‌গতি বা সদ্ব্যবহার হবে। ভারতসচিব ভারতবাসীর কল্যাণার্থে তারও ব্যাখ্যা করলেন। লেখাপড়ার

ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষাও তিনি চাইলেন।

রেললাইন পাতা ও তা চালনার কাজে প্রয়োজনীয় সবাইকে তো বিলাত থেকে আনা যাবে না। লোহা চাই, তৈরি হলো লোহার কারখানা। বীরভূম জেলার মহম্মদবাজারে বার্ড কোম্পানি ভারত তথা এশিয়ার প্রথম ইস্পাত কারখানা তৈরি করল। এসবের জন্য লোক চাই। তাই, তাদের কারিগরি শিক্ষা দাও। ভাবনাটা ব্রিটিশ পুঁজি বা লগ্নিপুঁজির স্বার্থে। আবার এদেশী ইঞ্জিনিয়ারও চাই। নজরটা বেশি ছিল শেষের দিকে। ১৮৫৪ থেকে ১৯৪৪ অর্থাৎ দীর্ঘ নব্বই বছর যাবত বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষার জন্য অনেকগুলি কমিটি হয়েছে। তারা উচ্চশিক্ষার স্তরের কথা ভেবেছেন। মাধ্যমিক স্তরে কিছু কাজের সুযোগ সৃষ্টির কথাও ভাবা হয়েছিল।

প্রাক্‌-স্বাধীনতা পর্বে বুনিয়াদি শিক্ষাও স্বদেশী আন্দোলনের একটা অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, তারকনাথ পালিতরা তৈরি করলেন যাদবপুরের জাতীয় বিদ্যালয়, যা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। এর পাশাপাশি চলল বিভিন্ন আশ্রমে কুটির শিল্পের শিক্ষা, খদ্দর তৈরি তার জন্য তকলি কাটা, ঘানির তেল, কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, সাবান তৈরি — এইসব কাজ।

গান্ধীজী এগুলিকে 'বুনিয়াদি শিক্ষা'র অঙ্গ করলেন। ওয়ার্ধা সম্মেলনে তার রূপরেখা তৈরি হলো। জাতীয় পরিকল্পনাতেও এসব ভাবনা স্বীকৃত হলো।

স্বাধীনতা-উত্তরযুগে রাষ্ট্রনায়করা ধনতন্ত্র গড়ার জন্য উদ্যোগী হলেন। মুদালিয়র কমিশনে বহুমুখী শিক্ষায় কারিগরি বিদ্যা-কৃষি-বাণিজ্য শিক্ষার জন্য ভোকেশনাল কোর্সের কথা বলা হলো।

পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার যে সিলেবাস হলো তাতেও ভোকেশনাল কোর্স রইল। কিন্তু পড়ুয়ার সংখ্যা যৎসামান্য। ১৯৯৮ সালে যেখানে উচ্চমাধ্যমিকে মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ৩,৭৪,১৭৬ ; সেখানে ভোকেশনাল কোর্সে পড়ুয়া মাত্র ২,৬৯৬।

আমরা আধুনিক শিক্ষার ঊষালগ্ন থেকে শিখেছি যে লেখাপড়ার লক্ষ্য চাকরি। লেখাপড়া করে যেই, গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।

দ্রুত সেই স্বপ্নের মঞ্জিল ধসে গেল। কিন্তু ভাবনার জগতে ততক্ষণে ঐ ধারণার শিকড় গভীরে চলে গিয়েছে, তাকে কি উপড়ানো সহজ কাজ।

এখন চাকরিও নেই। 'কর্মসংস্থানবিহীন বৃদ্ধি'। ফলে একূল-ওকূল দুকূল গিয়েছে।

রাজ্যে কৃষির ক্ষেত্রে এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এরাজ্যে ১৯৬৭ সালের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সৃষ্টি থেকে ১৯৬৯ সালের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। আবার বুর্জোয়া-জমিদার শাসকশ্রেণির তৈরি অরাজকতার উজান ঠেলে এই বাংলার জনগণ ১৯৭৭ সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার তৈরি করলেন। এবার সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার তৈরি করেছেন এরাজ্যের মানুষ। ভূমিসংস্কার গ্রামবাংলায় নবজীবনের ঢেউ তুলেছে। আজ তাকে ভিত্তি করে শিল্পায়নের অভিযাত্রী আমরা। কৃষি ও শিল্পের সুযোগ্য সম্মিলন ও সমন্বয় সৃষ্টি করেছে নতুন প্রয়োজন।

কিন্তু আজকের পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য শিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন চাই। চাই গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। বাস্তব দৃষ্টিকোণ যা ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণিই গড়ে উঠতে দেয়নি, আজকেও বুর্জোয়া-জমিদার শাসকশ্রেণির পুরো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেটুকু নতুনত্ব আনার কথা বলা হচ্ছে, তাও নিতান্ত শ্রেণিস্বার্থের প্রয়োজনে।

গান্ধীজীর পরিকল্পিত 'বুনিয়াদি শিক্ষা' স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রবর্তিত হল না কেন ? দুর্গাপুর শিল্পনগরী তৈরি হলো। ভারি শিল্পের জন্য মিস্ত্রির যোগান দিতে তৈরি হলো আই টি আই। কিন্তু তখনও পণ্ডিত মানুষরা বুনিয়াদি শিক্ষাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিলেন।

১৯৭৫ সালে মাধ্যমিকের নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি রচিত হলো। তাতে অন্তর্ভুক্ত হলো কর্মশিক্ষা। কিন্তু কর্মের অভিজ্ঞতা নয়। কর্মশিক্ষার কী পরিণতি (দুর্গতি বলাই ভালো) হয়েছে, তা শিক্ষকরা জানেন। বড় অংশ খুশি। অভিভাবকবর্গ, বিশেষ করে শহুরে অভিভাবককুল বেশ খুশি। তবে একটা অসন্তুষ্টি শিক্ষাজগতে আছে। তার কারণ, নম্বর পাবার জব্বর সুবিধাটা নষ্ট হয়েছে। পরীক্ষা বৈতরণী পার হতে ঐ ঈশ্বরী পাটনি বেশ কাজে লাগত।

মাননীয় মন্ত্রীমশায়ের উল্লেখিত লেখা থেকে জানা গেল যে ২০০৫-২০০৬ সালে ৫০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সংসদ অনুমোদন দিয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা সুখবর। তবে মন্ত্রীমশাই তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখবেন যে অধিকাংশই গ্রামীণ বিদ্যালয়। শহুরে স্কুল বা পৌর এলাকার স্কুলের সংখ্যা খুবই কম। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই একথা লিখছি। সব কটা'য় হবে না কেন ?

কথা প্রসঙ্গে/দীপঙ্কর

সৌজন্যে ঃ দেশহিতৈষী, ১১ই আগস্ট, ২০০৬

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের

কেন্দ্রীয় সমাবেশ

দাবিসমূহ

- কেন্দ্রীয় সরকারকে সাম্রাজ্যবাদ তোষণনীতি প্রত্যাহার করতে হবে।
- শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারীকরণ বন্ধ করতে হবে।
- পেনসন ব্যবস্থার বেসরকারীকরণ বন্ধ করতে হবে।
- মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল-২০০৬ পুনর্বিবেচনা করতে হবে।
- ৮-১৬-২৪ বছর অন্তর পরবর্তী বেতনক্রমের সুপারিশ কার্যকরী করতে হবে।
- অবিলম্বে ৩৬টি বি এড কলেজের বি এড পরীক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান করতে হবে।
- শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।
- নতুন শিক্ষাকর্মীর পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং শূন্যপদে নিয়োগের অনুমতি দিতে হবে।
- ধর্মঘটের অধিকারকে আইনগত স্বীকৃতি দিতে হবে।
- শিক্ষা প্রশাসনের সর্বস্তরে আমলাতান্ত্রিক বাধা দূর করতে হবে।
- চিকিৎসাভিত্তিক ছুটির ঊর্ধসীমা বাতিল করতে হবে।
- কিদ্‌ওয়াই কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করতে হবে ...প্রভৃতি।

৩ নভেম্বর ২০০৬

বেলা ১টা

স্থান

রানি রাসমণি এভেনিউ কলকাতা

— বক্তা —

পার্থ দে

বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ও সমিতির নেতৃবৃন্দ

আত্মানুসন্ধান

দীপ্তি সিনহা

প্রধান শিক্ষিকা, হাওড়া মহারাণী গার্লস হাইস্কুল, হাওড়া

মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন বললেন, তার সঙ্গে চাই প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসা। কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত বললেন, "মানুষের বেসিক নীড পাঁচটি নয় ছ'টি— অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, প্রাথমিক শিক্ষা, চিকিৎসা এবং রবীন্দ্রনাথ।"

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ যিনি সব শিক্ষকের শিক্ষক—তাঁর জীবনাদর্শ, মূল্যবোধ শিক্ষকজীবনে অপরিহার্য। তিনি বললেন, "একটা দীপ অন্য একটা প্রদীপকে জ্বলাতে পারে না, যদি না সে নিজে জ্বলে, নিজে না আলো দেয়।"

শিক্ষকের নিজের চেতনায় যদি জ্ঞানের প্রদীপ, চেতনার প্রদীপ না জ্বলে সে কখনো অন্যকে জ্বালাতে পারে না। জ্ঞান-প্রদীপের জ্বলনের জন্য চাই নিরন্তর অনুশীলন। নিজ বিষয় এবং বিষয়ের বাইরে অন্যান্য বিষয়েরও ডুবুরীর মত আরও গভীর জ্ঞানানুসন্ধানের প্রয়োজন। নিরন্তর অনুশীলন আনে মানসিক-সাংস্কৃতিক-জাগতিক-বৈপ্লবিক চেতনা।

ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুষ্ঠু ধ্যানধারণা লাভের জন্য যে সব মূল্যবান গ্রন্থ আছে সেগুলি শিক্ষককে নিয়মিত পাঠ করতে হবে। নিজ বিষয়ের বাইরে অধ্যয়ন করতেই হবে। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ বলতেন, 'A teacher must be a constant reader'। ছুটি পড়লেই বেড়াতে যাওয়ার সঙ্গে বাড়তি পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, বিশেষ করে সাহিত্যপাঠ করতে হবে। মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ভাল সাহিত্যপাঠের ভূমিকা কোনোদিনই ম্লান হবে না।

শ্রেণিতে গিয়ে গতানুগতিক ভাবে শুধু পাঠ্যপুস্তকের বিষয়টুকু পড়িয়ে এলে শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হয় না। নীরস পড়ানো শিক্ষার্থীরা বিরস বদনে শোনে। শিক্ষার্থী বাড়তি কোনো প্রশ্নের উত্তরে পায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকের রক্তচক্ষু। নিজের জ্ঞানের স্বল্প-পরিসরতা ঢাকতে শিক্ষার্থীকে ধমক দিয়ে বলেন, "বেশী পাকামি করিস না, যা বলছি সেটা পড়"। অঙ্কের এমন শিক্ষকও আছেন নিজের পদ্ধতিতে অঙ্ক না করলে কেটে শূন্য বসিয়ে দেন।

শিক্ষক অর্থাৎ গুরুর 'গু' মানে অন্ধকার এবং 'রু' মানে আলো, অর্থাৎ শিক্ষকের কাজ জ্ঞানের দীপ দ্বারা শিক্ষার্থীকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসা, এরজন্য শিক্ষকের কাজ হবে গতানুগতিক দায়সারা ভাবে না পড়িয়ে বিষয়টি প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে বিষয়টির প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করা। গান্ধীজী বলেছেন, "The best teacher is he who inspires."

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ বলেছেন," The teacher gives the spark which will enable you to develop a new out-look on life and new kind of being."

কিন্তু আজকের দিনে একাংশের শিক্ষক দায়সারাভাবে সিলেবাস শেষ করে নিজকর্তব্য সম্পাদন করেন। ভুলে যান শিক্ষকতা শুধুমাত্র বৃত্তি নয়, এটা একটা ব্রত। ভুলে যান সমাজে তাঁর পরিচয় তিনি মানুষ গড়ার কারিগর।

এমন শিক্ষকও আছেন যিনি শ্রেণিতে দায়সারাভাবে পড়িয়ে নিজ কোচিং-এ পড়ার জন্য চাপ দেন। আর সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার মত কিছু বাছাইকরা প্রশ্ন কণ্ঠস্থ করানো হয়। এমন বিদ্যালয়ও আছে যেখানে কিছু শিক্ষক শ্রেণিতে ভাল করে পড়ান না অথচ নিজ কোচিং-এ পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি তৈরী করিয়ে সাময়িকভাবে ভাল ফল করান মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। তাতে শিক্ষার্থী বিষয়টি সম্যকরূপে শিখল না অথচ ঝুড়িভর্তি নম্বর পেল আর তাতেই অভিভাবক সন্তুষ্ট। শিক্ষকের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কী হতে পারে? বর্তমানে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বিদ্যালয়ে আসার চেয়ে কোচিং যাওয়ার প্রবণতা বেশী, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে practical class-এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের অন্য ক্লাশে দেখতে

পাওয়া যায় না। অথচ বিদ্যালয়ই সুশিক্ষার সাধনক্ষেত্র, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাতেই আসে সুশৃঙ্খল জীবনবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা, সুস্থ মানসিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনা যা তাকে জীবনে চলার পথে পাথেয় করে সুস্থ নাগরিক গড়ে তুলবে যাতে সে আবার কিছু সুস্থ নাগরিক গড়ে তুলতে পারে। এইভাবে একটা সুস্থ, সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে ওঠে। তবেই জীবনপ্রবাহ বহতা নদীর মত তরতরিয়ে এগোবে।

এরাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার বুঝেছেন শিক্ষকতা সবচেয়ে 'noble profession,' তাই সরকার শিক্ষকতা জীবিকার নিরাপত্তা এবং সম্মানজনক পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করেছেন। প্রত্যেক শিক্ষকের এ কথা মনে রাখা উচিত এবং আরও মনে রাখা উচিত তাঁর ওপরে জাতিগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভার অর্পিত। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি মূল্যবোধ শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক গড়ে তুলবে। একজন শিক্ষককে সদ্অভ্যাস বা সৎগুণের অধিকারী হতে হবে যাকে দেখে শিক্ষার্থী শিখবে। এই মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে গমন করবেন সে পথেই শিক্ষার্থীর পদক্ষেপ। তাই প্রত্যেক শিক্ষককে মনে রাখতে হবে "আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও"। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিক্ষকসমাজ এখন অনেকটাই আদর্শচ্যুত বলে অভিযুক্ত। তবে আদর্শ শিক্ষক অবশ্যই আছেন।

অতীতে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে শিক্ষক নিজ সন্তানবৎ যত্নে শেখাতেন। পাঠে অমনোযোগে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে নিজ সন্তানবৎ শাসন করতেন। সে শাসনে শিক্ষার্থী-অভিভাবক কারুরই অভিযোগ ছিল না কেন না, "শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে"। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, প্রচন্ড মাত্রায় অসহিষ্ণু হয়ে কিছু শিক্ষক শাসনের নামে ছাত্রছাত্রীদের ওপর মধ্যযুগীয় বর্বরতা প্রয়োগ করছেন। এটা কখনো কাম্য নয়। তাঁদের সহিষ্ণু ও সংযমী হতেই হবে। এই কাজ শিক্ষা বিজ্ঞান বিরোধী।

বিশিষ্ট ভাষাবিদ্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "আজানু যদি জানু পর্যন্ত হয়, আমরণ যদি মৃত্যু পর্যন্ত হয়, তবে আচরণ হবে যেন চরণ ছুঁয়ে যায়"। একজন শিক্ষকের শিক্ষার্থীর প্রতি আচরণ এমন হবে যাতে শিক্ষার্থী সবসময় শিক্ষকের সশ্রদ্ধায় চরণ ছুঁয়ে যাবে এবং শিক্ষকের মূল্যবোধের দ্বারা নিজ চরিত্র গঠন করবে। প্রকৃত শিক্ষককে শিক্ষার্থী সারাজীবন মনে রাখবে। আদর্শ শিক্ষকের সৎগুণ-সদ্অভ্যাস শিক্ষার্থীর মনে সারাজীবন প্রতিফলিত হয়।

কিন্তু আজকের দিনে শিক্ষকদের একাংশ সিলেবাস শেষ করেন, শেখান না। দায়সারাভাবে পড়ান, লোকদেখানো পরীক্ষাও নেন কিন্তু তাতে প্রাণের স্পর্শ থাকে না। প্রতিটি শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে "শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ"। "তোদের কিছু হবে না" বলে নিজকর্তব্য শেষ করলে চলবে না।

আজকে শিক্ষকদের একাংশ নিজ মূল্যবোধের অবক্ষয়ে নিজ সম্মান অনেকখানি হারিয়েছেন, সমাজে অনেকখানি হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন। শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর এবং অভিভাবকের দূরত্ব বেড়েছে কিন্তু শিক্ষক হয়তো চাকুরীর অতিরিক্ত নিরাপত্তা এবং পারিশ্রমিকের জন্য কোনো সামাজিক অসম্মানই গ্রাহ্য করছেন না। ক্রমশ শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়

"কানকাটাদের রাজ্যে
ঠোঁটকাটারা যাই বলুক না
আনে না কেউ গ্রাহ্যে।"

শিক্ষককে নিরন্তর আত্মসমালোচনা এবং আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা নিজেদের মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। সারস্বত সাধনার পীঠস্থানে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর কাছে 'আদর্শ চরিত্র' হতে হবে। শিক্ষককে শিক্ষার্থীর মনের কাছাকাছি পৌঁছে তাদের সবরকম সুবিধা-অসুবিধার কথা অনুভব করতে হবে, তাদের সমস্যা যতদূর সম্ভব সহানুভূতির সঙ্গে সমাধান করে শ্রেণিতে পাঠদানের একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষা জীবদেহে শোণিত স্রোতের মত চলাচল করতে পারে।"

বিবেকানন্দ বলেছেন, "The true teacher is he who can immediately come down to the level of the student and transfer his soul to the students' soul and see through and understand through his mind."

এই সমস্ত মহাপুরুষের মহামূল্যবান বক্তব্য নিজকার্যের মধ্যদিয়েই শিক্ষকের জীবনে মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে।

{শিক্ষার্থী<=>শিক্ষার্থী} v {শিক্ষক <=>শিক্ষার্থী}-র পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরী হলে শিক্ষাদানের সুবিধা হবে।

কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষার্থী দূরত্ব ক্রমশই বাড়ছে। শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকের দূরত্বও ক্রমশ বাড়ছে। দূরদর্শনের মাধ্যমে ২৪ঘন্টা দুর্গন্ধময় সংস্কৃতির প্রচার আমাদের 'চৈতন্যে মড়ক' লাগিয়ে দিচ্ছে। আমাদের এই নতুন কায়দায় সাম্রাজ্যবাদী

আক্রমণকে প্রতিহত করতে হবে।

"পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন' তবুও পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মত ভালবাসা দিয়ে মূল্যবোধে অবিচল থেকে আত্মনিবেদিত সৎ-শিক্ষাদানে শিক্ষকই পারেন শিক্ষার্থীর মধ্যে 'সুচেতনা' আনতে।

অভিভাবক ভোগবাদের ইঁদুর দৌড়ে ছুটে বেড়াচ্ছে আর সন্তানের বয়ঃসন্ধিক্ষণের সমস্ত সুকুমার মানসিকতাকে নষ্ট করে দিয়ে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিকশিত হতে দিচ্ছে না। তাদের মনে ছোট থেকেই অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের বিদ্বেষ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের কল্পনাপ্রবণ মনকে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। তাদের খেলার সময়ও নেই, সাথীও নেই। অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের ছায়া শ্রেণিকক্ষে ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যেও ঘটছে। ফার্স্ট বয়, লাস্ট বয়-এর কথা বলে তাদের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সামাজিক প্রতিপত্তি সম্পন্ন অভিভাবক গৃহশিক্ষককে কিনে নিচ্ছেন। গোটা পৃথিবী এখন বিশ্বায়নী প্রভাবে বাজারে পরিণত হয়েছে। তাই 'শিক্ষা' ও 'শিক্ষক' উভয়ই পণ্য। শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। একদিন শ্রেণিতে অনুপস্থিত হলে কী পড়া হলো কোনো শ্রেণিবন্ধু এমনকি শিক্ষকের কাছ থেকেও শিক্ষার্থী জানতে পারছে না। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, সকলেই সকলকে আড়চোখে দেখে, অথচ শিক্ষকই পারেন নিজ মূল্যবোধের দ্বারা এই বৈষম্য দূর করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে।

বিশ্বায়ন-সৃষ্ট ভোগবাদের আক্রমণে গৃহশিক্ষকতার দাপটে সামাজিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষকের সহানুভূতি যেন হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রতিটি শিক্ষককে মনে রাখতে হবে তাঁর প্রধান দায়িত্ব এবং কর্তব্য 'এইসব মূঢ় মূক ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা'। তাদের সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য নিজেদের নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষকের মনে রাখা উচিত তার সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। একজন শিক্ষকের পরিচয় সম্মানীয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকরূপে, অসম্মানজনক গৃহশিক্ষক রূপে নয়।

প্রতিটি শিক্ষকের বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে সাময়িক রুটিনে শিক্ষার্থীদের কিছু শিক্ষাদান করতে পারার যোগ্যতা থাকা উচিত। সাধারণ জ্ঞান, word book, পুরানের গল্প, মনীষীদের জীবনী, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের গল্প, স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনি ক্লাশে বলা যেতে পারে। মনীষীদের জীবনী থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই মূল্যবোধের পাঠ নিতে পারে। এ কাজ যেন আজ স্তিমিত। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এ এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যেসব অভিভাবক অর্থনৈতিকভাবে উন্নত তারা আর সাধারণের বিদ্যালয়গুলির উপর ভরসা করছে না। এটা বিপজ্জনক ঝোঁক অথচ শিক্ষকের মনে রাখা উচিত no teacher, no future। শিক্ষকের কর্তব্য দরিদ্র শিক্ষার্থীদের প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে পড়ানো এবং লেখানো। তবেই শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হবে। তাই শিক্ষাবিদ বেকন বলেছেন, "Reading makes a wise man, conference makes a ready man and writing makes a perfect man." দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে এসে তাদের শিক্ষকদের সম্বন্ধে যেন অনুভব করতে পারে

"তুমি আছ তার নাই যার কেহ
আছে তব প্রেম, আছে তব স্নেহ"।

এইরূপভাবে শিক্ষাদান করে, নিরন্তর মূল্যায়ন করে সমস্ত রকম বিভেদ ঘুচিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে তাদের কাছে টেনে নিয়ে তাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আনতে হবে। শিক্ষককে শিক্ষা প্রদীপনের সাহায্যে from concrete to abstract পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হবে। বই-এর পড়ানো ছোট ছোট chart-model শিক্ষার্থীকে দিয়ে তৈরী করালে তারা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়। সেই শিক্ষা সারাজীবন মনে থাকে। বছরে একবার অন্তত শিক্ষামূলক ভ্রমণ করানো শিক্ষকের অবশ্যকর্তব্য। এইভাবেই প্রকৃত শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হবে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় 'তোতা কাহিনি'র মতো অন্তঃসার- শূন্য শিক্ষা হবে। একজন শিক্ষককে সর্বতোভাবে সকলের জন্য সমমানের শিক্ষার অভীষ্ট সিদ্ধ করতে হবে।

বর্তমানে অণুপরিবারে সন্তান আজ বড় একাকিত্বের যন্ত্রণায় ভুগছে। তারা আজ দিশাহারা। এর উপরে তারা বাবা-মার প্রতিযোগিতামূলক ইঁদুর দৌড়ের খেলায় মানসিক অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। শৈশব, কৈশোর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বয়ঃসন্ধির সমস্যা কাউকে বলতে পারছে না। বিভিন্নভাবে বিপথে চালিত হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীর এই সমস্যার সমাধান একমাত্র শিক্ষকই করতে পারেন 'জীবনশৈলী'র শিক্ষা প্রদান করে। তবেই যুবসমাজ অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচবে। এই ভয়ঙ্কর অবস্থাকে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাবধান করেছেন,

"এখন একটু চোখে চোখে রাখো—
দিনগুলো ভারী দামালো ;
দেখো

যেন আমাদের অসাবধানে
এই দামালো দিনগুলো
গড়াতে গড়াতে
গড়াতে গড়াতে
আগুনের মধ্যে না পড়ে"— এর দায়িত্ব একমাত্র শিক্ষকই নিতে পারেন।

অথচ ছাত্রসমাজের এই অবক্ষয়ের জন্য অভিভাবক এবং শিক্ষক ছাত্র সমাজকেই দায়ী করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে
" ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত
এ আমার এ তোমার পাপ।"

ছাত্রসমাজের অবক্ষয়ের রোধে শিক্ষককে এগিয়ে আসতে হবে। নিজেদের মূল্যবোধের দ্বারা, পরিশীলিত মননের দ্বারা তাদের বয়ঃসন্ধির সমস্যা, লিঙ্গবৈষম্যের সমস্যা বিজ্ঞানসম্মত সঠিক তথ্যের দ্বারা দূর করতে হবে।

শিক্ষকই পারেন শিক্ষার্থীকে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে। তবেই সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর হবে। শিক্ষকই শিক্ষার দ্বারা অজ্ঞানতার অন্ধজনকে জ্ঞানের আলো দিতে। এ আমরা কোন্ সভ্য সমাজে বাস করছি? যেখান থেকে এখনও 'ডাইনী প্রথা' বিলুপ্ত হলো না। এখনও সাপে কামড়ালে ওঝা আসে? এখনও ঝাড়ফুঁক, টোটকা চিকিৎসা চলে? এ সবের থেকে সমাজকে মুক্তি দিতে পারে শিক্ষক সমাজ বিজ্ঞানসম্মত এবং প্রকৃত মূল্যবোধের শিক্ষার দ্বারা।

পরিবেশ দূষণরোধে প্রত্যেক শ্রেণিতে সপ্তাহে একটি করে 'পরিবেশ পরিচিতি' ক্লাস অবশ্যই রাখতে হবে।

বিজ্ঞানী ওডাম বলেছেন, "আমাদের পরিবেশের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের যে পরিবর্তনের ফলে জীব ও উদ্ভিদ জগতের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাকেই দূষণ বলা হয়।" এই ক্ষতির দ্বারা বসুন্ধরা কীভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ছে তা শিক্ষার্থীকে বোঝাতে হবে। বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীকে বোঝানো পলিথিন পলিউশন, সব্জী বা খাবারে মারণ রঙ, ধূমপান ইত্যাদির ক্ষতিকর দিক। শিক্ষার্থী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে গাছ কাটা বন্ধ করতে এবং গাছ রোপন করতে। বিভিন্ন পাঠ-পরিকল্পনার দ্বারা গাছ যে আমাদের কত বড় বন্ধু জানাতে হবে। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,

"গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার
আরোগ্যের জন্য ঐ সবুজের ভীষণ দরকার।"

পরিবেশ দূষণরোধে আজ বসুন্ধরা 'বিপন্ন বিস্ময়ে' মানবজাতির দিকে তাকিয়ে আছে।

আমাদের মূল লক্ষ্য হবে ফেলে দেওয়া জিনিসকে নতুন রূপ দিয়ে পুনর্ব্যবহার, যতটা সম্ভব কম আবর্জনা এবং আমাদের পরিবেশের যে ক্ষতি আমরা ইতিমধ্যেই করেছি তার সংশোধন করা।

শিক্ষার্থীর বয়ঃসন্ধির সমস্যা , লিঙ্গবৈষম্যের সমস্যা শিক্ষার্থীকে বোঝানোর জন্য সপ্তাহে একটি করে জীবনশৈলীর ক্লাস রাখতে হবে। শিক্ষার্থীর প্রশ্ন "এলেম আমি কোথা থেকে?"-এর উত্তর শুধুমাত্র "ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে" দিলে হবে না, বিজ্ঞানসম্মত সঠিক তথ্যের দ্বারা বোঝাতে হবে। এতে ছাত্রীদের হীনম্মন্যতা থেকে রক্ষা করতে পারা যায়। নারী এবং পুরুষ উভয়ের গুরুত্বই সমাজে সমান বোঝাতে পারলে তবেই সমাজ থেকে কন্যাভ্রূণ হত্যা এবং নবজাত কন্যা হত্যা বন্ধ হবে।

শিক্ষকই শিক্ষার্থী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, পণপ্রথার মত কুৎসিত ব্যাধি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে। প্রত্যেকেরই বিবাহের আগে ঠিকুজী কোষ্ঠী বিচার না করিয়ে আগে রক্ত পরীক্ষা করতে তবেই এড্‌স এবং থ্যালাসেমিয়ার মত মারণ রোগের কবল থেকে সমাজ মুক্ত হবে।

শিক্ষক সমাজের সবচেয়ে লজ্জাজনক মূল্যবোধের অবক্ষয় হলো ছাত্রীর যৌননিগ্রহ। এর বিরুদ্ধে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থী-সমাজকে সোচ্চারে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। কাগজ খুললেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কলঙ্কজনক ঘটনা প্রায়ই চোখে পড়ছে। এরজন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। প্রাথমিক শিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে মিড্-ডে-মিলের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দিকে।

শিক্ষককে এগিয়ে আসতে হবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্বাস্থ্যবিধি পালন করাতে, নেশা এবং বিভিন্ন রকম বদ-অভ্যাসের প্রতি আসক্তি বর্জন করাতে।

আজকাল খেলাধূলার মাধ্যমে শরীরচর্চা একেবারে নেই বললেই হয়। আকাশচুম্বী ফ্ল্যাট বাড়ীর জন্য আর কোথায় সেই উন্মুক্ত প্রান্তর? অথচ শরীর ভাল না থাকলে মনও ভাল থাকবে না। বিদ্যালয়ে শারীর-শিক্ষার ক্লাসে বিভিন্ন প্রাণায়াম-যোগাসনের দ্বারা শরীর সুস্থ রাখার জন্য শারীর-শিক্ষার শিক্ষককে এগিয়ে আসতে হবে। কর্মশিক্ষার ক্লাসে বিভিন্ন সৃষ্টিমূলক হাতের কাজে শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। গান, আবৃত্তি, নাটক, পত্রিকা ইত্যাদির জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

শিক্ষকের নিজেকে নিরন্তর আত্মসমালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণের সাহায্যে মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। দিনের শেষে শিক্ষক

কি আত্মবিশ্লেষণ করেন আজকে কতটুকু কাজ করেছেন? যে কোনোরকম ধর্মঘট বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য শিক্ষাদান ব্যাহত হলে বা পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীর জন্য কোনো শিক্ষক বাড়তি ক্লাস নেন? নিরন্তর মূল্যায়নে কি শিক্ষার্থীর পরীক্ষাভীতি দূর করার চেষ্টা করেন? বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিরন্তর পাঠদান প্রক্রিয়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন? শিক্ষকের নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করতে হবে, শিক্ষার্থীর সমস্যার সমাধান করতে হবে।

"রাখো নিন্দাবাণী রাখো আপন সাধুত্ব অভিমান—
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন-সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।"

শিক্ষার আঙিনার বাইরে বহু ছেলেমেয়ে পড়ে আছে। সমিতির মূল ধ্বনি ঃ শিক্ষার দাবী জাতীয় দাবী। প্রকৃত শিক্ষকের কর্তব্য 'বিদ্যালয়ছুট' শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে বিদ্যালয়ে নিয়ে আনা। মনে রাখতে হবে

"এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।"

ভালোমানুষের আবাদ করতে হলে ভালো শিক্ষক চাই। বুকের ভিতর সাম্প্রদায়িকতার বিষ পুষে রেখে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া যায় না, শিক্ষককে একথা মনে রাখতেই হবে। শিক্ষক যদি সুস্থ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন না হন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুস্থ থাকতে পারে না। শিক্ষার লক্ষ্য হলো একটি হিংসাশূন্য ও শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলা। গোপনে গোপনে মানুষকে শোষণ করবার মনোভাব লালন করে শোষণহীন সমাজ গড়ার কারিগর হওয়া যায় না। আদর্শে অবিচল থাকতে হবে শিক্ষককে। আদর্শহীন মানুষ পশুর সমান। ছাত্রছাত্রীরা আদর্শ শিক্ষক খুঁজে বেড়ায়। তাদের প্রশ্ন একটাই, 'কোথায় পাব তারে'।

শিক্ষককে শিক্ষাদান করতে হবে সহানুভূতির সঙ্গে, শাস্তি দিয়ে নয়। শিক্ষক যখন প্রকৃত শিক্ষাদানে অসমর্থ হন তখনই শাস্তি প্রদান করেন নিজের অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্য। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কঠোর শাসনের চাপে ছাত্রেরা যদি মানব স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হয়, সকল প্রকার অপমান দুর্ব্যবহার ও অযোগ্যতা যদি তারা নির্জীবভাবে নিঃশব্দে সহিয়া যায়, তবে অধিকাংশ অধ্যাপকদিগকেই তাহা অধোগতির দিকে টানিয়া লইবে। ছাত্রদের মধ্যে অবজ্ঞার কারণ তাঁরা নিজে ঘটাইয়া তুলিয়া তাহাদের অবমাননার দ্বারা নিজেকে অহরহ অপমানিত করিতে থাকিবেন।" প্রকৃত শিক্ষক শিক্ষার্থী বারবার ভুল করলেও শাস্তি প্রদান করেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "অপরাধ করিলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দন্ড স্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করিলে যে গ্লানিমোচন হয় না—এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতে হওয়া চাই—পরের নিকটে নিজেকে দন্ডনীয় করিবার হীনতা মনুষ্যোচিত নহে।"

শিক্ষকই পারেন শিক্ষার্থীর জীবনের পথে প্রকৃত দিশা হতে। একজন শিক্ষকই শিক্ষার্থীর body, mind এবং soul-এর প্রাকৃত friend, philosopher and guide হতে। তবেই একটা সুস্থ-সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে উঠবে এবং সেখানেই একজন শিক্ষকের প্রকৃত সার্থকতা।

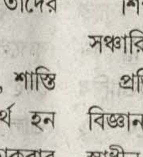
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে একতালে একসুরে।"

প্রকৃত শিক্ষাই আনতে পারে উন্নততর জীবনের সন্ধান। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ বলেছেন, "শিক্ষা কথার প্রকৃত তাৎপর্য জীবিকা অর্জনের বা নাগরিকতার প্রশিক্ষণের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা হলো দ্বিতীয় জন্ম। উন্নততর আধ্যাত্মময় জীবনে প্রবেশের প্রথম সোপান হলো শিক্ষা।"

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব, ইহাই শিক্ষার ফল।"

শিক্ষার এইসব মূল্যবোধ প্রতিটি শিক্ষকের নিজের জীবনে সঞ্চারিত করতে হবে।

প্রতিটি শিক্ষককে অবশ্যই ছাত্রদরদী, সচ্চরিত্র, ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞানমনস্ক, গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হতে হবে। তবেই স্বাধীন ভারতে সুনাগরিক গড়ে তোলার কাজ সুসম্পন্ন হবে। মনে রাখতে হবে, ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে তার শ্রেণিকক্ষে।



প্রসঙ্গ ঃ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

অসিতকুমার ভৌমিক

সহ-প্রধান শিক্ষক, উষুমপুর আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, উত্তর ২৪পরগণা

"শাস্তি দেওয়ার নামে ছাত্রছাত্রীদের ওপর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শারীরিক নির্যাতন অমানবিক।............সম্প্রতি হাওড়ার একটি স্কুলে শাস্তি দেওয়ার নামে পঞ্চম শ্রেণির তিন ছাত্রীর হাতে আগুনের বল তুলে দেয়। লিলুয়ার একটি স্কুলে আবার ভাঙা চেয়ারের পায়া দিয়ে ছাত্রকে পেটান শিক্ষক। কৃষ্ণনগরের একটি স্কুলে শিক্ষিকার মারের চোটে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখার্জি এই ঘটনাগুলির তীব্র নিন্দা করে এই আচরণকে 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' বলে উল্লেখ করেন।........." (সংবাদসূত্র ঃ আজকাল, ৬ আগস্ট, ২০০৬)

উপরিউক্ত অংশটি প্রকাশিত সংবাদের কয়েকটি বাক্যমাত্র। কিন্তু এই কয়েকটি বাক্যের শেষবাক্যে অমানবিকতার বিরুদ্ধে মানবিক প্রতিবাদটি যেভাবে উচ্চারিত হয়েছে, তাতে প্রকৃত শিক্ষকসত্তা নিয়ে যাঁরা শিক্ষকতা করছেন, তাঁদের কাছে নিঃসন্দেহে স্বস্তিদায়ক। কারণ, ঐ প্রতিবাদটি যাঁর, তিনিও একজন শিক্ষক। বলা যেতে পারে, অনেক শিক্ষকের শিক্ষক তিনি ; অর্থাৎ অনেক শিক্ষক তাঁকে শিক্ষকজ্ঞানে শ্রদ্ধা করে থাকেন। উক্ত সংবাদের পরবর্তী অংশে এই শিক্ষক বলেছেন, "........শিক্ষকের যদি ন্যূনতম সহিষ্ণুতা, শিক্ষকোচিত আচরণ না থাকে, তাহলে সে কীসের শিক্ষক ?........ শিক্ষক-ছাত্র এবং অভিভাবকদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক থাকা উচিত। বারবার যদি এই ঘটনা ঘটে তাহলে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসতে চাইবে না। শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীরা দুষ্টুমি করলে অবশ্যই তাকে শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু তা কখনই এতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে না। এতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্কুলের প্রতি ভীতি জন্মাবে। যা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়।"—আশা করি, পরবর্তী অংশের এই কথাগুলি বুঝিয়ে দিচ্ছে, কেন তিনি অনেক শিক্ষকের শিক্ষক। আসলে, শিক্ষক সমাজের একটি অংশ, তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, 'শিক্ষক' পদে থাকলেও শিক্ষকোচিত আচরণে অভ্যস্ত হতে পারেননি। এই মহৎ আচরণের শিক্ষা পেতে হলে যে চেতনা থাকা দরকার, সে-ই চেতনার অভাব রয়েছে বলেই তো ছাত্রছাত্রীদের সন্তানবৎ জ্ঞান করতে পারছেন না একাংশের শিক্ষক-শিক্ষিকা। এই কথাতেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে 'নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি'-র কথা। ঐতিহ্যবাহী এই বৃহত্তম শিক্ষক সংগঠনটির দু'টি মূল স্লোগানের কথা, যার একটি হলো—'ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ঐক্য জিন্দাবাদ'। এই স্লোগানের শব্দবন্ধ অহরহ সরবে বা নীরবে উচ্চারিত হলেও ছাত্রনিপীড়নের ঘটনায় মর্মাহত সাধারণ সম্পাদক আবারও মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'শিক্ষক-ছাত্র এবং অভিভাবকদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক থাকা উচিত'। বলতে দ্বিধা নেই, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সু-সম্পর্ক না থাকলে অভিভাবকদের সাথে কিছুতেই মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে না। অথচ এই তিনের সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত আছে শিক্ষার সাফল্য। এই বিষয়টি যাঁরা না বোঝেন, তাঁদের চেতনার মান যে অনেক নীচে অবস্থান করছে, এ সম্পর্কে কোনো সংশয় নেই।

একথা অনস্বীকার্য যে, আজকের শিশুদের ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুমহান দায়িত্ব বাবা-মা অপেক্ষা শিক্ষকদের উপরই বেশিমাত্রায় বর্তায়। বর্তমান শতক শুরুর প্রাক্কালে ইউনেস্কো নিযুক্ত আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও রয়েছে এই সত্যেরই স্বীকৃতি— 'Teachers have crucial notes to play in preparing young people not only to face the future with confidence but to build it with purpose and responsibility.' শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের এই দায়বদ্ধতায় গৌরবান্বিত হওয়ার পথনির্দেশ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছিলেন, 'যদি তাঁহার (শিক্ষকের) জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণ সাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরব লাভ করিতে পারেন।' প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের এই গৌরবজনক কাজের দায়বদ্ধতা পূর্বের চেয়ে বর্তমানে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বর্ধিত দায়বদ্ধতা পালনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের যে-সব শিক্ষকের আদর্শ অনুসরণ করার কথা সবার আগে মনে পড়া

স্বাভাবিক, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডিরোজিও এবং বিদ্যাসাগর। এই দুই মহান শিক্ষকের সবচেয়ে বড়ো গুণ ছিল ছাত্রদের সাথে একাত্মবোধ স্থাপন, যা বর্তমানের ভোগবাদী সমাজে অনেকাংশে দুর্লভ হয়ে উঠছে।

হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ১৮২৮-এর মার্চ থেকে ১৮৩১-এর এপ্রিল মাত্র তিন বছরের শিক্ষাদানে হিন্দু কলেজে শিক্ষকতায় যে সুমহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তা আজও যে কোনো শিক্ষকের শিক্ষার্থীবৎসল আদর্শ শিক্ষক হয়ে ওঠার মহত্তম প্রেরণাস্বরূপ। শিক্ষার্থীদের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসার কারণে ডিরোজিও তাদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন আপনজন। ছাত্রদের চেতনাকে পরিপুষ্ট করতে সদাব্যস্ত ডিরোজিও বুঝেছিলেন, ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলে তাঁর দেওয়া শিক্ষা কখনোই ছাত্ররা সহজ মনে নেবে না। ছাত্ররা ডিরোজিওকে কী চোখে দেখতেন তার উল্লেখ রয়েছে তৎকালীন হিন্দু কলেজের করণিক হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়— 'The students in their town loved him most tenderly; and were ever ready to be guided by his counsels and imitate him in all their daily actions in life.' ছাত্রদের সম্পর্কে ডিরোজিও কী ভাবতেন, তার পরিচয় পেতে তাঁর একটি বাক্যই বোধকরি যথেষ্ট মনে হবে,—"আমি অনুভব করি আমরা ছাত্ররা যেন এক একটি কুসুমকলি, ধীরে ধীরে তাদের পাপড়িগুলি খুলছে, ভবিষ্যতে পূর্ণ বিকশিত হয়ে বসুন্ধরাকে সুগন্ধ বিতরণ করবে, আমি সেই আশা নিয়ে বেঁচে থাকি।"—এমন ছাত্রদরদী স্বপ্নদর্শী ডিরোজিওকে কায়েমীস্বার্থের ধারক-বাহকদের চক্রান্তে কলেজ ছাড়তে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর ছাত্রদের কেউ তাঁকে ছেড়ে যাননি ; এমনকি তাঁর অকাল মৃত্যুর সময়েও ছাত্ররা পাশে ছিলেন। ছাত্র-শিক্ষকের এই মধুর সম্পর্কের দৃষ্টান্তে বিস্মিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন — "এরূপ অদ্ভূত আকর্ষণ, শিক্ষক-ছাত্রের এরূপ সম্বন্ধ কেহ কখনো দেখে নাই। ডিরোজিও তিন বৎসর মাত্র হিন্দু কলেজে ছিলেন, কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার শিশুদলের মনে এমন কিছু রোপণ করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহাদের অন্তরে আমরণ বিদ্যমান ছিল।" বস্তুত ছাত্রদের কাছে অমন শ্রদ্ধাভাজন অতিপ্রিয় শিক্ষক হওয়ার যে গৌরব ডিরোজিও লাভ করেছিলেন, সে গৌরবের অধিকারী হওয়া যে কোনো শিক্ষকের জীবনে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

কেবল ডিরোজিও নন, স্বয়ং বিদ্যাসাগরও যে অনেক বড়ো মাপের ছাত্রবৎসল শিক্ষক ছিলেন, তাতো আজ ইতিহাস। বলা যেতে পারে, পিতার যেমন পুত্রকে শৈশবে লালন-পালন করা উচিত, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর ছাত্রদের দেখেছিলেন, ভালো বেসেছিলেন। তিনি যখন মেট্রোপলিটন স্কুলের শ্যামপুকুর শাখায় ছিলেন, তখন কচিকাঁচা শিশুদের তিনি যেভাবে আদরে-স্নেহে আপন করে নিয়েছিলেন, তাতো ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্কের অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত। ছাত্রদের প্রতি দুর্ব্যবহার বা প্রহার না করার নির্দেশ ছিল বিদ্যাসাগরের। ছাত্র যতই দুরন্তপনা করুক না কেন, অন্য সকলের সামনে তাকে শাস্তি দিয়ে অপমান করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন বিদ্যাসাগর। মেট্রোপলিটন স্কুলের জনৈক শিক্ষককে ছাত্রনিপীড়নের অপরাধে বিদ্যাসাগর বরখাস্তও করেছিলেন। তার মানে এই নয় যে, ছাত্র অপরাধ করলে তার কোনো শাস্তি দিতেন না বিদ্যাসাগর। যদি সত্যিই কোনো ছাত্র অমার্জনীয় অপরাধ করত, তাহলে সে ছাত্রকে শ্রেণিকক্ষ থেকে তিনি বের করে দিতেন। পরবর্তী সময়ে ছাত্রটি যদি অনুতপ্ত হয়ে মার্জনা চাইত, বিদ্যাসাগর তাকে ক্ষমাও করে দিতেন। ছাত্রদের শাস্তি দান সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের অভিমত ছিল—"আমার মতে, অপরাধ যে রকমেরই হোক না কেন, তারজন্য বালকদের কখনই দন্ড দেওয়া উচিত নয়। আমি এই দন্ডনীতির ঘোর বিরোধী। শিক্ষাক্ষেত্রে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তা থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, বালকদের দৈহিক দণ্ড দিলে তাদের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়।" আসলে, বিদ্যাসাগর শিক্ষার অঙ্গন থেকে হৃদয়হীন আচরণের বিলুপ্তি চেয়েছিলেন। ছাত্ররা যাতে শিক্ষকদের যম না ভাবে, এবং শিক্ষকরাও যাতে ছাত্রদের অসহায় জীব না ভাবেন, মানুষ বলে মনে করেন, সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষক-বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অতি মধুর। তাই শিশুরা আব্‌দার করে যা চাইত, বিদ্যাসাগর আদর করে তা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষ লিখেছেন—"একবার স্কুলের ছাত্ররা তাঁর (বিদ্যাসাগরের) কাছে পৌষ-পার্বণের ছুটি চায়। ছুটি মঞ্জুর করে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাদের হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা তো দেশ-ঘর ছেড়ে বিদেশে আছ ; কলকাতা শহরের বাসায় পিঠে পাবে কোথায় ?'—ছেলেরাও হেসে উত্তর দেয়, 'আপনার বাড়িতে পাব'। বিদ্যাসাগর বলেন, 'তাই নাকি ? বেশ তাই হবে।' ছেলেদের জন্য বাড়িতে তিনি প্রচুর পিঠের আয়োজন

করেন।"—এই ছিলেন উনিশ শতকের শিক্ষক-বিদ্যাসাগর, যাঁর জীবনাচরণ থেকে একুশ শতকের শিক্ষকরাও প্রকৃত শিক্ষক হওয়ার প্রেরণা পেতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকথা যাঁরা জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন যে, রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়-বিমুখ ছিলেন মূলত শিক্ষকদের শাসন-গর্জন-আস্ফালনকে ভালো মনে মেনে নিতে না-পারার কারণে। তাঁর কথায়, 'যে শিশুশিক্ষাবিভাগে মাস্টারের গলাই শোনা যায়, শিশুরা থাকে নীরব, সেখানে আমি বুঝি মরুভূমির উপর শিলাবৃষ্টি হচ্ছে।' বিশিষ্ট সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় জীবন সম্পর্কে বলেছেন, 'অতি অল্পবয়সেই তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বিদ্যালয়ে যান। কিন্তু হায়! পৃথিবীর অধিকাংশ কবির ন্যায় জননী-বীণাপাণির পদ্মবনটির প্রতি শিশুকাল হইতেই তাঁহার লোভ ছিল, কিন্তু তাঁহার কমল-সরোবরের তীরে গুরুমশায়-অধিরাজিত যে বেত্রবনটা কন্টকিত হইয়া আছে, সেটাকে তিনি অত্যন্ত বেশি ডরাইতেন।' লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্ধুর সাথে একদিন' শীর্ষক একটি সংলাপধর্মী রচনায় রবীন্দ্রনাথের স্কুল সম্পর্কে ভীতির পরিচয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উক্ত রচনায় রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, 'যদি ছেলেবেলায় কোনো কিছুকে সত্যি সত্যি ভয় করতুম, সত্যি সত্যি ঘেন্না করতুম, সে হলো আমাদের স্কুলকে। মনে হতো, এগুলো তো স্কুল নয়, ছেলেদের জেলখানা। মাইনে করে জেলে যেমন কয়েদীদের আটকে রেখে শুধু জব্দ করার জন্যে প্রহরীরা থাকে, আমাদের কাছে তেমনি আছে মাইনে করা মাস্টারমশাইরা।..........আমাকে যতবার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে, ততবারই আমি স্কুল পালিয়ে বেঁচেছি। শেষকালে বাড়ির লোকেরা যখন হতাশ হয়ে বুঝলো যে আমার লেখাপড়া হবে না, তখন আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।' বুঝতে অসুবিধে হয় না যে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের শিক্ষকমশাইদের প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করতেন না, বরং ভয় করতেন। শিক্ষকের প্রতি এই ভীতি যে একজন ছাত্রের মানসিক বিকাশের পথে অন্তরায়, তা একশ্রেণির শিক্ষক সেকালের মতো একালেও বোঝেন না। আর বোঝেন না বলেই সংবাদমাধ্যমে তাঁদের সমালোচিত হতে হয়, প্রগতিমনস্ক ছাত্রদরদী শিক্ষক-শিক্ষানুরাগীদের দ্বারাও তাঁরা তিরস্কৃত হন। ছাত্র এবং অভিভাবকদের আস্থাও তাঁরা হারিয়ে ফেলেন।

মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ সেইসব শিক্ষকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, যাঁরা ছাত্রদের পুত্রবৎ জ্ঞান না করে তাদের 'অসহায় জীব' হিসেবে দেখতেন। কিন্তু যে শিক্ষক যথার্থেই শিক্ষক, অর্থাৎ যিনি ছাত্রদের চিত্তজাগরণে নিজেকে উজাড় করে দিতে জানেন, যিনি সহজেই ছাত্রদের অতি আপন করে নিতে পারেন, সে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো কুণ্ঠা ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা, যিনি প্রকৃত অর্থেই 'আচার্য' বা শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের নতুন পথের দিশারী ছিলেন, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনেই অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রদের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন। কেবল তাদের জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, সে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে।.......... কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তাঁর অন্তরের অভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণভাবে দান না করলে এ কখনও সম্ভবপর হত না।" আসলে, ছাত্রছাত্রী তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রাণভরে পেতে চায়। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য তারা বাবা-মা অপেক্ষা শিক্ষকদের ওপর বেশি নির্ভরশীল থাকে। তাই শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা বহুগুণ বেশি। এই দায়বদ্ধতা পালনে শিক্ষক অক্ষম বা অসহিষ্ণু হলে ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় বিপথগামী হয়ে যায়।

শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়বদ্ধতায় নিবেদিতপ্রাণ আর যাঁদের নাম এই প্রসঙ্গে গভীরভাবে মনে পড়ে, তাঁদের একজন হলেন সত্যপ্রিয় রায়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই মানুষটির যে পরিচয় সবার কাছে সবার আগে মনে আসে, তা হলো—সত্যপ্রিয় রায়, শিক্ষক নেতা, শিক্ষা-আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। বলাবাহুল্য, তিনি প্রকৃত অর্থে বড়ো মাপের শিক্ষক ছিলেন বলেই শিক্ষার্থীদের জন্য, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জন্য, এক কথায় শিক্ষার জন্য এবং সর্বোপরি সমাজের জন্য নিজেকে নিবেদন করতে পেরেছিলেন। কালীধন ইন্‌স্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষকপদে আসীন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্যপ্রিয় রায়ের কাছে ছাত্ররা যে সস্নেহ সান্নিধ্য এবং ভালোবাসা পেয়েছেন, যে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন, তার অকপট স্বীকারোক্তি শোনা যায় তাঁর ছাত্রদের মুখে। শিক্ষাদান মানে যদি হয় শিক্ষার্থীর অন্তরে চেতনার ও জ্ঞানের দীপশিখাটিকে উস্‌কে দেওয়া, তাহলে সেই শিক্ষাদানে সফল শিক্ষক ছিলেন এই মানুষটি। এঁরই এক কৃতী ছাত্র ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী, যিনি পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে আসীন হয়েছিলেন, তিনি তাঁর ঐ কালীধন ইন্‌স্টিটিউশনের ছাত্র হিসাবে প্রথম দিনটির স্মৃতিরোমন্থনকালে প্রধান শিক্ষক সত্যপ্রিয় রায়ের সাথে প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটির কথা বলতে

গিয়ে লিখেছেন—"শিক্ষকের সস্নেহ স্পর্শ, শিক্ষকের সহৃদয় কণ্ঠস্বর, ছাত্রের ক্ষমতায় শিক্ষকের আস্থা—প্রথম সাক্ষাতে ছাত্রের হৃদয় জয় করলেন শিক্ষক।" পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতার কথায় তাঁর স্বীকারোক্তি ঃ "যে তিনবছর আমি উঁচু ক্লাসের ছাত্র হিসেবে বিদ্যালয়ে তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেম, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে দরদ, বিশ্বাস, আস্থা, বোঝাবুঝির মাটির ওপর চলেছি।" এই ছাত্র শুভঙ্কর চক্রবর্তীর চোখে সত্যপ্রিয় রায় ছিলেন 'আলোকস্তম্ভ'। তাই তো তিনি বলেছেন, 'এমন শিক্ষক পাওয়া বড়ো সহজ নয়'। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, দীর্ঘদেহী সত্যপ্রিয় রায় বিশাল রাশভারি স্বভাবের মানুষ হলেও ছাত্রদের আন্তরিক সাহচার্যদানে কোনো কার্পণ্য করেননি।

শিক্ষক সত্যপ্রিয় রায়ের পরেই যাঁর কথাটি অনিবার্যভাবে এসে যায়, তিনি হলেন শিক্ষিকা অনিলা দেবী। উনিও শিক্ষাআন্দোলনে সত্যপ্রিয় রায়ের সহযোদ্ধা ছিলেন। যে শিক্ষাকে মুক্তির সোপানরূপে আমরা দেখি, সে-ই শিক্ষার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন অনিলা দেবী। বেলতলা গার্লস্ স্কুলের বাংলার শিক্ষিকা অনিলাদি শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির শীর্ষনেত্রীর দায়িত্বে থেকেও ছাত্রীদের প্রতি দায়বদ্ধতায় তিনি অবিচল থেকেছেন। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, ছাত্রীদের হোমটাস্কের খাতা দেখে যথাসময়ে তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কখনও কখনও সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বসে ঐ কাজটি সমাধা করতেন। তাঁর সহনশীলতা ও সারল্য এবং পাশাপাশি সংগ্রামী চেতনা এসবই ছাত্রীদের বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করত। তিনি শ্রেণিকক্ষে কবিতা পড়ানোর সময় আবৃত্তির সুরে সংশ্লিষ্ট কবিতা যখন উচ্চারণ করতেন, তখন ছাত্রীরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত। তাঁর সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবোধ ছিল সকলের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়। একদা অনিলা দেবীর ছাত্রী, বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ভারতী মুখার্জি তাঁর স্কুলজীবনের স্মৃতিচারণকালে বলেছেন, "সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, আদর্শের জন্য সংগ্রাম এবং তারজন্য যে কোনো মূল্য দেওয়ার মানসিকতা, মাথা উঁচু করে মেয়েদের চলার শিক্ষা, অন্যায়ের সাথে আপসহীনতা নীতিকে আঁকড়ে থেকে জীবনের ওঠা-পড়াকে স্থির-অকম্পিতচিত্তে গ্রহণ করার মতো মনের জোর এ সবই অনিলাদির কাছ থেকে শেখা।" কেবল পাঠ্যাংশ পড়ানোর মধ্যে তাঁর শিক্ষকতা সীমাবদ্ধ ছিল না, 'শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরি করা, চরিত্র গঠন, মূল্যবোধ তৈরি করা, ভালোমন্দকে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জনে সাহায্য, সর্বোপরি ছাত্রছাত্রীকে সন্তানের মতো ভালোবেসে তাদের শিক্ষাগত তো বটেই, ব্যক্তিগত ও পরিবারগত সমস্যা মেটানোর আপ্রাণ চেষ্টা' করার মানসিকতা ইত্যাদি শিক্ষকোচিত গুণাবলিও তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অনিলা দেবীর মাতৃসুলভ ব্যবহারে ছাত্রীরা চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হত। অভিভাবকদের সাথে আচরণে তিনি ছিলেন আন্তরিক। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ঐক্যকে অনিলা দেবী যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্ব দিতেন।

ছাত্রদরদী এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতি দায়বদ্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্পর্কে আলোচনায় অপর যে নামটি অনিবার্যভাবে এসে পড়ে, তিনি হলেন মৃণালিনী দাশগুপ্ত। দেশ-বিদেশের উচ্চশিক্ষার অঙ্গন থেকে পাঠগ্রহণ করলেও মৃণালিনী দেবী মূলত বাংলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মনোরাজ্যে অবস্থান করেছিলেন। তিনি আপনজনের মতোই কান পেতে শুনেছিলেন তাদের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা। শিশুদের 'মানুষ' করার নামে বাবা-মায়ের পাশাপাশি একাংশের শিক্ষকের অমানবিক আচরণ তাঁকে পীড়া দিত। মৃণালিনী দেবী নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করতেন, মানুষ গড়ার কারিগরদের অন্তরের স্নেহ-দয়া-মায়া-মমতা ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তিগুলির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে শিক্ষার্থীরা লাভ করবে অপত্য স্নেহ, পাবে বন্ধুসুলভ আচরণ। কিন্তু এর ব্যতিক্রমী ঘটনা, যেমন শিক্ষক বা শিক্ষিকার দ্বারা প্রহৃত হয়ে শিক্ষার্থীর হাসপাতালে ভর্তি, শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি, অথবা বিপরীতে, ছাত্র কর্তৃক শিক্ষক প্রহার ইত্যাদির সংবাদে মৃণালিনী দেবীর আক্ষেপ ছিল—'বিশ্বের, সভ্যতার, সমাজের পবিত্রতম ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' এই কারণে অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে মৃণালিনী দেবী বলেছিলেন, 'ছাত্র সংগঠন শিক্ষক সংগঠন, রাজনৈতিক দল—সকলে মিলে ভাবতে হবে। একদিনও সময় নষ্ট না করে, এরমধ্যে দলীয় রেষারেষি না এনে কিছু করুন। অন্তত এই একটি বিষয়ে কোনও মতবিরোধ থাকার কথা নয় যে, অবিলম্বে প্রয়োজন ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের পুনরুদ্ধার।' তিনি শিক্ষকদের একাংশের অসহিষ্ণুতা ও অশিক্ষকোচিত আচরণকে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতির কারণ হিসেবে যেমন দেখেছিলেন, তেমনি দায়ী করেছিলেন শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-শিক্ষকের শ্রেণিদ্বন্দ্বকে। ভ্রান্ত আভিজাত্যবোধে গর্বিত শিক্ষক যদি শ্রেণিকক্ষে তাঁর সামনের সারি সারি বেঞ্চে-বসা, ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণিতে নিজেকে নামিয়ে আনার জন্য উক্ত ঠুন্‌কো আভিজাত্যের গর্বকে পরিহার করতে না পারেন, তাহলে কখনও ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে বোঝাপড়ার মানসিকতা থাকবে না। মৃণালিনী দেবী তাঁর নিজস্ব আচরণ দিয়ে যে বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে সক্ষম

হয়েছিলেন তা হলো, কোনো অবস্থাতেই শিক্ষার্থীর মেধাকে, তার সম্মানবোধকে শিক্ষকের খাটো করে দেখা ঠিক নয়। এই অনভিপ্রেত বিষয়গুলি বর্তমানের ভোগবাদী মানসিকতায় প্রকট হয়ে উঠছে বলে একশ্রেণির শিক্ষক তাঁদের আচরণে মানবিকবোধ বিসর্জন দিয়ে ছাত্রসংহারের কাণ্ডে কলঙ্কিত হচ্ছেন। এর পরিণামে সমগ্র শিক্ষকসমাজকে কালিমালিপ্ত হতে হচ্ছে। আজ মৃণালিনী দেবী আমাদের মধ্যে নেই ; কিন্তু ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক মধুর করার জন্য তিনি যে-সব কথা বলেছেন, তার গুরুত্বকে যদি আত্মস্থ করতে না পারা যায়, তাহলে 'মানুষ গড়ার কারিগর' হিসেবে যাঁরা দীর্ঘদিন পরিচিতি পেয়ে আসছেন, সে পরিচিতি হয়তো একদিন হারিয়ে যাবে।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের আলোচনার সূচনাতে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের যে মন্তব্যটি উল্লেখ করা হয়েছে, সে-ই মন্তব্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আজকের শিক্ষকদের গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। বিশেষ করে, রাজ্য সরকার যখন স্কুল-ছুট ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ের আঙিনায় ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে, তখন শিক্ষকরা যদি ছাত্রদের ভীতির কারণ হন, তাহলে ঐ প্রকল্প কখনও পূর্ণাঙ্গরূপে সফল হবে না। তাই শিক্ষকদের হতে হবে ধৈর্যশীল ও ছাত্রদরদী। তবেই ছেলেমেয়েদের স্কুলমুখী করা সহজ হবে। তা না হলে স্কুলের প্রতি বীতরাগের কারণে স্কুল-ছুটের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে যাবে। যে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক ছাত্রদের দৈহিক নির্যাতনে সমগ্র শিক্ষকসমাজকে কলঙ্কিত করছেন, তাঁদের আরও যে কথা ভাবা দরকার তা হলো, শিক্ষার প্রতি রাজ্য সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অভাবী নিরক্ষর বাবা-মায়ের ছেলেমেয়েরাও আজ অধিক সংখ্যায় শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করছে। এইসব প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়াদের মধ্যে অনেকের পরিবারেই অশিক্ষাজনিত বহু সমস্যা রয়েছে। তাদের বাবা-মায়ের জীবনযাপনে বা আচার-আচরণে হয়তো সংযমের অভাব রয়েছে। অনেকের পরিবার এখনও কুসংস্কারমুক্ত নয়। সুতরাং ঐসব পরিবার থেকে আসা ছেলেমেয়েরা শ্রেণিশিখনে আশানুরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করবে, এমন ধারণা সঠিক নয়। তাদের আচরণ বা কথাবার্তাও যে শিক্ষকের প্রত্যাশামতো মার্জিত বা রুচিসম্মত হবে, এমন আশা করাটাও অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিকবোধ যে-শিক্ষকের মধ্যে নেই, সে-শিক্ষক যথার্থ শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারেন না। তাই প্রকৃত শিক্ষক হতে হলে শিক্ষককে ছাত্রের সামাজিক এবং পারিবারিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে ; ছাত্রদের বাবা-মায়ের সাথে পারিবারিক যোগসূত্র গড়ে তুলতে হবে। এই যোগসূত্রের মাধ্যমে অভাবী নিরক্ষর অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকের শ্রেণিগত ব্যবধানও অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। এটি সম্ভব হলে তবেই ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। বলা বাহুল্য, এ কাজ খুব সহজ নয়। এরজন্য ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে শিক্ষাকে তাঁর দু'টি মূল্যবান 'হাতিয়ার' অর্থাৎ মেধা ও শ্রম দিয়ে শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে এবং বাইরে, সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। মনে পড়ছে মৃণালিনী দাশগুপ্তের কথা—'একদিকে গভীর আশা, অপরদিকে সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মধ্যদিয়েই তো যাত্রা শুরু করেছিলেন ডিরোজিও, যাঁকে অভিমন্যুবধের মতনই চক্রব্যূহে অবরুদ্ধ হতে হয়। সেই সংগ্রাম কার্যত চলছে। যতদিন না সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে ততদিন চলবে'।

সবশেষে উল্লেখ করি রবীন্দ্রনাথের লেখা অতিপরিচিত কয়েকটি বাক্য, যা সকল শিক্ষকের কাছে হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ—"দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয়, তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব, ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে। প্রশ্ন উঠবে প্রকৃতির দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল? মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারিবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা ঢাকা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়—দেশ মানুষে তৈরি।" সুতরাং একুশ শতকের অতি আধুনিকতার ঝলমলে পরিবেশের মধ্যে থেকেও স্বীকার করতে হবে, মানুষ গড়ার কারিগর ভিন্ন দেশের উন্নতি অসম্ভব। তাই প্রত্যেক শিক্ষক 'মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবো'—এই দৃঢ় প্রত্যয়ের পতাকাতলে অঙ্গীকারবদ্ধ হবেন, এটাই আজকের দিনে সবচেয়ে বড়ো কামনা।

বিপন্ন শৈশব — একটি পর্যালোচনা

শমিতকুমার মজুমদার
সহ-শিক্ষক, তরঙ্গপুর নন্দকুমার উচ্চবিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর

"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, সব শিশুরই অন্তরে" — কবির এই বক্তব্যের বিপরীতে সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত পুষ্পরূপী অন্তরকে বিষাক্ত করে পিতার পরিবর্তে হত্যাকারীরূপে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হয়ে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে টলস্টয়ের লেখা প্রবন্ধ Childhood বা Laurence Sterne রচিত Sentimental journey থেকে আমরা কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারিনি। ভারতেও শিশুদের জন্য মননশীল বহু সাহিত্য রচিত হয়েছে। প্রতিটি লেখকই শৈশবের প্রয়োজনীয়তা, তাদের নিজ নিজ দেশ ও সমাজের আঙ্গিকে শিশুদের জীবন সমস্যা সম্পর্কে মর্মস্পর্শী রচনা লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের লেখা ও ভাবনা শিশুপাঠ্য কাহিনিতেই মুখ ঢেকে থেকে গেছে বরাবরের মত।

শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শিল্পবিপ্লবের পরই প্রকৃতপক্ষে শিশুশ্রমিকের আবির্ভাব। ১৮৩৩ সালে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের এক তৃতীয়াংশই শিশুশ্রমিক ছিল। ঐ সময়েই সেখানে খনিশ্রমিক হিসাবে শিশুদের চাহিদা ছিল খুব বেশি। ১৮৯৬ সালে ফ্রান্সের আদম সুমারিতে দেখা যায় যে সেখানকার কর্মরত শ্রমিকদের ২০% ছিল শিশুশ্রমিক। ১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট শ্রমিকের ১৭% ছিল শিশুশ্রমিক। সুতরাং একটু তথ্য ঘাটলেই দেখা যাচ্ছে যে আজ যেসব দেশগুলির উন্নয়ন আর আধুনিকতার গর্বে মাটিতে পা পড়ে না তাদের শিশুদের শৈশব বিপন্ন অনেক আগে থেকেই। শিশু শব্দটি সার্বজনীন। আমাদের দেশের শিশু বা অন্য দেশের শিশু সকলেই এককথায় সদ্য প্রস্ফুটিত কুঁড়ি। যাদের মধ্যেই নিহিত থাকে ভবিষ্যতের মহীরুহ। তাই বিষয়ের গভীরে যাবার আগে দেশ ও জাতির সীমারেখা মুছে ফেলাই ভালো।

২০০২ সালে International Labour Organisation প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রতিবেদনে পৃথিবীজুড়ে শৈশবকে নির্দয়ভাবে কেড়ে নেওয়ার হৃদয়বিদারক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের হাতে আসা তথ্য অনুযায়ী শিশুদের যেসব শ্রমে নিযুক্ত করা হচ্ছে সেগুলি হলো —

(১) হোটেল ও ভোজনালয়ে কর্মরত শিশু।
(২) গৃহভৃত্যের কাজে কর্মরত শিশু।
(৩) চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁয় কর্মরত শিশু।
(৪) কৃষিকাজে কর্মরত শিশু।
(৫) কাঁচ ও চুড়িশিল্পে নিযুক্ত শিশু।
(৬) ইঁটভাটায় কর্মরত শিশু।
(৭) বিড়ি বাঁধার কাজে কর্মরত শিশু।
(৮) বাজির কারখানায় কর্মরত শিশু।
(৯) প্লাস্টিক কারখানায় কর্মরত শিশু।
(১০) শিশু যৌনকর্মী (শিশুকন্যা)।
(১১) ঘরবাড়ি, সেতু, রাস্তাঘাট নির্মাণে যোগানদারের কাজে কর্মরত শিশু।
(১২) চোরাচালান ও মাদক পাচারের কাজে খবর আদান-প্রদান এবং অনেকসময় সরাসরিভাবে যুক্ত শিশু।
(১৩) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে উগ্রপন্থী কার্যকলাপে প্রয়োজনীয় খবর আদান-প্রদানে ব্যবহৃত শিশু।

উপরের এই বিন্যাস থেকেই বোঝা যায় যে সারা পৃথিবী জুড়ে এক বিরাটসংখ্যক শিশু কতকগুলি বিপজ্জনক শ্রমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বিশ্বে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১০০ কোটির বয়স ১৫-২৪ বৎসরের মধ্যে। আর এদের মধ্যে মোট শিশুশ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২১ কোটি। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে এ এক ভয়াবহ তথ্য। একথা অনস্বীকার্য যে কোন পিতামাতাই চান না যে তার সন্তান ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য শ্রম বিক্রয় করুক। অভাবক্লিষ্ট জীবনে অচিরেই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্যই তারা তাদের সন্তানদের শ্রমিক হতে উৎসাহিত করেন। ধনী আর দরিদ্রের ব্যবধান যতদিন না কমানো যাবে ততদিন এই সুগভীর সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়। বিশ্বের অন্তত ৬০টি দেশে জনসংখ্যার ৮০%-এর বেশি দারিদ্র্যসীমার নিচে

বসবাস করেন। তাই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের আর্থিক উন্নয়ন না ঘটালে শৈশবের প্রতি এই হৃদয়হীন আচরণের উৎসমূলে আঘাত করা যাবে না।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশও এই সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। বরং আমাদের দেশে শিশুশ্রমের বর্তমান চিত্র যথেষ্ট উদ্বেগজনক। সম্প্রতি খ্যাতনামা সংস্থা Reuters Alert প্রকাশিত সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে শিশুশ্রমের ব্যাপকতায় আমাদের দেশের স্থান ষষ্ঠ। ভারতের আগে রয়েছে ইরাক, সুদান, উগাণ্ডা, কঙ্গো এবং সোমালিয়া। ভারতে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি। শুধু রাজধানী দিল্লীতেই শিশুশ্রমে নিযুক্ত প্রায় ১৫ লক্ষ। প্রতিবছর ভারতে প্রায় ২০ লক্ষ শিশু অপুষ্টি ও রোগে মারা যাচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ইঁটভাটা, বিড়ি-বাজির কারখানা, প্লাস্টিক কারখানা, চায়ের দোকান, হোটেল ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত শিশুশ্রমিক প্রায় ৪ কোটি। প্রায় ৩ কোটি শিশু নামমাত্র বেতনে দুইবেলা দুমুঠো খাবারের বিনিময়ে গৃহভৃত্যের কাজ করে। অথচ এইসব শ্রমে শিশুদের কাজে লাগানো আইনত দণ্ডনীয়। Child Labour Act-কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আমাদের দেশে শিশুশ্রমিক নিয়োগ চলছেই। এই মারাত্মক ঘৃণ্য অপরাধ দমনের জন্য শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের অপরাধীদের চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। আগামী ১০ই অক্টোবর থেকে সারা দেশে কেন্দ্রীয় শিশুশ্রম আইন কঠোরভাবে বলবৎ হতে চলেছে। এই আইনে আইনভঙ্গকারীদের কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ রাজ্যে যাতে এই আইন লঙ্ঘিত না হয় তা দেখতে বদ্ধপরিকর। ভারতের শৈশব কতটা বিপন্ন সেই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের উপশাখা UNICEF সম্প্রতি একটি মূল্যায়ন প্রকাশ করেছে। এই মূল্যায়নের বক্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্য —

(১) ভারতে প্রায় ২০ লক্ষ শিশু ৫ বছর বয়সে পা দেবার আগেই মারা যাচ্ছে।

(২) ভারতের ৫ বছর বয়সের সীমার মধ্যে থাকা শিশুদের অর্ধেক সংখ্যকই অপুষ্টিতে কাতর এবং অপরিণত মস্তিষ্ক ও খর্বকায় দেহ তাদের ভবিতব্য।

(৩) পৃথিবীর মোট শিশুশ্রমিকের প্রায় ৪০% হলো ভারতীয় শিশু।

(৪) আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কন্যাভ্রূণ হত্যা অত্যন্ত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অনিবার্য ফল হিসাবে বিগত আদম সুমারি থেকে দেখা যাচ্ছে যে গো-বলয়ের তিনটি রাজ্যে মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা অর্ধেকের নিচে নেমে গিয়েছে। এই বিষয়টি আগামীদিনে এদেশে এক ভয়াবহ অভিশাপ বহন করে আনবে।

(৫) ভারতে স্বরাষ্ট্র, অর্থ, প্রতিরক্ষা দপ্তরকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয় তার সিকিভাগও স্বাস্থ্য দপ্তরকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে শিশুস্বাস্থ্য ও শৈশব স্বাধীনতার পর থেকেই অবহেলিত।

(৬) এদেশে শিশু ও শিশুকন্যা প্রচুর পরিমাণে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি বিদেশেও পাচার হয়ে যাচ্ছে। এই পাচারচক্রে কয়েকশো কোটি টাকা খাটছে। কয়েকদিন আগেই মালদায় দেহব্যবসাতে সম্মত না হওয়ায় পাচার করে আনা তরুণীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

উপরের তথ্যগুলি ভারতের শিশুদের দুর্দশাময় চিত্র বহন করলেও বিগত কয়েক বৎসর থেকে সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। দারিদ্র্যই যে শিশুকে শ্রমের পথে নিয়ে আসছে তা আমাদের দেশে আজ প্রমাণিত সত্য। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। এতদিনের পুরোনো সুগভীর বিষবৃক্ষ একদিনেই উৎপাটিত হওয়া অলীক কল্পনামাত্র। শিশুশিক্ষার অধিকার আমাদের দেশে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। বিদেশী সহায়তায় সরকার শিক্ষার খরচ বহন করছে 'সর্বশিক্ষা অভিযান' রূপায়ণের মাধ্যমে। 'মিড ডে মিল'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে শহর ও গ্রামের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। দেশের সর্বত্র পড়াশুনো করবার পরিবেশ ও পরিকাঠামোকে যাতে উন্নত করা যায় তার চেষ্টা চলছে অবিরত। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিদ্যালয়ে কখনও আসেনি বা বিদ্যালয়ছুট সকল ছাত্রছাত্রীদের ২০১০ সালের মধ্যে বিদ্যালয় অঙ্গনে নিয়ে আসা। শৈশবের দাসত্ব থেকে এই দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র আজ কয়েক বৎসর হলো এক বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে। অপুষ্টি ও রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত কিশোরী মেয়েদের প্রতিটি বিদ্যালয়ে UNICEF-এর সহযোগিতায় IRON TABLET প্রদান করা হচ্ছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এর সুফল হয়ত আগামী কয়েক বছরে পাওয়া যাবে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে আমাদের দেশের কিশোরীরা প্রথমে বুঝতে না পেরে প্রলোভনে পা দিয়ে নারী পাচারকারীদের খপ্পরে পরে এবং অবশেষে পৃথিবীর আদিম ব্যবসার অন্ধকারে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এছাড়াও কৈশোরের অনভিজ্ঞতার বশে এবং শারীরিক আবেগে এই বয়সে তারা অনেক ভুল করে ফেলে। এই বিষয়টিকে চিন্তা করে এবং শুধুমাত্র সমালোচনার জন্য সমালোচনাকারীদের

দূরে সরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদ্যালয়স্তরে 'জীবনশৈলী' শিক্ষার আয়োজন করেছে। এই পদক্ষেপের ফলে কৈশোরের নানা কৌতূহল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে কিশোর-কিশোরীদের জানানো যাবে। ফলে তারা অসাবধানতাবশত ভুল পথে পা বাড়াবে না। সরকারের এই সুচিন্তিত পদক্ষেপ আগামীদিনে কৈশোরের অপরাধ অনেকাংশে কমাতে পারবে বলে মনে হয়। তবে প্রতিটি সাধু পদক্ষেপ শুধু গ্রহণ করলেই হবে না, তা যাতে সঠিকভাবে রূপায়িত হয় সেই বিষয়টা নির্দিষ্ট করা আজকের যুগে সবচাইতে জরুরি। গত ১৮.৮.০৬ তারিখে প্রকাশিত CAG REPORT (COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL REPORT) 'সর্বশিক্ষা অভিযান' সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের মতে এই প্রকল্পের (প্রকল্প নয় প্রতিজ্ঞা) ৬ বৎসর অতিক্রান্ত হলেও সারা দেশে মাত্র ১ কোটি শিশুকে বিদ্যালয় অঙ্গনে আনতে পারা গিয়েছে। অনেক বিদ্যালয়ে Computer দেওয়া হয়েছে যাদের Computer পরিচালনার ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই। অর্থও সর্বত্র সঠিক জায়গায় সমানভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে একটি মহান কর্মযজ্ঞ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আগে ভাবতে হবে যে এর উপর আগামী ভারতীয় প্রজন্ম নির্ভর করে আছে। একটি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো মানবসম্পদ। সেই মানবসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে 'সর্বশিক্ষা অভিযান'কে সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে SENT PERCENT সাফল্যের স্তরে নিয়ে যেতেই হবে। তা না হলে ভারতীয় শিশুদের শৈশব বিপন্নই থেকে যাবে চিরকাল, আর আগামী প্রজন্ম আমাদের আঙ্গুল তুলে প্রশ্ন করবে যে, কবির সেই পরিচিত স্বপ্নের পঙক্তি কয়টিকে শুধুমাত্র আপ্ত বাক্যতেই সীমাবদ্ধ রাখার অধিকার আমাদের কে দিয়েছিল?

"এ শিশুকে এ পৃথিবীর বাসযোগ্য করে যাব আমি,
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

সদস্যবন্ধু এবং লেখক-পাঠকদের প্রতি

★ ২০০৫ সালের ২৬শে জুন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্যালয় ইউনিট থেকে জোন, মহকুমা, জেলা ও রাজ্য সব স্তরের কমিটি সদস্যদের 'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র গ্রাহক হতে হবে। এ বিষয়ে সবাইকে যত্ন নিতে হবে, নজর রাখতে হবে।

★ আগামী অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের সংখ্যাগুলি বিগত বছরের মতই যথাক্রমে 'কবিতা', 'নভেম্বর বিপ্লব' এবং 'কথা সাহিত্য' সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। উৎসাহী লেখকদের এই বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য লেখা পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে। লেখা পাঠানোর সময় লেখকবন্ধুদের পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি মেনে ফুল-স্কেপ কাগজের একদিকের পৃষ্ঠায় লিখে তার ফটোকপি (Xerox Copy) নিজেদের কাছে রেখে মূল লেখাটি পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদক
শিক্ষা ও সাহিত্য

একটি জ্বলন্ত সমস্যা ঃ কিছু ভাবনা

বিশ্বরূপ কাঁঠাল

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, নলহাটি হরিপ্রসাদ হাইস্কুল, বীরভূম

আজকাল একটা ঘটনা যা আমাদের মনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয়, তা হলো কিশোর আত্মহননের ঘটনা। বিশেষ করে কোনো পরীক্ষায়, তা সে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষাই হোক, বা প্রান্তিক চূড়ান্ত পরীক্ষাই হোক, ফল প্রকাশের পর মন শঙ্কাতুর হয়ে থাকে কী জানি, কখন কী হয়। বাপ-মাতো বটেই, শিক্ষক শিক্ষিকারাও শঙ্কিত হয়ে থাকেন। এই সময় কাগজ খুললেই চোখে পড়ে এসব ঘটনার বেদনাবহ সংবাদ। এ যেন বর্তমানে একটা সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু কেন এমন হচ্ছে ? এক শ্রেণির তরুণ-তরুণী হঠাৎ জীবন সম্পর্কে এমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল যে এই জীবনঘাতী পথ বেছে নিতে বাধ্য হলো নাকি অন্যকিছু ? তারা কি হয়ে পড়েছে মূল্যবোধহীন ভোগবাদী একান্ত স্বার্থসর্বস্ব প্রতিযোগিতার শিকার ? কিশোরমন তো ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উজ্বল আদর্শে ভরপুর থাকে তাদের কাছে জীবন তো স্বপ্নময়,ভবিষ্যৎ সাফল্যের কামনায় আশাবাদী তারা। আর সে-জন্যেই এইসময় শুরু হয় তাদের জীবনগড়ার কাজ। পড়াশোনা, খেলাধূলা, উদ্দাম কর্মচাঞ্চল্যে ভরা থাকার কথা জীবনের এই বিশেষ সময়কালটা। এরই মধ্যে হঠাৎ আত্মহননের ঘটনা ছেদ টেনে দেয় তাদের স্বপ্ন-রঙিন জীবন-পথে।

হয়তো ব্যক্তিগত কোনো বিশেষ কারণে কোনো তরুণ-তরুণী এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সে ঘটনা তো ব্যক্তিগত। এক-আধজনের জীবনেই ঘটতে পারে। কিন্তু এই ঘটনা যখন ঘটে ব্যাপকহারে, তখনই এর কারণ অনুসন্ধানে নামতে হয় সামাজিক প্রেক্ষাপটেই। খুঁজতে হয় মনোবিজ্ঞানীদের চোখ নিয়ে।

কিশোরমন জীবনের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ। এই সময় তার প্রস্ফুটনের কাল, ভাঙা-গড়ার কাল, বিপর্যয়ের কাল। পুরোনো নিয়ন্ত্রিত জীবন থেকে ব্যক্তিসত্তা বিকাশের সূচনা পর্ব এ'টি। তাই স্বাভাবিক কারণেই কৈশোরের বয়ঃসন্ধি জনিত বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার জীবনে নিয়ে আসে ঝড়ঝঞ্ঝার (stress and strain) মানস-প্রক্রিয়া। সে অনেকটা অসহায় হয়ে পড়ে নোতুন জীবনের সন্ধিক্ষণে এসে। ফলে তার মনোজগতে থাকে প্রবল চাপ।

তার ওপর যুক্ত হয় পরিবেশগত চাপ। বর্তমানে সমাজ-জীবনে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী জীবন-দর্শনের প্রভাব অত্যধিক। সামাজিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত। মিডিয়ার ক্রমাগত অপসংস্কৃতিমূলক আক্রমণ কিশোরমনকে অস্থির করে তোলে। টিভি'র পর্দায়, সংবাদপত্রের পাতায় কেবল খুন-জখম-রাহাজানি-আত্মহত্যার লোমহর্ষক কাহিনি। তার চাপও কম নয়।

অন্যদিকে আবার তীব্র প্রতিযোগিতার আহ্বান। বেঁচে থাকার জন্যে, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তাদের অহরহ মুখোমুখি হতে হয় অসম প্রতিযোগিতার। যেনতেনপ্রকারে এগিয়ে যেতে হবে। না-হলে জীবন অর্থহীন। এই মানসিকতা থেকে সৃষ্টি হয় একধরনের অসহায় মানস-বিক্রিয়া। ন্যায়-নীতিবোধ হারিয়ে যায়, হারিয়ে যায় ব্যক্তিগত সাধ্য ও সামর্থের ফারাক। সবাই ভাবে অন্যকে টপকে যেতে হবে। এর ফলে তাঁদের জীবনে নেমে আসে এক অসহায় দিশেহারা ভাব। তা থেকে সৃষ্টি হয় হতাশা।

প্রাথমিকভাবে জীবন-গড়ার কাজে তারা নেমে পড়ে পরীক্ষা-বৈতরণী পার হবার জন্যে। ভালো রেজাল্ট না করলে চলবে না। তারজন্যে ছুটে চলে প্রাইভেট টিউটরদের দরজায় দরজায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে জ্ঞান গলাধঃকরণের কাজ। খেলাধূলা, সংস্কৃতিচর্চা, সামাজিক মেলামেশা সব তাদের জীবন থেকে মুছে যায়। তারা যেন ক্রমেই হয়ে পড়ছে যন্ত্রমানব, সমাজবহির্ভূত স্বয়ম্ভু।

আমাদের গরীব দেশে বিত্তহীনের সংখ্যাই বেশি। অধিকাংশেরই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এই অবস্থায় ছেলেমেয়েদের এই শিক্ষাগত চাহিদা মেটাতে তারা হিমসিম খেয়ে যায়। ফলে এইসব বাড়ির ছেলেমেয়েদের ভালো রেজাল্ট করার সাধ থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধ্যে কুলোয়

না। স্কুলে পড়া বুঝতে না পারলে এদের বুঝিয়ে দেবারও কেউ নেই। না বাড়িতে, না বাইরে। প্রাইভেট টিউটরদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছানো তাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। না-খেয়ে, না-দেয়ে যদিওবা কেউ পৌঁছল, তাদের জীবনে চাপ পড়ে খুবই বেশি। পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করতে না পারলেই তাদের ধারণা হয়ে পড়ে তারা বাপ-মায়ের কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় ঘটাচ্ছে। আর যাদের সে সামর্থ্য কুলোল না, তারা ভাবে তাদের জীবনই ব্যর্থ। এই অবস্থার টানাপোড়েনে একশ্রেণির কিশোর-কিশোরী জীবন সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

সামর্থ্যবান তরুণ-তরুণীর জীবনে অন্য সমস্যা। এসব ক্ষেত্রে অভিভাবক, বিশেষ করে অভিভাবিকাদের সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা, ছেলেমেয়েদের কাছে অত্যধিক প্রত্যাশা এইসব ছেলেমেয়েদের জীবনে নিয়ে আসে অতিরিক্ত চাপ। এদের বাপ-মায়েরা ছাত্রছাত্রীর বৌদ্ধিক সামর্থ্যের কথা চিন্তা না করেই নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে চান ছেলে-মেয়েদের ওপর। তারা ভাবেন, তাদের ছেলেমেয়েকে হতে হবে সর্ববিদ্যাবিশারদ। ছেলেমেয়েদের বোঝা বইবার শক্তি সামর্থের কথা না ভেবেই তারা চান তাদের ছেলেমেয়েরা একাধারে হবে মেঘনাদ সাহা, প্রশান্ত মহলানবীশ, হেমন্তকুমার, লতা মুঙ্গেশকর, সুনীল গাঙ্গুলী, আশাপূর্ণা দেবী বা ওই বুকবই কেউকেটা। এরফলে আশাহীনতার যন্ত্রণায় বিভ্রান্ত হয় কিশোরমন। প্রতিমুহূর্তে বাপ-মায়ের তাড়ন সহ্য করতে করতে তাদের মানসিক অবস্থা হয়ে পড়ে বিকলাঙ্গ। তাই পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য না পেলে বাবা-মায়ের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে এরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। উপায় খুঁজে না পেয়ে অনেক সময়েই তারা বেছে নেয় আত্মহননের সহজ পথ। এরা কেউ-ই বিকৃতমনস্ক নয়। সামাজিক মানস-যন্ত্রণার শিকার। তাই এ দায় ব্যক্তির নয়, এ দায় সমাজের।

সামাজিক প্রেক্ষাপটেই খুঁজতে হবে সমাধানের পথ। প্রথমেই, কিশোরমনের বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যার কথা মাথায় রেখে অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সকলেই হতে হবে অনেক বেশি সচেতন, সংবেদনশীল এবং সহমর্মী। ছাত্রছাত্রীর সমস্যা, তাদের মানসিক বিপর্যয়ের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে সহানুভূতিশীল মন নিয়ে দাঁড়াতে হবে তাদের পাশে। উৎসাহিত করতে হবে তাদের যাতে তারা এইসব বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারে সহজে। কোনোরকম অসহিষ্ণুতা নয়, বরং প্রকৃত বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে তাদের সঙ্গে।

পারিপার্শ্বিক জগতের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পরিবেশ থেকে যতটা সম্ভব তাদের সরিয়ে রেখে বাবা-মা-আত্মীয়স্বজনের সান্নিধ্যের মধ্যে রাখতে হবে তাদের। সবসময়েই শুধু পড়াশোনার চাপের মধ্যে না রেখে, সুস্থ জীবন-পরিবেশের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার দিকে নজর দিতে হবে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজবের একটু নির্জন অবসর বের করে আনতেই হবে। বিশেষ করে, বাবা-মায়ের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হলে ছেলেমেয়েরা খোলা মনে বাবা-মায়ের কাছে তাদের মনের দরজা খুলে দিতে আগ্রহী হয় না। বরং নিজেদের গুটিয়ে নেয় নিজেদের মধ্যে। আত্মমুখী হয়ে পড়ে তারা।

সব ছেলেমেয়ের মেধা-সামর্থ্য এক নয়। এ কথা মনে রেখে তাদের সকলের মধ্যেই মণিমুক্তো খুঁজে বের করার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে তাদের 'মাস্টার্স অব্ অল' তৈরি করতে গেলে শেষ পর্যন্ত তারা 'জ্যাক অব্ অল ট্রেডস' হয়ে পরীক্ষার চক্রব্যূহে ঢুকে জীবনের সব আনন্দ খুঁজে পেতে চেষ্টা করে একমাত্র বেশি নম্বর পাওয়ার মধ্যে। ফলে ঝুলিতে 'হাইয়েস্ট মার্কস' না-পেলে তাদের জীবনটাকেই মনে করে অর্থহীন। অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন থেকে জীবনের চড়াই-উৎরাই পথগুলো মোকাবেলা করার মতো শক্তি ও সাহস যোগাতে হবে ছেলেমেয়েদের। শুধু 'ক্যারিয়ার'-সর্বস্ব হলেই চলবে না, জীবনে শুধু অর্থ উপার্জনই শেষ লক্ষ্য নয়, এ কথা বোঝার ও বোঝানোর সময় এসেছে। না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে হতাশার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

তাদের মানসিক যন্ত্রণা লাঘব করার জন্যে অভিভাবকদের হতে হবে অনেক বেশি সংবেদনশীল। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে উপযুক্ত কাউন্সেলীং-এর ওপর জোর দিতে হবে। দেখতে হবে ছেলেমেয়েদের ওপর বাবা-মায়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছাটাই যেন বড়ো হয়ে না ওঠে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের বেড়ে ওঠার পথকে মসৃণ করে রাখতে সচেষ্ট থাকতে হবে অভিভাবকদের। সচেষ্ট থাকতে হবে তাদের মনের অতিরিক্ত চাপ লাঘব করতে।

লক্ষ্য রাখতে হবে, শিক্ষার্থীদের মনে যেন বেশ একটু ফাঁকা জায়গা থাকে, যেখানে তারা ইচ্ছেমত হাসতে পারবে, কাঁদতে পারবে, খেলতে পারবে, মিশতে পারবে একে অন্যের সঙ্গে। আদান-প্রদান করতে পারবে মনের ভাব-ভাবনার, খুলে দিতে হবে খেলাধূলা, বিশুদ্ধ আমোদ-আহ্লাদের মুক্ত অঙ্গনের অর্গল।

বড়োদের সচেতন সহানুভূতিশীল সহমর্মী আচরণই এই জটিল সমস্যা সমাধানের খোলা পথ।

বিদ্যালয়ে নাট্যচর্চা

উত্তম সাহা

শিক্ষক, সত্যভারতী বিদ্যাপীঠ, উত্তর ২৪ পরগণা

পুরাণ উপনিষদে সূর্যপ্রণামের কথা বলা আছে। দিনের সূচনা যে অরুণ আলোয়, তাকে স্বাগত জানাতেই এই প্রণতি জ্ঞাপনের পরামর্শ। শিশুনাট্যের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে এই 'শিবের গীত'। সেদিন এক নাট্যোৎসবের দর্শকাসনে বসেছিলাম। সেই সন্ধ্যায় পর পর চারটি নাটকের অভিনয়। নাট্যরসিক এক মায়ের সাথে এসেছে এক কিশোর। বা বলা ভাল, মা নিয়ে এসেছেন ওকে। স্কুল পড়ুয়া। পাশে বসে শুনতে পাচ্ছি জন্মদাত্রীকে পুত্রের হুঁশিয়ারী — "মা! একটা নাটক দেখেই কিন্তু চলে যেতে হবে। বাড়ি গিয়ে হোমটাস্ক শেষ করতেই হবে।" মা আশ্বস্ত করে নাটকে মনোনিবেশ করলেন। প্রথম নাটকটি শেষ হতেই কিশোরের আক্ষেপোক্তি, "ইস্! আটটা দশের 'জয় হনুমান'ও মিস্ করলাম এই বিচ্ছিরি নাটকের জন্য!"

শুধু এই কিশোরই নয়, আজকের অধিকাংশ শিশু-কিশোরই এই 'বিচ্ছিরি' নাটক করতে বা দেখতেও আসে না। তারচেয়ে বরং বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, এমন কি 'কার্টুন' দেখতেই বেশি আগ্রহী পড়া অফ্ করে বা হোমটাস্ক করতে করতেই। কেন এমনটা হল? যদি বলি টি ভি দায়ী। তবে হয়তো নিজের, নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার দায় নিতে হয়। কারণ টি ভি তার কাজ (বা ব্যবসা) করে যাবেই। তার মধ্যেই তো এই পশ্চিমবঙ্গের অন্তত ৫০টি দল (গ্রুপ থিয়েটার) শহর-গ্রামের আলোকিত মঞ্চে (বিশেষত নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি) প্রতি রাতে হাজার-হাজার মুগ্ধ দর্শকের সামনে তাদের অভিনয় প্রদর্শন করছে। এই সমস্ত দলের সদস্য-সদস্যারা সকলেই তরুণ অথবা যৌবনোত্তীর্ণ। কিশোর-কিশোরী? হাতে গোনা কয়েকটি দল ছাড়া তারা কোথায়? তাদের এই অনুপস্থিতির কারণ কি শুধু টি ভি? সম্ভবত না। কারণ টি ভি-র এই 'ধামাকা'-র মধ্যেই তো সারা রাজ্যব্যাপী নাট্যোৎসবের প্রতি সন্ধ্যায় সর্বত্র হলভর্তি দর্শক। সুতরাং 'এহো বাহ্য'! সমস্যাটা তো অন্যত্র।

আজকের কিশোর চার্লি চ্যাপলিনের নাম শুনবার আগেই ঋত্বিক রোশনকে চিনে ফেলে। পড়াশুনার অবসরে 'সৌরভ' হবার সাধনায় নিমগ্ন থাকে। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিই কি তাকে এইভাবে দুনিয়া চিনতে শেখাচ্ছে? সাধনার শেষে সিদ্ধিলাভের হাতে-গরম-ফল পাওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলক কম বলেই অভিভাবকেরা (অধিকাংশ) ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের পরিবর্তে কোন নাটক-পাগল দাদা বা কাকুর কাছে কিংবা নাট্য কর্মশালায় প্রশিক্ষণ নেবার জন্য পাঠাতে ভরসা পান না বা পাঠান না। তাছাড়া 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' থিয়েটারের কাকু-জেঠুরাও সমাজে খুব একটা পাত্তা পান না— এটাও কিশোর-কিশোরীরা চোখের সামনে 'দেখছে। অন্যদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হওয়া যায়, কিন্তু নিজের ঘরের মানুষটা থিয়েটার করে রাত-বিরেতে বাড়ি ফিরবেন—এই উদারতা এখন বড় দুর্লভ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই আত্মকেন্দ্রিক নিস্পৃহ মনোভাব কিশোরদেরও প্রভাবিত করছে।

অনেকে বলেন, শিশু-কিশোর নাটকেরও আজ বড় অভাব। রবীন্দ্রনাথ, বিমল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, সুনির্মল বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)-র যুগ পেরিয়ে দীননাথ সেন, রাধারমণ ঘোষ, সমর চট্টোপাধ্যায়, অমল রায়, শৈলেন ঘোষ, তীর্থঙ্কর চন্দকে তো আমরা পেয়েছি! তবুও বড়দের নাটকের তুলনায় ছোটদের নাটক কমই পাচ্ছি আমরা। বস্তুতঃপক্ষে শিশু-কিশোর নাটক লেখা বড় সহজও নয়। শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ভাল ধারণা না থাকলে, শিশুকে ভালবেসে তাঁদের সঙ্গে মিশতে না পারলে শিশু-নাটক লেখা কঠিন। তাছাড়া সবক্ষেত্রেই নাটকের নির্বাচক হন বড়রাই, শিশুরা নয়। বড়দের যা ভাল লাগে, শিশুদের তা ভাল নাও তো লাগতে পারে। ফলত, ক্রমশ মহিলাকক্ষে শিশু-কিশোরের সংখ্যা কমতে থাকে। ভাবা দরকার, বড়রা যাকে নগণ্য মনে করে তাই শিশুর কাছে পরম বিস্ময়ের। যে নাটকে এই বিস্ময়কর উপাদানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে, সে নাটক তাদের কাছে হয়ে ওঠে আকর্ষণীয়। নাটককে শিশুর মনোগ্রাহী করতে হলে

এমন চরিত্র, ঘটনা ও বিষয় সংযোজিত করতে হবে যা তাদের কৌতূহল ও আবেগকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। এককথায়, নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে অভিনবত্ব অবশ্যই থাকতে হবে। দরকার তাদের পরিচিত জগতের প্রতিফলন।

আমাদের ছোটবেলায় পাড়ায় নিজেরাই মঞ্চ বেঁধে 'মুকুট', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'ভাড়াটে চাই' করেছি, করেছি 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', 'রোগীর 'চিকিৎসা'—কত কী ! বাড়ির শাসন, বকুনি খেয়েও। আজকের কিশোর এব্যাপারে টু মাচ প্রফেশনাল। বাড়ির চাপে, পড়ার চাপে। পাশাপাশি শিশুনাট্য সংগঠকেরও আজ বড় অভাব। স্কুলে স্কুলে নাট্যচর্চা প্রায় নেই বললেই চলে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়ানো, প্রশ্ন করা এবং খাতা দেখার নির্দিষ্ট কাজটি ছাড়া 'অতিরিক্ত' কিছু করতে উৎসাহ পাচ্ছেন না। অনুকূল পরিবেশও কমে (দু'-একটি ব্যতিক্রমী স্কুল বাদে) আসছে স্কুলে। অল্পদিনের প্রস্তুতিতে যদিওবা দু'একটি প্রযোজনা প্রস্তুত হচ্ছে, তাও সঠিক মান-এ পৌঁছতে না পারার জন্য শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী (কুশীলব) এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। পুনরাভিনয়ের উদ্যোগ মূলেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে আশা করবার মতো ছবি চোখের সামনে নেই।

উপসংহারে একটি কথারই পুনরাবৃত্তি করতে হয়, কোনো দেশের সংস্কৃতি, সভ্যতা নির্ভর করে সেই দেশের মানুষের উপর। আজকের শিশুই আগামীদিনের পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবে। কিছু শুরু করতে হলে ওদের দিয়েই করতে হবে, অনেকটা সূর্যপ্রণামের মতো। 'ভালো নাটক নেই তেমন'—এই আক্ষেপে গলা না মিলিয়ে নিজেকে একজন আদর্শ নাট্যকার-পরিচালক করে গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি ছাত্রছাত্রীদের ভালবাসতে হবে।

একটি অসুস্থ গন্তব্য ঃ সৌমিকে'র চলে যাওয়া ও ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষিত

অশোক অধিকারী

"আমরা যা পড়াচ্ছি, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যা পড়ছে বহু ক্ষেত্রে আমাদের চেতনার তথা জীবনধারার সঙ্গে তার সামান্যতর যোগও নেই। অন্য নানা বহির্সমস্যা যদি নাও থাকতো তাহলেও এ অবস্থায় অবসাদ না এসে পারে না।.....সংকট তাই ভিতরে বাইরে দু'দিকেই। যেখানে উৎপাদন ব্যাহত, বন্টনব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন, বিনিয়োগ তুচ্ছ, বেকারী ক্রমবর্ধমান, শিক্ষাপ্রসঙ্গ সেখানে উপহাসনীয়। অন্যদিকে যে শিক্ষাব্যবস্থায় সৌষম্য অনুপস্থিত, শিক্ষা যেখানে জীবনের ও সমাজের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন, পরীক্ষাপ্রণালী যেখানে নিষ্প্রাণ, নিয়মনিষ্ঠা সেখানেও সর্বনাশের সূচনা।"

(শিক্ষা, সমাজ, পরিবেশ ঃ অশোক মিত্র)

প্রেক্ষিতটি সাতের দশকের। সময় এখানে সাজা-পাওয়া অপরাধীর ধ্বস্ত চাহনির মতো দীর্ণ। মননের অভিনিবেশ করায়ত্ত বিশৃঙ্খল জঙ্গলে। জঙ্গম এখানে স্তব্ধ। নতজানু প্রসঙ্গমালা আগামী পরিবর্তনের দীক্ষায় প্রহরসন্ধানী। গন্তব্য অনিশ্চয়। বর্তমান সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা' (সুকান্ত) আজ আবার থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছে বা দিচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের সমৃদ্ধ মেধার উপলে। অনেক কথা অনেক পরামর্শ এদিকে ওদিকে জন্ম নিচ্ছে আবার শোকের আয়ু ফুরালেই আমরা মিশে যাচ্ছি সেই বহমানতায় যেখানে শিক্ষা মানে ডিঙিয়ে ওপরে ওঠা। শিক্ষা মানে সমাজ অসম্পৃক্ত সেই অকার্যকর ভাবনা যেখানে কতিপয় বিকশিত হওয়ার সুযোগে ভুলে যায় দায়বদ্ধতা কিংবা পণ্যমুখী মানসিকতার সার্থক উপাচার হয়ে নিজেকে স্থাপিত করে নৈবেদ্যের চূড়ায়। তবুও বিষয়টি যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অসহিষ্ণু পরিবেশ নিয়ে। এবং সেই অনভিপ্রেত পরিবেশে বহমান আর্তনাদ প্রজন্মের দাক্ষিণ্যকে কলুষিত করছে। যেখানে শিক্ষা আছে অনুভব নেই। দীক্ষা আছে দীক্ষক নেই। পরিবেশ দূষণ আছে। প্রতিকারের উপায় জানা নেই। তবু কী আশ্চর্যভাবে ফেটে যায় সকলের স্বপ্নের ফানুসগুলো। বলতে ইচ্ছে করে কী চায় এরা! কী বলতে চায় এদের নিহিত অভিজ্ঞান। একপ্রকার ভাষাহীন কদর্য মূকাভিনয়ের ঘাতক হয়ে আস্তিনে লুকিয়ে রাখে বন্ধুহত্যার ছোরা। কোনো অনুতাপ এখানে প্রশ্রয় পায় না। কোনো সহানুভূতি এখানে বেমানান। তাহলে কি সেই প্রশ্ন করার সময় এখন সমুপস্থিত! কী হবে আমাদের আগামী প্রজন্মের। কিংবা এই হত্যা উল্লাসের কারিগর, এই ঘাতক প্রজন্ম দিয়ে আমাদের কী হবে! তাহলে যে সংকটের প্রসঙ্গ শিক্ষাবিদ অশোক মিত্রের রচনায় এসেছে, যে সংকট ভিতরের এবং অবশ্যই বাইরের। যেখানে তিনি অনুপস্থিত সৌষম্য এবং জীবন ও সমাজবিচ্ছিন্ন শিক্ষার ভবিতব্য লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়েছিলেন। আজও সমানে সেই খেদোক্তি সম্বল করে শিক্ষার আঙিনায় যদি 'শতফুল বিকশিত হোক' বলে আড়ম্বরের ভজনা শুরু করতে হয় তবে অনেক রক্ত মাড়িয়ে আমাদের মেধা সরবরাহের প্রতিষ্ঠানগুলি আগামীদিনে 'কার্গিল' হয়ে যাবে সন্দেহ নেই! তবুও এ অস্থিরতার ফাঁকফোঁকর দিয়েও কিছুটা আলো, কিছুটা বাতাস এসে ছুঁয়ে যায় সমাজের শরীর। জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ ভজনালয় — এই জীর্ণ ও দীর্ণ ভাবনা থেকে সুস্থ সবল সমীকরণ আবার স্বপ্নের জন্ম দেয়। যা দিয়ে কেটে যায় আরও হাজার বছর। মাননীয় অভিভাবকবৃন্দ, আজ শুধু শোক নয়। কারণ শোকের আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই আগামীর জন্য আমাদের বেঁচে থাকতেই হয়, হবে। একটি সংবাদ দৈনিকের জনমত বিভাগে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত চাওয়া হয়েছে দেখলাম। প্রশ্নটি ছিল ঃ 'ছাত্র সংগঠনগুলি কি ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে?' শতাংশ বিচারে পক্ষে মত দিয়েছে ৮৯ এবং বিপক্ষে ১০। বিশ্বাস করি, এই এস এম এসের বিচারের রায় সব নয়। তবুও জীবনানন্দের কবিতার ভাষায় 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা

করে/আমাদের ক্লান্ত-ক্লান্ত করে। একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক্। ছাত্রসংগঠনের প্রাথমিক সদস্যপদ নিয়ে দু'চার কথা বলি। সংগঠনের সদস্যপদ পাওয়া ও তার প্রতি দায়বদ্ধতা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। একটি থাকলেই অপরটি থাকবে এমন কোনো ব্যাপার নয়। তবুও সংগঠন কী ভাবে? বিশেষত যেসব ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ঢোকে। অপরিণত মস্তিষ্কের কাছে বয়ঃসন্ধির এই ছেলেবেলা বা মেয়েবেলা যাই বলি না কেন একপ্রকার ধোঁয়াশা নিয়েই হাজির হয়। বৃহত্তর পরিবেশে এসেই লক্ষ্য করে একটি 'হেলাফেলা সারাবেলা' অবস্থা। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সমস্যাটি অন্যমাত্রা পায়। তবুও শুধুমাত্র সদস্য করিয়ে নিলেই হাতখালি হয়ে যায় এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। কারণ এমন অভিজ্ঞতাও আছে রাজনীতিগতভাবে অন্য মেরুর পরিবারের একটি ছেলে/মেয়ে কলেজে এসে পরিবারের অভ্যস্ত রাজনীতির বাইরের রাজনীতি করে। অনেক সময় নির্বাচনে দাঁড়িয়েও যায়, জিতেও যায়। তাহলে বিষয়টি কী দাঁড়ায়! একটি আড়ম্বর-সর্বস্বতা অসচেতন অভীপ্সা তাকে ছাত্র রাজনীতির আঙিনায় টেনে আনে। এর ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। এখন ছাত্রসংগঠনগুলির দায়িত্ব অনেক অনেক বেশি মাত্রায় বেড়ে গেছে। নেতৃত্বের তো কথাই নেই। আর পরীক্ষিত ছাত্র/ছাত্রী সদস্য কিংবা পরীক্ষিত ছাত্র/ছাত্রী নেতা সোনার পাথর বাটির সমান। তাহলে এ হিংস্রতার জন্ম হবার আগে তাকে পরিশীলিত করার ভাবনা আমাদের মনে থাকা দরকার। এবং শতাংশ বিচারে সাধারণের রায় যেদিন ১০০ শতাংশে পৌঁছবে সেদিন শিক্ষাসত্রগুলি কী আশা-স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকবে তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। কিন্তু আশাবাদী আমরা তাই বোধহয় সৌমিকদের বারেবারে হারাতে হারাতে বুক বাঁধি এই আশায় যে আগামী পড়ে আছে আমাদের জন্যই। যেখানে যৌবনের অগ্রদূত অনুশোচনার আগুনে ছাই করবে না উৎসাহের কয়লা। ছাত্রসংগঠনে বর্তমানে কী হয় একটু তলিয়ে দেখলেই বিষয়টি বোঝা যাবে। মোটামুটি নিম্নধরনের কর্মসূচিই পালিত হয় ঃ

(ক) সদস্যপদ পূরণের প্রচার ; (খ) নবীনবরণের পণ্যায়নী ব্যবস্থা ; (গ) বাৎসরিক সোসালের নামে যথেচ্ছাচার ; (ঘ) ক্লাশ চলাকালীন স্লোগান/মিছিল ; (ঙ) কারণে-অকারণে ঘেরাও কর্মসূচি ; (চ) নির্বাচনের কর্মসূচি এলে কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়কে মিনি 'রণক্ষেত্রে' রূপান্তর ; (ছ) নেতৃত্বের বিশেষ বিশেষ কর্মসূচির সপ্তাহ পালন ইত্যাদি ইত্যাদি। এর সঙ্গে ছাত্রসংগঠনগুলিতে যা হওয়া উচিত ছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। সমস্তগুলির ক্ষেত্রেই আমার সঙ্গে সকলে একমত হবেন এমনটি নয়। তবুও —

(ক) সদস্যপদ দেবার আগে কেন সদস্যপদ তার জন্যে একটি বড় সময় ব্যয় করা ; (খ) অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য এবং পড়াশুনায় ভালো যারা তাদের নেতৃত্বে আসা ; (গ) ক্লাশ কামাই করে কোনো কর্মসূচি গ্রহণ না করা ; (ঘ) পঠন- পাঠনকে গতিশীল করা ; (ঙ) বাইরের নেতৃত্বের এলাকা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকা ; (চ) নবীনবরণ শুধুমাত্র শুভেচ্ছা অনুষ্ঠান না হয়ে তার সঙ্গে কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য তুলে ধরা ; (ছ) প্রতিমাসে একটি করে শিক্ষাশিবির পরিচালনা করা ; (জ) অধ্যাপকদের অনিয়মিত ক্লাশগুলিকে নিয়মিত করার জন্য আন্দোলন করা ; (ঝ) সংগঠন যারাই পরিচালনা করুন অন্য সংগঠনের সঙ্গেও যৌথ কর্মসূচি (শিক্ষা/পঠন-পাঠন বিষয়ক) গ্রহণ করা ; (ঞ) পরীক্ষার সময় কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ যাতে সুস্থ থাকে তার জন্য আগে থেকেই প্রচার সংগঠিত করা ; (ট) বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা ; (ঠ) ছাত্র/ছাত্রী, অধ্যাপক সমিতি গঠন, যেটি যৌথভাবে পরিচালিত হবে ; (ড) যে কোনো কোর্সের ক্লাশ শুরুর এক হপ্তার মধ্যে সেই কোর্সের সঙ্গে সংযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীর অভিভাবকদের নিয়ে একটি সভা করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন আমাদের সকলের প্রিয় সৌমিকের মৃত্যুর আগে/পরে এই মর্মান্তিক ঘটনার বিশ্লেষণে যেসব প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা তাৎক্ষণিকভাবে বেরিয়ে এসেছে বিভিন্নজনের কাছ থেকে তার একটি তালিকা তুলে ধরা যাক —

১. 'বন্ধুর **জীবনের চেয়ে রাজনীতি বড় নয়**। তাঁরা আর ছাত্ররাজনীতিতে অংশ নেবেন না' (ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য)।

২. 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য প্রশাসনের উচিত এই ঘটনার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া। ক্যাম্পাসে এই ধরনের **অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ** রুখতে প্রশাসনকে সচেতন হতে হবে' (বিমান বসু, রাজ্য সম্পাদক, সি পি আই এম)।

৩. 'জীবনের চেয়ে রাজনীতি বড় নয়। কীভাবে এড়ানো যায় এই সংঘর্ষ তা আমাদের ভাবতে হবে' (বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রনেতৃত্ব)।

৪. 'স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে **গণতান্ত্রিক পরিবেশ, শিক্ষার পরিবেশ ও ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুত্বের পরিবেশ** যাতে বজায় থাকে তার জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত' (বিমান বসু)।

৫.'যে বা যারাই এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকুক তাদের ভূমিকা

ছিল দুর্বৃত্তের। **এই ঘটনা ছাত্রআন্দোলনে দুর্বৃত্তায়নের চেষ্টা,** ছাত্রআন্দোলনের কলঙ্ক। **রাজ্যের ছাত্ররাজনীতির মূল ধারার ক্ষেত্রে এই ঘটনা এক বিপজ্জনক ব্যতিক্রম।** কোনো দায়িত্বশীল ছাত্রসংগঠন এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে একথা ভাবা যায় না। সৌমিককে ঘিরে তার বাবা, মা, পরিবার-পরিজনের অনেক স্বপ্ন ছিল। সবই তো শেষ হয়ে গেল' (সুদর্শন রায়চৌধুরী, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী)।

৬. 'সৌমিক বসুর মৃত্যুতে গোটা ছাত্রসমাজ মর্মাহত। এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার সুস্থ বাতাবরণ বজায় রাখতে এস এফ আই বৃহত্তম ছাত্রসংগঠন হিসাবে দায়িত্বশীল ভূমিকাপালনে দায়বদ্ধ' (অপূর্ব চ্যাটার্জি, এস এফ আই, রাজ্য সম্পাদক)।

৭. 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না সৌমিক আর নেই। খুব ভোলাভালা সাদামাটা স্বভাবের ছেলে ছিল সৌমিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং **এস এফ আইকে সমর্থন করলেও সবার সঙ্গে ওর সুসম্পর্ক ছিল'** (অনির্বাণ শীল, সৌমিকের বন্ধু)।

৮. 'সৌমিক মেধাবী ছাত্র হিসাবে যেমন পরিচিত ছিল তেমনই **শান্ত ও নম্র স্বভাবের জন্য** সকলের কাছে প্রিয় ছিল' (মদনমোহন দে, সৌমিকের বাড়ির মালিক)।

এর বাইরে আরও অনেক কথা চালাচালি অনেক বিশিষ্টদের মস্তিষ্ককে বিব্রত করেছে এই ঘটনায়। ছাত্রআন্দোলন বা রাজনীতি যাই বলা যাক না কেন, কথোপকথন থেকে মৌলিক যে বিষয়গুলি উদ্ধৃত হয়েছে যা মূল ঘটনার উপর একপ্রকার স্বচ্ছতা এনেছে তাকে একনজরে সাজিয়ে দেওয়া যায়।

(ক) জীবনের চেয়ে রাজনীতি বড় নয় ; (খ) অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ ; (গ) গণতান্ত্রিক পরিবেশ, শিক্ষার পরিবেশ ও ছাত্রদের মধ্যকার সম্পর্কে ফাটল ; (ঘ) ছাত্রআন্দোলনে দুর্বৃত্তায়নের চেষ্টা। এই ঘটনা এক বিপজ্জনক ব্যতিক্রম।

তাহলে সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করা, সাদামাটা, মেধাবী একটি ছেলের মৃত্যু রাজ্যের শিক্ষাজগৎকে বেশ খানিকটা নাড়া দিয়ে গেল সন্দেহ নেই। ছাত্রআন্দোলনে দুর্বৃত্তায়নের কথাটি মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ব্যবহার করে একটি সত্যের দিকেই আমাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠতেই পারে এই দুর্বৃত্তায়নের উৎস কী ? কোথায় বা কারা ? বিশেষত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যেখানে মেধার চাষ ও তাকে গোলায় তোলায় ব্যস্ত থাকে ছাত্র/ছাত্রী, অধ্যাপক/ অধ্যাপিকারা। সেখানে এই উন্নত মেধার অবমূল্যায়ন কেন ? এটা অস্বীকার করার উপায় নেই এইজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বয়স (mental age) স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক গুণ বেশি। তাহলে এ অপচয় কেন ? মেধার অপচয়, মূল্যবোধের অবক্ষয় কেন ? উন্নত মেধা থাকলে মতের ভিন্নতা থাকবে। থাকাটাই স্বাভাবিক। সবকিছুকে বাজিয়ে নেবার প্রবণতা থাকবে। সেটাই সহজাত। কিন্তু তার পাশে মদ কেন ? রড নিয়ে গুণ্ডাবাজি কেন ? হকি স্টিক নিয়ে হস্টেল থেকে হস্টেলের একতলা থেকে দোতলায় এ হত্যা, রক্ত-রক্ত খেলা (!) কেন ? কেন অঙ্ক নিয়ে দৌড়াদৌড়ি নয় ? কেন গল্প লিখে, কবিতা লিখে একে ওকে দেখানোর জন্য ছোটাছুটি নয় ? কেন হস্টেলের 'মেধাকক্ষ'গুলো ডিবেটের ক্লাশরুম নয় ? তাহলে কাদের নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখব। কারা আমাদের সামনে তুলে ধরবে উন্নত মানসিকতা ও মানবিকতার ধ্বজা। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় সদ্যগোঁফের রেখা ওঠা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতা পড়ে যাওয়া কিংবা পদার্থবিদ্যার সাম্যবস্থার শর্ত (condition of equillibrium) ধাতস্থ করে যাওয়া ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে এই অসহিষ্ণুতা অধ্যস্থ করে কিংবা অনুষ্নতা অধ্যয়ন করে ? আজ 'গ্লোবাল ভিলেজ' (global village) যেমন এসেছে তেমনই এসেছে অনুবীক্ষণিক পরিবার (molecular family)-এর বাস্তবায়ন। 'ফের্মিয়ন' (যে কণা একা থাকতে ভালোবাসে)-দের আবির্ভাব একটি বিস্ময়কর জায়গায় চলে যাচ্ছে। একা থাকতে থাকতে একটি নিঃসঙ্গতার জন্ম হচ্ছে তার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় জীবনে পরিবার ও বিদ্যালয়ের মধ্যে যে অনুশাসনের মধ্যে সে বড় হয়ে উঠেছে। বিশেষত পরিবারে অত্যধিক চাপ ও শাসনের মধ্যে যে ইচ্ছাগুলো অদম্য থেকে আপাত ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে একটি অতিমুক্ত পরিবেশে, সর্ববাধাবন্ধনহীন পলকা জীবনের আহ্বানে একপ্রকার স্বেচ্ছাচারিতায় মত্ত হয় সে। তখন তারা বন্ধু না থেকে হয়ে যায় প্রতিদ্বন্দ্বী। নির্বান্ধব স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। অথচ কী দুর্ভাগ্য আমাদের, সৌমিকদের হত্যাকারীরাই পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কিংবা চিকিৎসা জগতের শরীর ও মনের কিংবা বিজ্ঞানের এক একজন মহান কারিগর হয়ে গড়ে ওঠে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ নিঙড়ানো অর্থে ভোগবাদের উত্তুঙ্গ শিখরে অবস্থান করে। এটি একটি অন্ধকার অধ্যায়। আলোকিত অধ্যায় হলো এর বাইরেও এক বড় অংশের ছাত্র/ ছাত্রীরা থাকে। যারা পরিশীলিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তগুলোকে নিবিড় অনুশীলন করতে করতে বড় হয়। তাদের মধ্যে একটি দায়বদ্ধতার অনুবন্ধী অনুমতি জন্ম নেয়। যা জীবনের সমান্তরালে, অভিমুখে কম্পিত হয়। যারা নিজেদের অভিজ্ঞতাকে কাজে

লাগিয়ে কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠন করে, তাদের কাছে ছাত্ররাজনীতি সর্বাপেক্ষা মহৎ একটি নীতিপর্যায়ের অধ্যয়ন। আগামীর স্পন্দন ধ্বনিত হয় তাদের পাঠগ্রহণের খাঁজে খাঁজে। তারা ছাত্ররাজনীতিতে দুর্বৃত্তদের প্রবেশাধিকার দেয় না। নিজেরা রক্তাক্ত হয়ে বুক আগলে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন করে। জীবনবলি রোধ করে অগ্রসর হয় সেই মহান কর্মে। হ্যাঁ একথা সত্যি। জীবন অপেক্ষা রাজনীতি বড় নয়। কিন্তু ক্ষমতা দখলের অলিন্দে নিজেদের অসুস্থ মানসিকতাকে কেউ বা কারা যদি সুস্থ বলে চালাতে যায় সেখানে তখন আর যাই থাক্ শিক্ষা থাকে না। সেখানে অসুস্থ প্রতিযোগিতা দানা পায়। আর তাদের হাত ধরে প্রবেশাধিকার পায় দুর্বৃত্তায়ন। ঐতিহ্যসন্ধানী, বৈপ্লবিক রাজ্যের শিক্ষাচিত্রে যেটি মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। এবং তা অবশ্যই বিপজ্জনক। রাজ্যের প্রশংসিত ছাত্রআন্দোলনে কালিমালিপ্ত এ এক ন্যক্কারজনক অধ্যায়। একদল/পক্ষ অন্য একদল/পক্ষের শিকার। কেন এ গুণ্ডামির প্রতিফলন রাজ্যের ছাত্রসংগঠনগুলিতে। তাকে রোধ করার দায়িত্ব কার! কেন এ প্রশ্ন উঠবে — মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে, 'ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত নয়'। তাহলে কারা করবে? হ্যাঁ, রাজনীতির অভিমুখ নিয়ে আলোচনা/সমালোচনা চলতেই পারে। চলুক। তাতে মঙ্গলসূত্র গ্রথিত আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তমতে, বিশুদ্ধবাদীরা যদি এই মত পোষণ করেন যে, 'গোপাল অতি সুবোধ বালক'। সে শুধু নিজের উন্নতির জন্য 'আমি' চিন্তায় মগ্ন থেকে সকলকে ডিঙিয়ে 'হাইব্রিড' একটি অসামাজিক অভেদে পরিণত হবে তাহলে আগামীর সমাজবদলের ইঙ্গিত কাদের মধ্যে পাওয়া যাবে! কেরিয়ার-সর্বস্বতাকে বিসর্জন দিয়ে কারা সুভাষচন্দ্রের 'তরুণের স্বপ্ন' হবে। সুতরাং এটি একটি প্রমাণিত মিথ্যা যে, ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত নয়। বা রাজনীতি থেকে বিরত থাকা উচিত।

রাজ্যের সর্ববৃহৎ দায়িত্বপূর্ণ ছাত্রসংগঠন এস এফ আই সন্দেহ নেই। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নভাবে তারা তাদের দায়বদ্ধতার প্রমাণ দিয়েছে। রাজ্যের বাম আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে স্বাভাবিকভাবে এই সংগঠন গড়ে ওঠার পেছনে একটি ধ্রুব ইতিহাস রয়েছে। যার গড়ে ওঠার সঙ্গে রাজ্যের অনেক বিশিষ্টদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত। এস এফ আই রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষে একটি তথ্যের প্রতি আমাদের নজর স্বাভাবিকভাবে চলে যায়। এখন সারা রাজ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে ৩৪৯টি স্থানে তাদের সংগঠন রয়েছে। মাত্র ৭৭টি জায়গায় বিরোধীরা রয়েছে। সুতরাং সর্ববৃহৎ সংগঠন হিসাবে, সবচেয়ে বেশি জায়গায় আসীন থাকার সুবাদে সর্ববৃহৎ দায়িত্ব তাদেরই থেকে যায়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠন গড়ার পাশাপাশি দায়িত্ববোধের অনন্যনজির তাঁরাই স্থাপন করতে পারেন। কী করলেন তাঁরা? সৌমিকের মৃত্যুর পর রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে কী বার্তা নিয়ে গেলেন তাঁরা?

১. কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সংগঠিত মিছিল সংগঠিত করলেন যাতে যোগ দিয়েছেন অনেক প্রাক্তনী।
২. তদন্তের আহ্বান। তাতে সৌমিকের মৃত্যুর সঙ্গে তদন্ত হবে বি ই কলেজের এস এফ আই সংগঠনের সাম্প্রতিক অবস্থা।
৩. কলেজ ক্যাম্পাসগুলির সাম্প্রতিক পরিবেশ বদলের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করার প্রস্তাব।
৪. অবক্ষয়, মূল্যবোধহীন মানসিকতা ও অপসংস্কৃতি যেভাবে গ্রাস করছে ক্যাম্পাসগুলিতে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচি।
৫. ক্রীড়া, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সুস্থ আচরণবিধির পক্ষে আন্দোলন কর্মসূচি।
৬. ইভটিজিং, র‍্যাগিং, আত্মহত্যা, পরীক্ষায় নকল করার মানসিকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে লাগাতার কর্মসূচি গ্রহণ।
৭. নিজেদের (এস এফ আই) আরো বেশি সংগঠিত হওয়ার জন্য শিক্ষাশিবির সংগঠিত করা।
৮. অরাজনৈতিক (!) নামধারী সংগঠনের আড়ালে আদর্শহীন দলগুলিকে বিশেষত তাদের মূল্যবোধহীন রাজনীতিকে চিনিয়ে দেবার কর্মসূচি গ্রহণ।

এ প্রসঙ্গে একটি 'রিপোর্তাজ'-এর সামান্য অংশ তুলে দেওয়া যেতে পারে।

'এ সবের জন্য মূলত দায়ী আদর্শহীনতা, রাজনীতিহীনতা। অরাজনীতির মুখোশ পরে অশুভ শক্তি কলেজগুলিতে সুযোগ নিচ্ছে। নিরপেক্ষতার মিথ্যে বাতাবরণ তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করছে। বাম রাজনীতির বিরোধিতা করছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমদানি করছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।....এদের কোনও নীতি নেই, দায়বদ্ধতা নেই। নতুন নতুন চেহারায় ওরা আসছে' (আজকাল)।

একটি সঙ্গত প্রশ্ন উঠেছে 'সঠিক ছাত্র আন্দোলন' নিয়ে এই যে অরাজনৈতিক ধ্বজাধারী সংগঠন আই সি (Independent Consolidation) যাদের অবিমৃষ্যকারীতায়

ঝরে গেল একটি প্রাণ। যাদের ভুল রাজনীতির শিকার কলেজের আরও অনেক ছাত্রছাত্রী। কিন্তু কীসের নিরপেক্ষতা? বর্তমান সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে নিরপেক্ষ থাকা যায় কি? কারও পক্ষে কি তা সম্ভব। নাকি এ শুধু ছায়ার সঙ্গে ছায়ার লুকোচুরি খেলা। আর consolidation? যার একগণ্ডা আভিধানিক অর্থ বলে দেওয়া যায়। একীভূত করা, সংহত করা, একত্রিত করা, ঐক্যসাধন করা। এক কথায় ঃ একীকরণ, একীভবন, সমন্বয়সাধন, দৃঢ়ীকরণ, দৃঢ়ীভবন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কীসের একীকরণ? বা কীসের দৃঢ়ীকরণ? মতের না মতানৈক্যের। সত্য না অসত্যের। সুস্থতার না অসুস্থতার তা বুঝে ওঠার আগেই সৌমিকদের চলে যেতে হলো। এর সান্ত্বনা বোধহয় সেই শপথের মধ্যদিয়েই পূর্ণতা পেতে পারে। আগামীদিনে আর কোনও সৌমিককে আমরা মরতে দেব না। তার ফুসফুসে দেব সুস্থ প্রাণবায়ু। যা দিয়ে জীবন আর জীবিকা বেঁচে থাকবে। বেঁচে থাকবে সুস্থ প্রজন্ম। তবুও একটি বিচ্ছিন্নতা, আত্মকেন্দ্রিকতা যতদিন থাকছে, যতদিন মেধার অত্যাচার থাকছে, ততদিন এই অসুস্থতা দূরীকরণের প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকবে। যদি নিম্নব্যবস্থাগুলি ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করা যায় তাহলে হয়ত কিছুটা অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে ঃ

ক. কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের নামে হঠকারিতা বন্ধ করা।

খ. নিয়মিত পরামর্শদান/মতের আদানপ্রদান।

গ. ছাত্র-অধ্যাপক সমিতি গঠন। পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সমস্যা উত্তরণের চেষ্টা।

ঘ. অভিভাবকদের নিয়মিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ।

ঙ. সচেতনতা/মানসিক উন্মেষ/শিক্ষাশিবির প্রতিষ্ঠানের নিজ উদ্যোগে সংগঠিত করা।

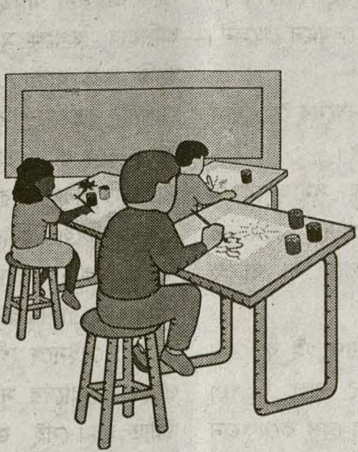
চ. রাজনৈতিক পরিচিতি যাই থাক, পরস্পরের বন্ধুত্বমূলক সম্পর্কের অবস্থান উন্নত করার প্রচেষ্টা।

ছ. শুধুমাত্র পরীক্ষা নয়। পঠন দিবস বাড়িয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা।

জ. কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের আগে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার ব্যবস্থা করা।

এ ধরনের আরও কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। সর্বোপরি সমাজের সর্বস্তরের দলমত নির্বিশেষে সকলের এগিয়ে আসা দরকার এই আত্মঘাতী পরিবেশ থেকে আমাদের প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য। যদি এ একপ্রকার সোনার পাথর বাটি হয়ে যায় তবুও উদ্যোগটা অব্যাহত থাকুক। কারণ হত্যা, রক্তপাতের মধ্যদিয়ে আর যাই হোক আগামীর কোনো আলোর ঠিকানা থাকে না। যারা ভাবেন 'অন্ধকার আছি। অন্ধকার হব। অন্ধকার থাকব' তাঁরা আপাতত কৈবল্যবাদীদের মতো 'আদর্শশূন্য' নিয়ে বেঁচে থাকুন। কিংবা যারা বলেন প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি কেন? তাঁদের কাছে বোধহয় 'রাজনীতি' নামক বহু ব্যবহৃত শব্দটি শুধুমাত্র যথেচ্ছাচারের ইঙ্গিতবহ। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির অন্য সংজ্ঞাও যে বানানো যায় তা দেখিয়ে দিক আমাদের শিক্ষাসত্রগুলো। যেখানে Donna L. Clovis-এর সেই কবিতা সত্য হয়ে উঠবে —

'Teach me to walk and I shall run
Teach me to look and I shall see
Teach me to hear and I shall listen
Teach me to sing and I shall rejoice.'



প্রকাশের ৭৫বছর পরেও কেন 'রাশিয়ার চিঠি'র আলোচনা জরুরি

সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষক, পানাগড় বাজার উচ্চবিদ্যালয়, বর্ধমান

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া গিয়েছিলেন ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৩০-এর ১১ সেপ্টেম্বর তিনি রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় নামেন। আর সেখানকার অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি তিনি পত্রাকারে লিখে জানান পুত্র সহ বিভিন্ন গুণীজনকে। সেইসব চিঠি বিভিন্ন শিরোনামায় প্রকাশ পেয়েছিল 'প্রবাসী'র নানা সংখ্যায়। এর কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বভারতী থেকে 'রাশিয়ার চিঠি' নামে সেইসমস্ত চিঠি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। প্রকাশকাল ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ। তারিখ ৮মে। বাংলা ২৫শে বৈশাখ,১৩৩৮বঙ্গাব্দ। আজ ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ। 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশের ৭৫ বছর অতিক্রান্ত। আমরা সেই প্রসঙ্গেই আলোচনা করবো। আর সেই সূত্রেই আসবে এই আলোচনার প্রাসঙ্গিকতার দিকটিও।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া পৌছালেন ১৯৩০-এ। কবির বয়স তখন ৭০ বছর। বয়সের স্বাভাবিক নিয়মেই শরীর তখন ধকল সইবার অনুপযোগী। তাসত্ত্বেও তিনি সেখানে গেলেন। কিন্তু কেন এই আগ্রহ? মূলত দুটি কারণ—

১. 'ভক্স' (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সংস্থা)-এর অনুরোধ।

২. নিজের সাধনার প্রকাশ রাশিয়ার সমাজব্যবস্থায় প্রতিভাত হওয়ার খবর 'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য সূত্র থেকে পেয়ে তা স্বচক্ষে দেখার আকুলতা।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, 'ভক্স' হঠাৎ রবীন্দ্রনাথকেই বা কেন অনুরোধ জানাতে গেলেন? তার উত্তরে বলি : শুধু রবীন্দ্রনাথকেই নয়, 'ভক্স' সেইসময় বিশ্বের বেশ কয়েকজন প্রথম সারির স্বাধীন চিন্তাশীল মানুষকে রাশিয়ায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমন্ত্রণ জানানোর কারণটিও ছিল গভীর। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবের মধ্যদিয়ে রাশিয়ায় যা হয়েছিল তা তো শুধু জার শাসনের অবসান নয়, গোটা সমাজব্যবস্থার বদল। যে বদলের মূলে ছিল মার্কস, এঙ্গেলস উদ্ভাবিত একটি তত্ত্ব। সেই তত্ত্ব বা মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচবার আদর্শ লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বে রাশিয়াবাসীকে দীর্ঘদিনের দাসত্বের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে শক্তি জুগিয়েছিল। আর তাতেই ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তারা তাই উঠেপড়ে লেগেছিল মার্কস-এঙ্গেলসের সেই তত্ত্বকে রাশিয়ার মাটিতেই কবর দিতে। কিন্তু তা যখন সম্ভব হলো না, তখন শুরু হলো বাকি দুনিয়াতে সেই মতাদর্শের প্রভাব যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তারজন্য ব্যবস্থাগ্রহণ। বুদ্ধিজীবীরা যাতে কোনোভাবেই রাশিয়ার স্বপক্ষে মুখ না খোলেন তারজন্য কড়া সতর্কতা জারি করা হলো। এইরকম পরিস্থিতিতে অনিবার্যভাবেই রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি তথা প্রকৃত সত্য বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরার তাগিদেই 'ভক্স' গোটা বিশ্বের কয়েকজন মহান চিন্তাবিদ্‌কে রাশিয়ায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যাঁদের অন্যতম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানোর আরও একটি কারণ হলো ১৯১৩-এ নোবেলপ্রাপ্তির সূত্রে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার মানুষের কাছে অত্যন্ত পরিচিত হয়ে ওঠেন। সেইসঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র রুশ অনুবাদ এবং অন্যান্য গ্রন্থের অনুবাদের সূত্রেও তাঁর সেই পরিচিতি জনপ্রিয়তাই উন্নীত হয়। সেই জনপ্রিয়তাও তাঁকে সেখানে যাবার ডাক দিয়েছিল।

এখানে বলা দরকার, রাশিয়া যাবার ডাক কবির কাছে প্রথম এসেছিল ১৯২৫-এ। ওই বছর USSR Academy of Science-এর দুশো বছর পূর্তি উৎসবে যোগ দেবার জন্য সেখান থেকে কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার কারণে সেইবার কবির পক্ষে আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ১৯২৬। কবি তখন জার্মানিতে আছেন। সেইসময় সোভিয়েত শিক্ষাসচিব লুনাচারস্কি 'ভক্স'-এর মাধ্যমে কবিকে রাশিয়া ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানালেন। সেই আমন্ত্রণেও কবির পক্ষে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি ওই একই কারণেই। আবার আমন্ত্রণ এলো ১৯২৭-এ। ১৯২৮-এ টলস্টয়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কবিকে রাশিয়া থেকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। ১৯৩০-এও এল আহ্বান। অবশেষে হিবার্ট বক্তৃতা দিতে ১৯৩০-এ কবি যখন লন্ডনে এলেন, তখন সেখান থেকে ইউরোপের নানা শহর ঘুরতে ঘুরতে জার্মানি থেকে ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বরে তিনি রাশিয়ায় এলেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই 'অবশেষে রাশিয়া আসা গেল'। কবির সঙ্গে ছিলেন মার্কিন চিকিৎসক-বন্ধু হ্যারি টিম্বার্স, আইনস্টাইনের কন্যা মার্গারিটা, তামিলভাষী আশ্রমবন্ধু সচিব আরিয়াম উইলিয়ামস, কবি অমিয় চক্রবর্তী এবং পৌত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সঙ্গীদের সঙ্গে রাশিয়ায় পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন সেখানে শুধু জার শাসনের অবসান-ই হয়েছে তাই নয়, এতোকালের অবহেলিত দাসত্বের দলও আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। 'আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে' সত্য হয়েছে রাশিয়ায়। মুছে গেছে বর্ণবৈষম্য, বিদায় নিয়েছে ক্ষুধা, অনাহার, বেকারি। সমগ্র দেশজুড়ে শুরু হয়েছে বিরাট এক কর্মযজ্ঞ। সেই আনন্দযজ্ঞে ডাক পড়েছে সর্বস্তরের মানুষের। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য থেকে শুরু করে শিক্ষা, সমবায়, ভিলেজ কমিউন—সর্বক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মুক্তির আনন্দে সেখানকার মানুষ গান গেয়ে নতুন এক সমাজজীবনের দ্বার খুলে দিয়েছেন। যে সমাজজীবনে দারিদ্র্য নেই, বৈষম্য নেই, নেই নিরক্ষরতার অভিশাপ কিংবা বেকারের হতাশা। আছে শুধু প্রাণের সঙ্গে প্রাণের, মনের সঙ্গে মনের, আত্মার সঙ্গে আত্মার ঝুলন খেলা। আর সেই রাশিয়াকে দেখে কবির উপলব্ধি ঃ 'রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।' (৩নং চিঠি) শুধু তাই নয়, ওই চিঠিতেই তিনি আরও লিখলেন ঃ 'আমার বয়সে আমার মতো শরীর নিয়ে রাশিয়ায় ভ্রমণ দুঃসাহসিকতা। কিন্তু পৃথিবীতে যেখানে সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হত।' কী সেই 'ঐতিহাসিক যজ্ঞ', জানতে হলে পড়তেই হবে তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'। আমরা খুব সংক্ষেপে তার পরিচয় নেবার চেষ্টা করবো।

আমরা জানি বিপ্লব-পরবর্তী রাশিয়ার শিক্ষা এবং কৃষি রবীন্দ্রনাথকে বেশি করে উচ্ছ্বসিত করেছিল। শিক্ষা প্রসঙ্গে তৃতীয় চিঠিতে প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশকে তিনি লিখেছেন ঃ 'যখন শুনলুম রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে, তখন মনে মনে ঠিক করলুম, ভাঙা শরীর আরো যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে অশক্তকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা— অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই 'পরে নির্ভর করে।'

আর ষষ্ঠ চিঠিতে লিখলেন ঃ 'রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত , যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরুক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়েছিল আজ তারা সমাজের অন্ধ কুঠুরী থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে, তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এককালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়।'

ওই চিঠিতেই তিনি আরও লিখলেন ঃ 'এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেছে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখেনি। এরা পাস করবার কিংবা পন্ডিত করবার জন্যে শেখায় না—সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায়।' রাশিয়ার Society for Cultural Relations-এর সভাপতি অধ্যাপক পেত্রভ-ও একইভাবে জানিয়েছেন, গ্রামের কৃষকদের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা, তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলাই ছিল তাদের শিক্ষার হাতিয়ার। রাশিয়ার এই শিক্ষাব্যবস্থা

দেখে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতার আক্ষেপ ঃ 'আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশজুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তাহলে ভারি উপকার হত। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি কী হয়েছে আর কী হতে পারত।'

শিক্ষার পর কৃষি প্রসঙ্গে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি হলেও যাঁরা 'মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে' তাদের কথা তিনি চিরকালই ভেবে এসেছেন। তাই রাশিয়াতে গিয়ে সেখানকার 'চাষীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির' চেষ্টা দেখে তিনি হয়েছেন অভিভূত। পঞ্চম চিঠিতে তাই তিনি লিখলেনঃ 'সেদিন মস্কৌ কৃষি-আবাসে গিয়ে স্পষ্ট করে স্বচক্ষে দেখতে পেলুম, দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষীরা ভারতবর্ষের চাষীদের কত বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে।...... চাষের উন্নতির জন্য সমস্ত দেশজুড়ে যে প্রভূত উদ্যম সেও অসাধারণ। ভারতবর্ষেরই মতো এ-দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এই জন্যে কৃষিবিদ্যাকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে দিতে না পারলে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায় না। এরা সে-কথা ভোলেনি। এরা অতি দুঃসাধ্য সাধন করতে প্রবৃত্ত।' তিনি ওই চিঠিতেই আরও লিখলেন ঃ 'এই দশ বছরের মধ্যে এদের কৃষিচর্চাবিভাগের যে উন্নতি ঘটেছে, তার খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে জগতের বৈজ্ঞানিক মহলে।' রবীন্দ্রনাথ সেখানকার কৃষকদের কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে যৌথ খামার ও সমবেত প্রণালীতে কৃষিকর্ম বিষয়ে খোঁজখবর নেন। যৌথ খামারে মেয়েদের অংশগ্রহণের কথাও তিনি জানতে পারেন। যৌথ খামারী মেয়েদের বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করে এবং পুরুষ সঙ্গীদের সঙ্গে তাদেরও সমান মর্যাদা দিতে গিয়েই সেখানকার প্রত্যেক যৌথ খামারে একটি করে শিশুপালনাগার, কিন্ডারগার্টেন আর সাধারণ পাকশালা তৈরি করা হয়েছে। কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার, শ্রমিকের উপযুক্ত পারিশ্রমিক এবং প্রত্যহ আট ঘন্টা করে পরিশ্রমের পর প্রত্যেক পঞ্চম দিনে ছুটির ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলিও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এখানে বলা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ শুধু সোভিয়েত ব্যবস্থার ভালোর দিকটিই তুলে ধরেছেন তা-ই নয়, তাঁর দৃষ্টিতে যা মন্দ লেগেছে তাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন 'রাশিয়ার চিঠি'তে। যেমন সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থার ফলশ্রুতির প্রশংসা করলেও শিক্ষাবিধি প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য ঃ 'শিক্ষাবিধি দিয়ে এঁরা ছাঁচ বানিয়েছে কিন্তু ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না।' একইভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা, বিপ্লবের রক্তাক্ত পথ ইত্যাদি বিষয়েও তিনি তাঁর আপত্তির কথা তুলে ধরেছেন। মার্কসবাদীরা যেখানে মনে করেন সমাজকাঠামোর বদল হলে তবেই শিক্ষার দ্রুত বিস্তার সম্ভব, সেক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের মত ভিন্ন। তাঁর মতে, শিক্ষার বিস্তার ঘটলে শৃঙ্খল আপনা থেকেই খসে পড়বে।

এইসব বিরুদ্ধমতের জন্য কেউ কেউ তাঁকে সাম্যবাদ-বিরোধী হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন, যা ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের এক বছর আগে বার্ণার্ডশ রাশিয়ায় গিয়ে সেখানকার সমাজব্যবস্থার বিরোধিতা করেছিলেন তাঁর 'ইনটেলিজেন্ট উওম্যানস্ গাইড টু সোশ্যালিজম এ্যান্ড ক্যাপিটালিজম' গ্রন্থে। আবার রবীন্দ্রনাথের ছ'বছর বাদে প্রখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ, যিনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হিসাবে অতিপরিচিত, আমন্ত্রিত হয়ে দশ সপ্তাহ রাশিয়ায় কাটিয়ে এসে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক 'রিটার্ণ ফ্রম ইউ এস এস আর' গ্রন্থে রাশিয়ার সমালোচনাই করেন। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রথাসিদ্ধ সংজ্ঞায় সমাজতন্ত্রী না হয়েও রাশিয়ার সমাজ-পরিবর্তনের মহাযজ্ঞ দেখে তাকে তিনি 'তীর্থদর্শন' বলতে দ্বিধা করেননি। শুধু তাই নয়, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমাজব্যবস্থা, সেখানকার মনুষ্যত্বের মর্যাদা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার প্রত্যাশাও করেছিলেন তিনি। তাই নিজের বাংলা চিঠিগুলির ইংরেজি অনুবাদের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কবির ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে অনেক চিঠিই অনূদিত হয়ে 'দা মডার্ণ রিভিউ'তে বেরিয়েছিল। কবি নিজেও দু-একটি চিঠি অনুবাদ করেছিলেন। ইংরেজি মাধ্যমে বৃহত্তর পাঠকের নজরে আসায় ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কোপানলে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। মার্কিনিরা রবীন্দ্রনাথকে সোভিয়েতের প্রচারক হিসেবে সমালোচনা করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনার শিকার যাঁরা, সেইসব সাধারণ মানুষের পক্ষেই থেকেছেন। 'রাশিয়ার চিঠি' এবং তারও আগে 'রক্তকরবী'তে তো সেটা অভিব্যক্ত হয়েইছে ; অন্যত্রও তার নজির খুব কম নয়। ফলত, যথা অর্থে 'সমাজতন্ত্রী' না হয়েও যেখানে এসে তিনি পৌঁছেছেন সমাজতন্ত্রীদের ভাবনার জগৎ সেখান থেকে খুব একটা দূরবর্তী নয় কিন্তু।

এবার মূল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পালা। কেন প্রকাশের

৭৫ বছর পরেও 'রাশিয়ার চিঠি' প্রসঙ্গে আলোচনা এত জরুরি? এর উত্তরে বলি, আজকের যুগ ভোগবাদের যুগ, অবক্ষয়িত মূল্যবোধের যুগ, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার যুগ। আজকের শিশু ছোটো থেকেই শুনতে শুনতে বড়ো হচ্ছে ঃ 'অল্পেতে স্বাদ মেটে না, এ স্বাদের ভাগ হবে না।' অর্থাৎ আরও চাই এবং আমার একার চাই। এমন আবহাওয়ায় বড়ো হয়ে কে-ই বা ভাবতে পারে সেইসব মানুষদের কথা, যাঁরা 'সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে— উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।' ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পৃথিবীর আর কোন মানবতাবাদী সাহিত্যিক বঞ্চিত-শোষিত মানুষদের দুর্দশার এমন নিখুঁত চিত্র আঁকতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। আর তাই তাঁর এই ভাবনা আজকের দিনে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজনেই এই আলোচনা।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ চতুর্থ চিঠিতে লিখেছেন ঃ 'সকল সাম্রাজ্যিক দেশেরই অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবনের চাষ অন্নের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে।' আজকের এই মার্কিনি আগ্রাসনের কালে দাঁড়িয়ে, বিশ্বব্যাপী শান্তি ও সুস্থিতিকে নষ্ট করার চক্রান্তের সাক্ষী হয়ে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা অত্যন্ত জীবন্ত বলেই মনে হয়। তাই আজকে যারা 'স্বাধীনতা', 'গণতন্ত্র' ইত্যাদি শব্দের আড়ালে বিশ্বকে তাদের ভারী ও কাঁটাওয়ালা বুটের তলায় পিষ্ট করতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে দুনিয়াজোড়া প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই এমন আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

তৃতীয়ত, ওই চতুর্থ চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ 'যাদের আমরা অন্ধকারে দেখতেই পাইনে, তাদের জন্যে যে কিছু করা যেতে পারে, এ-কথা স্পষ্ট করে মনে আসে না।' রবীন্দ্রনাথের এই কথা আজও সমান সত্য। তাই সর্বশিক্ষা অভিযান বা স্কুল চলো কর্মসূচি নিয়েও আমরা আজ পর্যন্ত প্রতি ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে পারলাম না। সেদিক থেকেও এমন আলোচনার দরকার আছে।

চতুর্থত, রাশিয়াতে একসময় শিক্ষাখাতে ব্যয় হত বাজেটের ১৫ শতাংশ। অথচ আমাদের দেশে দীর্ঘদিনের দাবি সত্ত্বেও শিক্ষাখাতে বাজেটের ১০ শতাংশও ব্যয় করা হয় না। মাত্র ২ থেকে ৩ শতাংশ এতদিন ধরে ধার্য হয়ে আসছিল। বর্তমান আর্থিক বছরে (২০০৬-২০০৭) তা সামান্য বেড়ে হয়েছে ৪.৩ শতাংশ। শিক্ষাপ্রসারে এই ধরনের সরকারি উদাসীনতার প্রতিবাদ জানাতেও এই আলোচনা জরুরি।

সবশেষে তাই বলি, রবীন্দ্রনাথের তীর্থভূমির যাবতীয় ভালোকে আহরণ করে আমাদের ভারতবর্ষকে 'সব পেয়েছির দেশ' হিসেবে গড়ে তুলতেই হবে। রবীন্দ্রভাবনার বিস্তারে, বিশ্বময় শান্তির বারিবর্ষণে, সার্বিক শিক্ষার ছোঁয়ায়, শিক্ষার প্রসারে সরকারি সদিচ্ছায় বাস্তবায়নে সেই লক্ষ্যের পথে যাত্রার শুভসূচনা হোক এই আলোচনার মধ্যদিয়েই।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও চম্পা

নারায়ণচন্দ্র বসুনীয়া

সহ-শিক্ষক, খয়েরতলা নুরপুর উচ্চবিদ্যালয়, মালদহ

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার মধ্যগগনে বাংলা কবিতার জগতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মপ্রকাশ 'সবিতা' কাব্য দিয়ে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। যদিও 'বেণু ও বীণা'র কয়েকটি কবিতা আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। কবি সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী, মাতুলালয়ে। পিতা রজনীনাথ দত্ত ও মাতা মহামায়া দেবী। পিতামহ গদ্যলেখক অক্ষয় কুমার দত্ত এবং মাতামহ রামদাস মিত্র। সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতার সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তী কালে বি এ পড়ার সময়ে কনকুলতা দেবীর সঙ্গে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। তবে তিনি বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। মামা কালীচরণ মিত্রের ব্যবসায়ে কিছু দিনের জন্য যোগ দেন, তবে সেখান থেকে বেড়িয়ে নিজের জায়গায় তথা সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন ও পথ চলতে থাকেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বেশিদিন পৃথিবীতে থাকতে পারেননি, ১৯২২ সালে মাত্র ৪০ বছর বয়সে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। তবে স্বল্পকালের কবিজীবন ও সাহিত্য সৃষ্টি যা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনায় মধ্যে রয়েছে বহু কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও নিবন্ধ। কাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সবিতা (১৯০০), সন্ধিক্ষণ (১৯০৫), বেণু ও বীণা (১৯০৬), তীর্থরেণু (১৯১০), ফুলের ফসল (১৯১১), তুলির লিখন (১৯১৪) প্রভৃতি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্বভাবকবি হলেও যাঁদের সাহচর্য সহযোগিতা তাঁকে কবি করে তুলেছিল তাঁরা হলেন— সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রবীন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায়, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিপ্রতিভা আলোচনা করলে অতি অবশ্যই 'ফুলের ফসল' কাব্যগ্রন্থটির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হয়। 'ফুলের ফসল' কাব্যগ্রন্থের একটি বিশেষ কবিতা 'চম্পা'। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের 'বাংলা সহায়ক পাঠ' গ্রন্থে 'চম্পা' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'বাংলা সহায়ক পাঠ' বইয়ের ভূমিকায় পর্ষদ সভাপতি লিখেছেন—"বাংলা সহায়ক পাঠ-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিমূলক ধারার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে তাদের মধ্যে আধুনিক সমাজচেতনার সঞ্চার এবং সৃষ্টিশীল রসবোধ ও কল্পনাশক্তির উজ্জীবন।" সভাপতির বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলা যায় 'চম্পা' কবিতার অন্তর্ভুক্তির কারণ বর্তমান আর্থ-সামাজিক পটভূমিকা।

ফুলকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, দেবেন্দ্রনাথ সেন সহ বহু কবি কবিতা লিখেছেন। তাঁরা ফুলের সুন্দর, কোমল, মোহময় দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তবে সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা'ই প্রথম বাংলা ভাষায় লেখা পুষ্পকেন্দ্রিক কবিতার মধ্যে প্রথম বিদ্রোহী কবিতা। কবি সত্যেন্দ্রনাথের 'ফুলের ফসল' কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। এ কাব্যের 'চম্পা' একটি বিশেষ কবিতা। কবির প্রকৃতিচেতনার একটি বিশেষ দিক ফুটে উঠেছে এই কবিতায়। প্রকৃতিকে এখানে নিছক সুকোমল দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেননি এবং তার রুদ্ররূপকে আলোচ্য কবিতায় শিল্পরূপ দান করেছেন।

বাংলার প্রকৃতিতে যে ছয় ঋতুর সমাগম, তারমধ্যে গ্রীষ্ম ঋতু নিষ্ঠুর, উত্তপ্ত ও নির্মম। গ্রীষ্ম ঋতু তার ক্ষমতার বলে সমগ্র জগৎকে দগ্ধ করে। গ্রীষ্ম ঋতুর এই নিষ্ঠুর ক্ষমতার কাছে বর্ষা, শরৎ ও বসন্তের ফুলরা ফুটে ওঠার ক্ষমতা পায় না অথচ গ্রীষ্মের এই নির্মম দাহের মধ্যে 'চম্পা' এক বিদ্রোহী পুষ্প, যা বর্তমানকালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন কুসংস্কার ও নির্যাতনের বিদ্রোহিনী নারীর প্রতিভূ। চম্পা

নামটির আপাত কোমলতা থাকলেও তার তেজস্বিতা, সৎ বুদ্ধিমতি নারীদের স্মরণ করে দেয়। সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা'র মধ্যে আমরা এক আত্মসচেতন প্রতিবাদী বিদ্রোহিনী নারীকে দেখতে পাই। বসন্তের কোমলতা যখন পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হচ্ছে, গ্রীষ্মের পদাঘাতে পৃথিবী জর্জরিত ঠিক সেই সময়ে স্বমহিমায় আবির্ভাব 'চম্পা'র। চারপাশের অনুকূল আবহাওয়া, সরসতা, বৃষ্টির স্নিগ্ধতা সে পায় না তথাপি অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে গ্রীষ্মের কঠোর উত্তাপ, নিষ্ঠুরতাকে আপন অঙ্গে সৌরভে রূপান্তরিত করে। গ্রীষ্মের নিরস প্রভা নিজের মধ্যে নিয়ে চারিদিককে রঙিন করে তোলে। কবিতার প্রথম স্তবকে কবি 'চম্পা'কে সাহসিকা অপ্সরার সঙ্গে তুলনা করেছেন। চম্পা যেন মর্ত্যলোকের এক সাধারণ নারী, সে হয়ে উঠে অসাধারণ বিদ্রোহিনী। এই তুলনা সর্বকালের সব সমাজের নির্যাতিতা বিদ্রোহিনী নারীদের স্মরণ করে দেয়। —"আমারে ফুটিতে হল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে,/বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের পদানত ;/রুদ্র তপস্যার বনে, আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,/ একাকী আসিতে হল—সাহসিকা অপ্সরার মতো।" চম্পা যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় গ্রীষ্মের খরতাপে তখন সমস্ত কিছুর প্রাণ ওষ্ঠাগত। বিমর্ষ পুষ্পকুঞ্জে কালেভদ্রে শোনা যায় ক্লান্ত কোকিলের কণ্ঠস্বর। জন্ম লাভ করে চম্পার অনুভব পৃথিবী যেন তার সামনে শুধু কঠিনের বাতাবরণ তৈরী করে রেখেছে, যা বর্তমানে এবং প্রাচীন যুগেও নারীদের অবস্থা ছিল। তথাপি প্রকৃতির প্রতিকূলতা জয় করে (প্রত্যাশী) আশাবাদী নারীর মত, সংগ্রামী যোদ্ধার মত সম্মুখ সমরে চলে আসে। কবি লিখেছেন—"তবু এনু বাহিরিয়া,—বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,—।" চম্পার এই বিশ্বাস কবি সত্যেন্দ্রনাথের বিশ্বাস, চম্পার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেন সাধারণ সমাজে অত্যাচারিত নিপীড়িত নির্যাতিত প্রতিবাদী নারীদের প্রতীক। অনুকূল পরিবেশ, সুস্থ স্বাভাবিক আর্থ-সামাজিক পরিবেশে প্রত্যেক নারী সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করতে পারে। 'চম্পা' কবিতায় নারীরূপী চম্পা ফুল প্রতিকূল পরিবেশে সুকঠিন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে নিজের বেঁচে থাকার সংগ্রামে জয়ী হয়েছে। সমাজের যেমন সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে নারীরা এগিয়ে চলছে তেমনি ভাবে নারীরূপী চম্পা সূর্যের প্রদীপ্ত বিভূতিকে সে নিজের শরীরের লাবণ্যে রূপান্তরিত করেছেন। সহজ-সরল আত্মবিশ্বাসের উপর সে বলতে পেরেছে—আমি চম্পা, সূর্যের সৌরভ। যেমন নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সমাজের সুন্দরের জন্য নিজেকে তৈরী করে, নিজেকে উৎসর্গ করে।

সমগ্র বিশ্বে নারীরা যে ভাবে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছে প্রতি পদে পদে, তা ভাবতে বিস্মিত হতে হয়। জীবন যন্ত্রণা ও জীবিকা যন্ত্রণা নারীদেরকে এক কঠিন জায়গায় দাঁড় করিয়ে চলছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। বাংলার ছয় ঋতুর মধ্যে যেমন বর্ষা, শরৎ, বসন্ত ফুলের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ আমরা কি সেই পরিবেশ পৃথিবীতে তৈরী করতে পেরেছি নারীদের জন্য ? সত্যেন্দ্রনাথ 'চম্পা' কবিতার মাধ্যমে সমগ্র পুরুষ সমাজকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন যে, নারীরাও মানুষ, তাদের স্বাধীনভাবে বাঁচতে, স্বাধীনভাবে ভাবতে, স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিৎ। পৃথিবীর সুন্দর সৃষ্টির মূলে রয়েছে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াস। সত্যেন্দ্রনাথ এই কঠিন সত্য জানতেন বলেই 'চম্পা' কবিতায় চম্পার জবানিতে সমাজকে সচেতন করে দিয়েছিলেন। সুন্দরের সৃষ্টির মূলে অর্ধেক নারী এবং অর্ধেক পুরুষ। তা না মানলে প্রতিদিন খবরের কাগজে যে সব নারী নির্যাতনের খবর দেখা যায়, তা আরো বৃদ্ধি পাবে। নারীরা যেমন নিজেকে উৎসর্গ করে বেশির ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তথা মানব সমাজকে সুন্দর করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তা 'চম্পা' কবিতায় 'চম্পা'র মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন। এখানেই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও চম্পা কবিতা চিরস্মরণীয়।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম খন্ড)—সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্য সঞ্চয়ন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।



প্যালেস্তাইন এবং লেবাননে বর্বর ইজরায়েলী আগ্রাসন আসলে গোটা পশ্চিম এশিয়া দখলের মার্কিনী কৌশল কার্যকর করার অন্যতম ঘৃণ্য পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়

বরুণ চক্রবর্তী
সহ-শিক্ষক, বড়গাছিয়া ইউনিয়ন প্রিয়নাথ পাঠশালা, হাওড়া

আহত, ক্ষতবিক্ষত প্যালেস্তাইন। রক্তাক্ত গাজা! জ্বলছে বেইরুট। জ্বলছে গোটা লেবানন। এক অস্থির আতঙ্কে ভুগছে গোটা মধ্যপ্রাচ্য। মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলী হানাদার বাহিনীর নৃশংস আক্রমণে কার্যত দিশেহারা গোটা পশ্চিম এশিয়া। অসংখ্য অসহায় নিরীহ নরনারী ও শিশুর রক্তে প্রায় প্রতিদিনই রঞ্জিত হচ্ছে প্যালেস্তাইন ও লেবাননের মাটি। গত দু-তিনমাস যাবৎ প্যালেস্তাইন এবং লেবানন এভাবেই সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিল। মানবপ্রাণের এমন নির্মম, নিষ্ঠুর পরিণতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী ইরাক যুদ্ধের পর অনেকদিন দেখেনি। দক্ষিণ লেবাননের শুধু কোয়ানা গ্রামেই মধ্যরাতে ইজরায়েলী হানাদার বাহিনীর বোমাবর্ষণে নিহত হয়েছেন অন্তত ৫৬ জন। মৃতদের ৩৪ জনই শিশু। কী অপরাধ ছিল এই ফুলের মত নিষ্পাপ নিরপরাধ শিশুদের? গ্রামবাসী মহম্মদ ইসমাইলের মতে, "ওরা শিশুদের মারতে চাইছে যাতে প্রতিরোধকারীরা হাঁটু মুড়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। এই শিশুদের অনেকেই পালিয়ে এসেছিল আক্রমণ থেকে বাঁচতে। তাদের তাড়া করেই মারলো ইজরায়েলীরা।" একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান এবং মানবিক চেতনায় সমৃদ্ধ পৃথিবী প্রত্যক্ষ করলো—একদিকে অসংখ্য, অসহায়, নিরস্ত্র, নিরীহ নর-নারী ও শিশুর আকাশ বিদীর্ণ করা আর্তচিৎকার এবং অন্যদিকে বুশ, ব্লেয়ার সহ মার্কিন ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রনেতাদের ইজরায়েলী হানাদারবাহিনীর এই নিষ্ঠুর মানব হত্যালীলার সমর্থনে পৈশাচিক উল্লাস। বুশের দূত মার্কিন বিদেশ সচিব কন্ডোলিজা রাইস এই আক্রমণের সময় ইজরায়েলেই ছিলেন। কোয়ানার ঘটনার পরও সাংবাদিকদের সামনে উৎফুল্ল কন্ডোলিজা বলেন, "কখনও কখনও এমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যায়।" হেসে গড়িয়ে পড়ছিলেন মার্কিন বিদেশ সচিব। কিন্তু কেন এই হামলা? কেন এই নিষ্ঠুর নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন? আপাতদৃষ্টিতে এটা ইজরায়েলী হানাদার বাহিনীর আক্রমণ হলেও এর পিছনে গভীর কোন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র নেই তো? ইজরায়েলকে সামনে রেখে মার্কিনীরা বিরাট কোন ছক কষছে না তো? এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে বেশ কয়েক বছর।

আরব ভূ-খন্ডে প্যালেস্তাইনে ইহুদিদের একটা রাষ্ট্র হবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ীপক্ষ সংশয়ের মধ্যেই এটা মেনে নেয়। মেনে নিতে হয়েছে অনিচ্ছুক আরবদেরও। আরব জনগণের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বিপর্যস্ত করতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা দীর্ঘকাল ধরে এই খেলাই খেলে আসছিল। ১৯৪৭ সালেই প্যালেস্তাইনে আরব রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘে গৃহীত হয়।

৫৯ বছর পরও প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠিত হয়নি। ইজরায়েল হয়ে ওঠে আরবের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান অস্ত্র। ৫৯ বছর ধরে একটানা প্যালেস্তিনীয়দের উপর রক্তক্ষয়ী আক্রমণ চলছে। হতাহত অনেক ও সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে অসংখ্য। রাষ্ট্রসংঘে ধিক্কৃত হয়েছে ইজরায়েল বারবার, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র ভেটো প্রয়োগে কোন ব্যবস্থাই কার্যকর করা যায়নি। আমেরিকা ইজরায়েলকে করেছে পারমাণবিক অস্ত্র সহ সবরকম আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। গোটা আরব দুনিয়া এবং গোটা পৃথিবীও এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। ১৯৪৮ সালেই নিজেদের পিতৃভূমিতে ৭ লক্ষ প্যালেস্তিনীয় উদ্বাস্তু হয়ে যায়। ভূ-খন্ড বাড়ায় ইজরায়েল।



ইজরায়েলী অভিযানে ১৯৪৮-৬৮ সালের মধ্যে ২০ বছরে ১১ লক্ষেরও বেশি প্যালেস্তিনীয় উদ্বাস্তু হয়ে যায়। তারমধ্যে ৩ লক্ষ যায় গাজা এলাকায়, ৫ লক্ষ জর্ডন নদীর পশ্চিমতীরে, ৩ লক্ষ পূর্বতীরে। অন্যান্য অনেক উদ্বাস্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আরবের বিভিন্ন জায়গায়। ইজরায়েলের হাতে বারবার সামরিক পরাজয়, বিরাট ক্ষয়ক্ষতি স্বীকারের ফলে আরবদের মধ্যে রাজনৈতিক হতাশা বাড়ে। পরিণতিতে কয়েকটি আরব দেশ আমেরিকার চাপে ইজরাইলের সঙ্গে চুক্তিতে আসে। আরব দেশগুলির ঐক্যে এই ভাঙন অশান্তির আগুন আরও বাড়িয়ে তোলে এবং ইজরায়েলের আগ্রাসী শক্তির তা সহায়ক হয়। ১৯৫৮ সালের মধ্যে ইজরায়েল ১০ লক্ষ ইহুদিকে বাইরে থেকে নিয়ে এসে ইজরায়েলের স্থায়ী বাসিন্দা করে পৃথিবীর ১.২০ কোটি ইহুদির গৃহকোণ হিসাবে। স্লোগান হলো ইহুদিবাদকে কেন্দ্র করে একজোট হও।

১৮৫৪ সালে কার্ল মার্কস 'যুদ্ধ ঘোষণা ঃ পশ্চিমী প্রশ্নের ইতিহাস'-এ লিখেছেন, "ইহুদিরা প্যালেস্তাইনের আদিবাসিন্দা নয়, তারা এসেছে বহু দূর দূর দেশ থেকে।" ধর্মীয় ইহুদিবাদের ইতিহাস দু'হাজার বছরেরও বেশি সময়ের। কিন্তু রাজনৈতিক ইহুদিবাদের জন্ম ইউরোপে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। ১৮৯৭ সালে হয় প্রথম ইহুদি সম্মেলন, যেখান থেকে প্যালেস্তাইনকে তাদের বাসভূমি করার প্রস্তাব পাশ হয়। ব্রিটিশ ও ফরাসী ঔপনিবেশিকদের সহায়তা ছাড়া ইহুদি বুর্জোয়াদের এই লক্ষ্য অর্জিত হয় না। ইহুদি ধনী রথস চাইল্ড ও অন্যান্যদের উদ্যোগেই প্রতিরক্ষাবাহিনী 'হাগানা' সন্ত্রাসবাদী সংগঠন তৈরী হয় ১৯২০ সালে। এই সংগঠন ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের অস্ত্র। তখন থেকে ইহুদিবাদ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সন্তান। পশ্চিম এশিয়ার বিশাল তেলসম্পদ হলো সাম্রাজ্যবাদীদের বহুদিনের লক্ষ্য। মধ্যপ্রাচ্যের আহরিত তেলসম্পদের বেশিরভাগ মার্কিন নিয়ন্ত্রণে যেখানে এক ডলারের বিনিয়োগে তাদের কোম্পানীগুলি মুনাফা করে পাঁচগুণ।

আরব জনগণের ঐক্য ভাঙার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবরকমের ষড়যন্ত্র, চাপ, আক্রমণ সংঘটিত করে ইজরায়েলকে সামনে রেখে। এর পরিণতিতে ইজরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতে ১৯৬৭ সালে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় আরবের উপর। এই যুদ্ধে প্যালেস্তিনীয়দের ঘনবসতিপূর্ণ বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নেয় ইজরায়েল। আরও সাড়ে ৪ লক্ষ প্যালেস্তিনীয় উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। অবশিষ্ট যারা রইল, তাদের মধ্যে তৈরী করা হলো ইজরায়েলীদের বসতি। শক্তিশালী সামরিক বাহিনী

থাকে প্রহরায়। প্যালেস্তিনীয়দের চলাফেরা করতে হলে ইজরায়েলের অনুমতি নিতে হবে। গোটা প্যালেস্তাইন এলাকা কার্যত বন্দীশালা।

এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিরোধে আরব জনগণের উদ্যোগে গঠিত হয় প্যালেস্তাইন মুক্তিসংস্থা কিংবা পি এল ও। ইয়াসের আরাফত যার অবিসংবাদিত নেতা। বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয় পি এল ও। অবশেষে রাষ্ট্রসংঘ ১৯৭৪ সালে পি এল ও কে প্যালেস্তিনীয় জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। আমেরিকার মদতে ইজরায়েল তার সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি নিয়ে প্যালেস্তিনীয়দের উপর আক্রমণ বাড়িয়ে চলে। নিহত ও আহত হয় অসংখ্য নিরীহ মানুষ, তারমধ্যে শিশুদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। কোনো বিশ্বজনমত, রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব, বিভিন্ন দেশের দাবী আমেরিকা-ইজরায়েল গ্রাহ্য করেনি।

১৯৮৭ সালে পি এল ও ডাক দেয় অভ্যুত্থানের, যার নাম ইন্তিফাদা। আরাফতকে আমেরিকা-ইজরায়েল 'সন্ত্রাসবাদী' বলে প্রচার করে। কিন্তু আরব জনগণ ও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিপুল সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে ইজরায়েল তার অবস্থান পরিবর্তন করে আরাফত এবং পি এল ও-কে আঞ্চলিক সমাধানের জন্য প্রতিনিধি হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

ইন্তিফাদা যখন ব্যাপকতা লাভ করছে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব-ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় এই অভ্যুত্থানে ভাটা এনে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে দুর্বল হয়ে পড়ে আরব জগৎ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলি। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ রাজত্ব ব্রিটেন-আমেরিকার ছকে যেভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে তারমধ্যে আবদ্ধ রাখাটাকে শান্তির গ্যারান্টি বলে দাবী করেছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার সেই 'বাস্তুস্থান' মডেল প্যালেস্তাইনে কায়েম করতে চায় আমেরিকা। অন্যদিকে পৃথিবীজুড়ে এবং মার্কিন টিভিতে পরিকল্পিত প্রচার শুরু হয় যে আমেরিকা শান্তির রক্ষক, আরাফত শান্তির কাঁটা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরাফতের উপর চাপ দিতে থাকেন 'বাস্তুস্থান' মডেলকে স্থায়ী সমাধান হিসাবে মেনে নিতে যা আরাফত সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করেন। কালবিলম্ব না করে জেনারেল বরাক এবং লিকুড পার্টির প্রধান কুখ্যাত শ্যারন আবার শুরু করে অভিযান। ১৯৮২ সালে এই শ্যারন লেবাননে প্যালেস্তিনীয় উদ্বাস্তু শিবিরে হামলা চালিয়ে ১ হাজার প্যালেস্তিনীয় উদ্বাস্তু ও লেবাননের সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছিল।

১৯৯৩ সালে নরওয়ের রাজধানী অসলোতে অসলো চুক্তির পর থেকে প্যালেস্তাইন কর্তৃপক্ষকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে ইজরায়েল অবর্ণনীয় অত্যাচার ও অবরোধ সংঘটিত করে যাচ্ছিল। ২০০১ সালে আমেরিকার ওপর সন্ত্রাসবাদী হামলার পর প্যালেস্তিনীয়দেরও সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিহ্নিত করে আক্রমণ বাড়াতে প্রেসিডেন্ট বুশ এবং শ্যারন একযোগে এগিয়ে যান। আরাফতকে দেশ ছাড়ায় হুমকি দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি অবিচল থাকায় প্যালেস্তাইন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর ভবন ও বাসস্থান রামাল্লায় ইজরায়েলী বাহিনী আক্রমণ করে। প্রাণে বাঁচেন আরাফত। মাত্র দেড়খানা ঘরের মধ্যে তিনি বন্দী হয়ে থাকেন, বাইরে বেরোলেই তাঁকে হত্যার পরোয়ানা মার্কিন মদতে শ্যারন জারি করেছিল। অসলো চুক্তির অসারত্ব প্রকাশ্যে এসে পড়ায় ইজরায়েলী অত্যাচারের প্রতিরোধে জঙ্গি হামাস ও অন্যান্য গোষ্ঠী তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৮৭ সালে হামাস কিংবা ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্ম ইজরায়েলের হাত থেকে অধিকৃত এলাকামুক্ত করার অভিপ্রায়ে।

১৯৮৮ সালের রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবে ইজরায়েলকে পরোক্ষে স্বীকৃতিদানের কথা আছে ; প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের বিনিময়ে এই স্বীকৃতিদানে আরাফতও সম্মতি দেন। ২০০২ সালে রাষ্ট্রসংঘ ঢাল-তলোয়ারহীন অবরুদ্ধ ৩৪ লক্ষ মানুষের প্যালেস্তাইনকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। সেটা কাগজে কলমেই। হামাস ইজরায়েলকে স্বীকৃতিদানের উগ্র-বিরোধী।

২০০৪ সালে রহস্যজনকভাবে আরাফতের মৃত্যুর পর প্যালেস্তাইন জনগণের মধ্যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। নতুন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ফাতহা পার্টির নেতা হলেও তিনি পশ্চিমী ঘেঁষা হিসাবে পরিচিত। অন্যদিকে বিরোধী দল হিসাবে হামাস জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। প্যালেস্তাইন সংসদের নির্বাচনে ১৩২টি আসনের মধ্যে হামাস পায় ৭৬টি আসন, আরাফতের দল ফাতহা পায় ৪৩টি আসন, বাকি আসনগুলিতে জয়ী হামাস-সমর্থিত বামপন্থীরা ও নির্দলরা। হামাস-এর বিরাট জয় আরব জনগণকে উৎসাহিত করে।

এই জয়ের পর হামাস ইজরায়েলকে ধ্বংস করার স্লোগান আর তোলেনি। দু'টি দেশ হবে ইজরায়েল এবং প্যালেস্তাইন—এটা এখন তাদের বাস্তব এবং গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব। ১৯৪৭ সালের সীমানা নয়, তারা চায় ১৯৬৭ সালের পূর্বেকার অবস্থান। হামাসও শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চায়, তবে প্যালেস্তাইনের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মর্যাদার বিনিময়ে নয়। ইসলামিক মৌলবাদী ধারণাও পরিহার করে চলেছে তারা। কিন্তু হামাস-এর বিজয়ের পর প্যালেস্তাইন কর্তৃপক্ষকে শায়েস্তা করার মনোভাবের কথা আমেরিকা ও ইজরায়েল গোপন করেনি এবং এই মর্মে শুরু করেছে প্যালেস্তিনীয়দের উপর অত্যাচার। সমস্ত সাহায্য বন্ধ করে পশ্চিমীরা সৃষ্টি করেছে অর্থনৈতিক

অবরোধ, ভিতরে চলছে হামলা।

গতবছর বহুল-প্রচারিত প্যালেস্তাইনের গাজা এলাকা থেকে ইজরায়েলী সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার শুরু হবার পর ইজরায়েল একদিনের জন্যও আক্রমণ বন্ধ করেনি। গত দু-তিন মাসে নিহতের সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে গেছে, তারমধ্যে ১৪ জন শিশু। একজন ইজরায়েলী খুন হলেও প্যালেস্তাইনের সমস্ত মানুষের উপর শাস্তি আরোপ হয়। একটানা আক্রমণের মধ্যে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিরা গাজায় ইজরায়েলী সীমান্তে এক ইজরায়েলী সামরিক চৌকিতে হামলা করে। তাতে দু'জন নিহত এবং একজন অপহৃত হয়। তারজন্য শাস্তি পেতে হচ্ছে গাজার ১৫ লক্ষ মানুষকে। যাতায়াত, খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, সেতু, অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থা সবই ভেঙে চুরমার করেছে ইজরায়েল। এক-তৃতীয়াংশ মন্ত্রী এবং একদল সাংসদ, অফিসারদের গ্রেপ্তার করেছে। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রীদপ্তর ও বিদেশদপ্তর ক্ষেপণাস্ত্রে ধ্বংস হয়েছে। অপহৃত সৈন্যের বিনিময়ে ১০০ জন প্যালেস্তিনীয় দু'সপ্তাহে নিহত হয়েছে। গাজার এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশ বিচ্ছিন্ন। সবই মার্কিন ও পশ্চিমীদের কাছে সমর্থনযোগ্য। ১৯৬৭ সাল থেকে প্রায় ৭ লক্ষ এবং ২০০০ সাল থেকে প্রায় ৫০ হাজার প্যালেস্তিনীয় ইজরায়েলী জেলে আটক। বর্তমানে আছে ৯,৮৫০ জন বন্দী ৩০টি ইজরায়েলী জেলে। ৪৪৩০ জন শাস্তি ভোগ করছে, ৪৫৭৫ জনের সম্পর্কে তদন্ত হচ্ছে, ৮৫০ জন বিনা অভিযোগে আটক।

লেবানন ঃ এখানেও দুজন ইজরায়েলী সৈন্যের অপহরণ নিয়ে গোটা লেবাননকে ধ্বংস করছে ইজরায়েল। এখানেও আমেরিকা ইজরায়েলের পক্ষে। ১৯৭৮, ১৯৮২, ১৯৯৬ এবং ২০০০ সালে লেবাননের ওপর ইজরায়েল বারবার বর্বর আগ্রাসন চালিয়েছে। লেবাননে ইজরায়েলী লক্ষ্যবস্তু হলো হেজবুল্লাহ। এরা একটি রাজনৈতিক সংগঠন, এদের রয়েছে একটি সশস্ত্র মিলিশিয়া, যার সদস্যরা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। হেজবুল্লাহ গোষ্ঠী লেবানন সরকারেও রয়েছে। লেবাননের ৫ লক্ষ মানুষ এখন উদ্বাস্তু। বিদেশীরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। নৈরাশ্য ও প্রতিহিংসার বশে অসামরিক এলাকাগুলিতে নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করেছে ইজরায়েল, যা নিঃসন্দেহে একটি জঘন্য অপরাধ। দক্ষিণ লেবাননে ইজরায়েলী আক্রমণ থেকে রেডক্রশের অ্যাম্বুলেন্সগুলিও রেহাই পায়নি। ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হানায় রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর চারজন সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। সবচেয়ে নৃশংস আক্রমণ চালানো হয়েছে কোয়ানা গ্রামে।

লেবাননের উপরে আক্রমণের ক্ষেত্রে ইজরায়েলকে পূর্ণ মদত দিয়েছে আমেরিকা। তারা হেজবুল্লাহ গোষ্ঠীকে নির্মূল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। কারণ আমেরিকা মনে করে হেজবুল্লাহ হলো ইরানের একটি হাতিয়ার। ইজরায়েল যদি এই আক্রমণে দ্রুত সাফল্য পেতো তাহলে সিরিয়া আক্রমণের আরেকটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো সিরিয়া সরকারের স্থিতিশীলতা নষ্ট করা। সিরিয়ার সেনাবাহিনী সরে যাবার পর লেবাননে 'সেভার বিপ্লব' ঘটিয়ে সেখানে একটি পশ্চিমপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত করে আমেরিকার মনে আশা জেগেছিল যে ইজরায়েলী তৎপরতার ফলে হেজবুল্লাহ পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যাবে। এবং তারপর লেবাননকে পুরোপুরি দৃঢ়ভাবে পশ্চিমী নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। এইভাবে গোটা পশ্চিম এশিয়াকেই তারা কব্জা করতে চায়।

যাইহোক, আন্তর্জাতিক চাপে লেবাননে গণহত্যা থেকে সাময়িকভাবে পিছিয়ে আসতে হয়েছে ইজরায়েলকে। কিন্তু আপাতত আগ্রাসন থেকে বিরত হলেও আগাম হুমকি দিয়ে রেখেছে যে-কোনো সময় ফের আগ্রাসন শুরু হতে পারে। বুশের মতে, ইজরায়েল যত বর্বর বা পৈশাচিক আচরণই করে থাকুক না কেন তা তাদের আত্মরক্ষার কারণেই করেছে। অর্থাৎ মার্কিন মূল্যবোধে আত্মরক্ষার অজুহাতে যে-কোনো অমানবিক নৃশংসতা অনুমোদিত। অবশ্য সেটা কেবলমাত্র আমেরিকা এবং তাদের বশংবদদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্যদের ক্ষেত্রে তা বর্বরতা বলেই গণ্য হবে। কারণ মার্কিনী মূল্যবোধে অন্যদের আত্মরক্ষার অধিকার স্বীকৃত নয়।

ক্যাপিটাল গ্রন্থে মার্কস এক ইংরেজ সাংবাদিকের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, 'পর্যাপ্ত মুনাফায় পুঁজি খুবই বলিষ্ঠ। ১০ শতাংশ মুনাফা হলে সে যে-কোনো জায়গায় তার কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করবে, ২০ শতাংশ বাড়ায় আকুলতা, ৫০ শতাংশ তৈরী করে পুরোদস্তুর ঔদ্ধত্য, ১০০ শতাংশ মুনাফা হলে পুঁজি প্রস্তুত হয় সমস্ত মানবিক আইনকে পদদলিত করতে এবং ৩০০ শতাংশ হলে যে-কোনো অপরাধ করতে তার সঙ্কোচ থাকে না, এমনকি ফাঁসিতে যাবার ঝুঁকি থাকলেও পরোয়া করে না।' পুঁজির এই হিংস্র লালসার কারণেই তেলসম্পদের অধিকারী আরব জনগণের প্রতি যে-কোনো অপরাধকে সাম্রাজ্যবাদীরা অপরাধ বলেই মনে করে না। প্যালেস্তাইনের ওপর ইজরায়েলের ৫৯ বছর ধরে এই বর্বরতায় কোন ভ্রুক্ষেপ নেই সাম্রাজ্যবাদীদের, এত ধ্বংসযজ্ঞে কোন অনুতাপ নেই, বরং আছে পাশবিক ঔদ্ধত্য।

তথ্যসূত্র ঃ গণশক্তি, পিপল্‌স্ ডেমোক্র্যাসী, আনন্দবাজার, প্যালেস্তাইনের জনগণের সংহতিতে দাঁড়ান —পঃ বঃ রাজ্য কমিটি, সি পি আই (এম)।

ধারাবাহিক

উপলখন্ড

ভূত তাড়ানো

অরুণ চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভূতাবিষ্টা নারীর উপর থেকে আবেষ্টনকারী ভূতের অস্তিত্ব বিলোপ করা বা সহজ কথায় ভূত তাড়ানো নিয়ে বাংলাভাষার প্রখ্যাত গাল্পিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদপোড়া' গল্প অমরত্ব পেয়েছে। বলা যায়, ক্লাসিক চরিত্র বা চিরন্তনীতে পরিণত হয়েছে।

আজ এই অনুকাহিনিতে সেই ধরনের ভূত তাড়ানোর গল্প বা কাহিনিই বলব। এটা পুরোপুরি আমার অভিজ্ঞতা- সঞ্জাত।

আমাদের পাশের বাড়িতেই থাকতেন এক জ্যেঠাইমা আর তাঁর মা। জ্যেঠামশায় বা জ্যেঠাইমা কারুর নাম জানি না। আমি পৃথিবীর আলো প্রথম দেখার অনেক আগে জ্যেঠামশায় পৃথিবী ছেড়েছেন। মা-র কাছে শুনেছি যে, জ্যেঠাইমা বালবিধবা। সাতবছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের বছরখানেকের মধ্যে ওলাওঠা দেবী বা ওলাবিবি জ্যেঠামশায়ের এ দুনিয়ায় থাকার উপর যবনিকাপাত ঘটান। তখন এটা ছিল সর্বজনীন ঘটনা। মা ওলাওঠা দেবীর রোষবহ্নিতে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। গ্রামবাসীরা একে ঐ মা-এর কৃপাদৃষ্টি বলেই মনে করতেন। যেমনি, বসন্ত রোগের নাম, মায়ের দয়া। সুকুমার সেন মশাই বলবেন, ভয়ের জিনিসকে ছোট করে বা উল্টো করে দেখা।

এও শুনেছি যে জ্যেঠামশাই তখন দ্বাদশবর্ষীয় এক কিশোর। আমরা তাই জ্যেঠাইমাকে জানতাম শুধু। ওঁর শ্বশুর আমাদের পরিবারের দৌহিত্র। দৌহিত্র সুবাদে মাতামহের ভিটের মালিক হয়েছিলেন।

জ্যেঠামশাইয়ের শ্বশুরমশাই ছিলেন ঠাকুর উপাধিকারী। ওঁদের পৈত্রিক শিষ্যাদি ছিল। আর তিনি নিজেও ছিলেন তন্ত্রসাধক। কালী ভক্ত, অর্থাৎ তান্ত্রিক।

নারকেলের মালায় কারণবারি পান করতেন। আবার ঐটাই চা-ও পান করতেন।

বরিশাল জেলার মালিয়ারা, গেলা, ফুল্লশ্রী প্রভৃতি বিখ্যাত বৈদ্যপ্রধান গ্রামের বৈদ্য সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ওঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

জ্যেঠামশাইয়ের দেহান্তের পরে পুত্রবধূ জ্যেঠাইমাই হলেন ঐসব শিষ্যদের গুরুমা। তিনি নারী হলেও দীক্ষা দিতেন। শ্বশুরমশাই ঐসব বিদ্যা পুত্রবধূকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

জ্যেঠাইমা প্রয়াত শ্বশুরমশাইয়ের কাছে ভূতসিদ্ধির মন্ত্রাদিও শিখেছিলেন। ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করেই তিনি ভূত তাড়ানোর কাজ শুরু করেন।

তাঁর কাছে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ভূতক্লিষ্টারা আসতেন। জ্যেঠাইমা পুরুষ রোগীর চিকিৎসা করতেন। তাঁর কাছে-আসা সবাই ছিলেন রোগিনী, বিশেষত যুবতী বধূরা বা বয়ঃসন্ধির কিশোরীরা, তাঁরা সবাই বিবাহিত। তখন বিয়ের বয়সের আইনের অস্তিত্ব থাকলেও তার প্রয়োগ ছিল খুবই সীমিত। আমরা ছোট বয়সে 'সারদা অ্যাক্টে'র কথা শুনেছি। বয়স্কদের মধ্যে আলোচনা হত। তা শুনে নিয়ে 'বিজ্ঞ' বা অকালপক্ব হয়েছি।

এখন, ঐসব বালিকাবধূরা যখন যৌবনের ডাক শুনতেন, চুপিসারে যৌবন তার নিয়মমাফিক দেহকে আবিষ্ট করছে, তখন তার পদসঞ্চার মুহূর্তে জীবনের কিছু কিছু সমস্যাও অনেকের ক্ষেত্রে দেখা দিত।

সমস্যা বেশি হত দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের বধূদের ক্ষেত্রে। স্বামীদেবতার সাথে বয়সের তফাৎ থাকত। তাছাড়া স্বামীদেবতার জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাও অনেক বেশি থাকত। অপরদিকে স্ত্রীরূপিণীর সেখানে ঘাটতি থাকত। এখানেই দ্বন্দ্বের উৎস ছিল।

এসব নিয়ে বাংলাভাষায় রচিত কথাসাহিত্যের সম্ভারে অনেক উপন্যাস বা ছোটগল্প রয়েছে। কাজেই, সে নিয়ে থিসিস্ লেখার বাসনা আজ আমার আদৌ নেই।

'ভূত' নামক শব্দটার ছোটবয়সে দারুণ আকর্ষণ ছিল।

কতরকমের ভূত আছে এদেশে — বামুনভূত বা ব্রহ্মদৈত্য, মামদোভূত, সাহেবভূত এইসব। আবার তাদের কাউন্টারপর্বে আছে পেত্নী, শাকচুন্নি, মেমভূত ইত্যাদি।

পুরুষরা দেহান্তে 'ভূত' হন। আর নারীরা হন 'পেত্নী'। তবে, সেখানেও জাতবিচার বহাল থাকে। সম্প্রদায়গত বিভাগও থাকে। যেমন, 'চিরকুমার' ব্রাহ্মণ্যের জীবনাবসানে তিনি হন 'ব্রহ্মদৈত্য' বা 'বেহ্মদৈত্যি'। থাকতেন বেলগাছে। আর চিরকুমারী ব্রাহ্মণকন্যা মৃত্যুর পরে হবেন পেত্ন বা প্রেতিনী। আর সমাজের অন্ত্যজ নারী হবেন শাকচুন্নি বা শাকচুরিনি। তিনি দারিদ্র্যবশত শাক চুরি করে বেঁচে থাকেন। আর হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত ধর্ম বা ইসলাম ধর্মাবলম্বী মৃত্যুর পরে হন 'মামদোভূত'। 'মামদোবাজি' কথাটা বাংলায় চালু। বিখ্যাত গীতিকবিতার রচয়িতা বা গীতিকার রামপ্রসাদ সেনের গানে ঐ শব্দটা বিশেষ স্থান পেয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশীয় শ্বেতাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গিনীরা মৃত্যুর পরে হন 'সাহেবভূত'। অবশ্য, ভূতের জন্মতত্ত্বে বলা হয়েছে যে স্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ভূত বা পেত্নীর (প্রেতিনী) জন্ম হয় না।

আমাদের 'পুণ্যাত্মা ভারতভূমি'তে ম্লেচ্ছ সাহেবরা সেই ভাস্কোডাগামার সাথে পনেরো শতকের শেষভাগে এই নেটিভ-কবলিত দেশে তাঁদের গৌর-চরণের সন্ধান দিয়েছেন আমাদের।

ঐসব সাহেব ও সাহেবানী বা মেমসাহেব (ম্যাডাম থেকে মেম) দেহান্তের পরে বেশ কিছুসংখ্যক 'সাহেবভূত'-এ রূপান্তরিত হয়েছেন। বিশেষ করে নীলকুঠির এলাকায় এঁদের বেশি পাওয়া যায়, অত্যাচারী সাহেবদের কাউকে 'খোদার চিল' ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছে। 'অভদ্র' নীলচাষীরা নীলকর সাহেবদের নানাবিধ অত্যাচারে ও নির্মমতার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে শেষতক 'সশস্ত্র' হয়েছে, ধড় থেকে দেহ বিচ্যুত হয়েছে। জন্ম নিয়েছে কাঁধকাটা ভূত বা 'কবন্ধ'-এর। এরাও ভূতসমাজের অন্তর্ভুক্ত। তারপর 'আলেয়াভূত'ও আছে। অন্ধকার রাতে পুকুরপাড়ে এরা বিচরণ করে। মুখে তাদের আগুন জ্বলে প্রাচীন দীঘি বা পুকুর কিংবা বিলে এদের বিচরণ, মাছ এদের খাদ্য। ভূতেরও তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে। মানব-মানবীদের যাবতীয় গুণ ভূতজগতেও থাকতেই হবে।

জ্যেঠাইমার ভূত তাড়ানো পদ্ধতি ও প্রচেষ্টা ঘরের জানলা দিয়ে দেখতাম। আমাদের বাড়ির লাগোয়া পশ্চিম পাশেই জ্যেঠাইমার গোলপাতার ঘর। তার উঠানে একটা কাঁঠাল ও একটা আমগাছ ছিল। কিছু দূরে ছিল একটা ছিট্‌কি গাছ। তার ফল পাকলে মাসকলাই-এর ডাল রান্না করলে তার যেমন সুবাস বেরোয়, তেমনি বেরোত। এরসাথেও একটা ভৌতিক সম্পর্ক আমরা কল্পনা করতাম। ভূতগিন্নী পেত্নী রান্না চাপিয়েছে। ওদের সংসারের সবকিছুইতো রাতের বেলা হয়ে থাকে। সন্ধ্যার পরে ঐ গন্ধ পেতাম। ছিট্‌কি গাছের ঝোপতো এখানে-সেখানে থাকত।

জ্যেঠাইমার তরফ থেকে ভূত সম্ভাষণ প্রক্রিয়া প্রথম শুরুর সময়ে তিনি ঐ ছিট্‌কি গাছের ডাল দিয়ে প্রেতিনীকে প্রথম শারীরিকভাবে আদর করতেন। আর হলুদপোড়া, শুকনো মরিচ পোড়া প্রভৃতিতো চলতই। আমরা ঘরে বসে তার আঁচ অনুভব করতাম। জোর কাশি আসত। ভূতাবিষ্টা নারীকে তখন জেরার কাজ শুরু হতো।

তুই কে?

আমি নীহারি।

নীহারি মানে? কে নীহারি?

তোমরা কুট্টি ঠাকুরকে চেন না? তার চতুর্থ পক্ষের বৌ গলায় দড়ি দিয়ে মরল। হিজল গাছে তার দেহটা ঝুলানো অবস্থায় সবাই ভোরবেলায় দেখল। আমিও তখন এলোচুলে ঘোমটা টেনে বাঁশবনের মধ্যে প্রাতঃকৃত্যে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কী হলো বুঝতে বুঝতেই হুঁশ রইল না আমার। তাই আমি নীহারি হলাম।

তোর আসল নাম কী?

মনে নেই। আমি এখন নীহারি, আমার সোয়ামীর নাম কুট্টি ঠাকুর।

এই বলে ভূতাবিষ্টা জিভ্ কাটল। আপনারা কিছু মনে করেন না যেন। আমি ভুলে সোয়ামির নাম বলে ফেলেছি। কথাটা শেষ করেই সে নিজের কান মল্‌ল।

কদ্দিন যাবত তুই নীহারি?

ঐযে ভাদর মাসের অমাবস্যার দিন ভোরে যখন হিজল গাছে তার দেহটা ঝুলছিল, জিভ্‌টা বেরিয়েছিল। বসন ছিল না। ঐটাই গলায় বাঁধা। এপাড়া-ওপাড়ার অনেক পুরুষরা আর ডাক্তারবাড়ির ক্ষান্তবুড়ি দেখছিল, তখন আমিও বাঁশগাছে আড়াল থেকে দ্যাখলাম। ঐ মুহূর্তেইতো আমি নীহার হলাম।

ঠাকুরমশাই দেখলাম কপাল চাপড়াচ্ছে। অনেকে অনেকরকম কথা বলছে, সবটা শোনা যাচ্ছিল না। তবে, দেড়ানিদের নয়াবাড়ির বামন চদ্‌রি (চৌধুরী) চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিলেন যে ঠাকুরমশাইকে তিনি একটা সোমত্ত কনেকে 'চতুর্খ' পক্ষের বৌ করতে বারণ করেছিলাম। কথা না শুনলে যা হয় তাই হলো।

জ্যেঠাইমা এবার তাঁর হাতের ছিট্‌কির ডালের গোটা কয়েক বারি ওর পিঠে সপাং সপাং করে বসালেন। কাছেই রাখা ছিল একটা মুড়ো ঝাটা। নারকেল পাতা থেকে তৈরি। আর একটা মোটা বেতের লাঠি। ঐ ধরনের নিপীড়নের আরও

হাতিয়ার। জ্যেঠাইমা ছিট্‌কি গাছের বারি দিয়ে বললেন যে পেকামি আর গপ্প রাখ। যাবি কিনা বল।

এদিকে, হলুদ আর শুকনো লঙ্কার বিচির মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে।

জ্যেঠাইমা বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ছেন।

রোগিনী কায়স্থ সম্প্রদায়ের। স্বামী লেখাপড়া জানে। ফরিদপুরের কোর্টে চাকরি করে। বয়স বছর বাইশ। বিয়ে হয়েছে বছর আটেক আগে। কনের বয়স তখন বছর আটেক। এখন বধূর বয়স ষোলো। জননী হয়নি এখনো।

স্বামীকে সেখানে থাকতে হয়। প্রতি সপ্তাহে বাড়ি আসারও অনেক সমস্যা। মাসে একবারের বেশি আসা হয় না। স্বামীর এক মাস্‌তুতো ভাই, ঐ বাড়িতে থেকে হাইস্কুলে পড়ে। সে বধূর সমবয়সী। এখন ক্লাস নাইনে উঠেছে। উভয়ে খুব ভাব। এই নিয়ে পাড়ায় নানারকম কানাকানি হয়।

স্বামী বাড়ি এলে তাঁর জননীও নানা কথা শোনান পুত্রকে। আর তাতে উত্তেজিত হয়ে প্রায়ই মারধর করে স্ত্রীকে।

শেষে সমাধান হলো এভাবে। মাস্‌তুতো ভাইকে স্কুলের বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সে যেদিন বোর্ডিংয়ে চলে গেল, তার একদিন পড়েই কুট্টি ঠাকুরের চতুর্থ পক্ষের বউ-এর অপমৃত্যু হলো।

জ্যেঠাইমা এবার রোগিনীর চুলের মুঠি ধরলেন আর মুড়ো ঝাঁটাটা দিয়ে কয়েক ঘা ওর পিঠে বসাতে লাগলেন। রোগিনী চিৎকার করছে।

জ্যেঠাইমার একটাই কথা। যাবি কিনা বল?

রোগিনীর মুখের কাছে পোড়া হলুদ। শুক্‌নো লঙ্কার পোড়ানো বিচির গন্ধও তুলে ধরছে পন্দুবালা। জ্যেঠাইমার সহায়ক সে।

এভাবে চলল প্রায় ঘন্টাখানেক। কী হয়, কী হয় তা দেখার জন্য পাড়ার অনেকে এসেছে। সবাই সামনে নয়। আমাদের ঘরের উত্তরদিকে বারান্দা থেকে দেখছে অল্পবয়সী বউরা। অবশ্য, সব ঘরের বউদের শ্বাশুরিরা আসতে দেননি। পোয়াতিদেরতো নয়, দু'-চার বছর বিয়ে হয়ে এসেছে, এখনো সন্তানবতী হননি, তাদেরও আসার অনুমতি জোটেনি। প্রৌঢ়ারা এসেছেন। বুড়িদেরতো কথাই নেই। যুবকরাও সামনে যায়নি, দূরে দূরে আছে। আমাদের বাড়ির দোতলায় তাদের কয়েকজন ঐ দৃশ্য দেখছে। রোগিনীকে ঘিরে আছেন তার স্বামী, শ্বাশুড়ি, পিস্‌-শ্বাশুড়ি ও দিদি-শ্বাশুড়ি।

নিপীড়নে তার দেহের বসনাদিও স্খলিত হচ্ছে। চুল আলুথালু, চোখ রক্তবর্ণ। শেষপর্যন্ত রোগিনী বেহুঁস হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখনও চলছে ভূত তাড়ানোর প্রক্রিয়া। জ্যেঠাইমাও মরিয়া।

যাবি কিনা বল্? বারবার জিজ্ঞাসা। ঐভাবে আরও আধঘন্টা খানেক কাটল। পরিশেষে মুখ খুললেন রোগিনী।

যাব আমি। আমাকে আর মারিস না।

কোথায় থাকিস্ তুই?

আমি থাকি এখন ডাক্তারবাড়ির বড় তালগাছটায়।

কখন যাবি?

তোরা ওর দেওরকে বাড়িতে নিয়ে আয়। তাহলেই চলে যাব। নইলে যাব না।

রোগিনীর পরিবার মহা সমস্যায় পড়ে গেল। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক হলো যে তাঁকে আনার জন্য স্কুল বোর্ডিংয়ে লোক পাঠানো হবে।

পাঠানো হলো। স্কুলতো খুব দূরবর্তী ছিল না। প্রেরিত লোকের সাথে বোর্ডিংয়ে পাঠানো মামাতো দেওর চলে এলো।

রোগিনী রক্তচোখ নিয়ে তাকালো তার দিকে, আর খিল খিল করে হেসে উঠল। সাথে সাথেই সম্পূর্ণ বেহুঁস হলো।

কিছুক্ষণ পরে কিছুটা নাচানাচি করলো রোগিনী। মাটিতে বসে পড়ল। মিনিট পনেরো লাগল তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে।

জ্যেঠাইমা ওর শ্বাশুড়ি ও বড় জা-কে বললেন, দীঘিতে নিয়ে গিয়ে ভালো করে স্নান করিয়ে নিয়ে আস। মাথায় সুবাস তেল দিও। স্নানের পরে একটা নতুন লালপেড়ে শাড়ি পরিয়ে দাও। চুল কাঁকই দিয়ে ভালো করে আঁচড়ে কপালে সিঁদুর পরিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি এখন মা বগলামুখির পূজায় বসব। পূজার পরে স্বামী-স্ত্রী দুইজনে মাকে প্রণাম করবে। আর প্রসাদ নেবে। আর স্বামীকে সাতদিন ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকতে হবে।

ফরিয়াদিরা যথানির্দেশ কাজ করলেন। এরপরেও জ্যেঠাইমার ওখানে অনেক রোগিনীকে দেখেছি। ভূতাবিষ্টা রোগিনীদের ভিড় বেশি হতো অমাবস্যায়। আবার শনি বা মঙ্গলবার। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতেও ভিড় হতো। শনি বা মঙ্গলবার অমাবস্যা হলে তো সুবর্ণসংযোগ হতো।

জ্যেঠাইমা কয়েকবছর পর ওঁর মাকে নিয়ে কাশীবাসিনী হলেন। বাঙালী বিধবাদের শেষ গন্তব্যস্থান। আর আসেননি। কিন্তু ভূত তাড়ানোর স্মৃতি রেখে গেছেন আমাদের জন্য।

জ্যেঠাইমাকে কেন্দ্র করে আমার বামনাই বা ব্রাহ্মণত্বর এক চমকপ্রদ কাহিনি আছে। বারান্তরে তা লেখার বাসনা রইল।

(চলবে)

ওরা তিন জন

দীননাথ সেন

চরিত্র ঃ

আমিনা
কাঙালি
লালু
রসিক দুলে
গফুর
তিন জমিদার
দুই নায়েব
দুই দারোয়ান
গুরুদেব
পুরোহিত

(পথের ধারে একটি মেয়ে বসে কাঁদছে)

আমিনা : আব্বাটা কোথায় গেল? এখনো আসছে না কেন। আমার যে ভয় করছে। এখানকার আমি কিছুই চিনি না। (*ফুঁপিয়ে ওঠে। কাঙালিলির প্রবেশ। পিঠে তার একটি ছোটো পুঁটুলি*)

কাঙালি : একি? কাঁদছ কেন? কী হয়েছে তোমার?

আমিনা : আমার আব্বা এখানে বসতে বলেছে। এখনো আসছে না।

কাঙালি : তোমার নাম কী। কোত্থেকে আসছ?

আমিনা : আমার নাম আমিনা। আমরা কাশীপুর গ্রামে থাকি।

কাঙালি : ওখান থেকে ফুলবেড়ে এসেছ?

আমিনা : হ্যাঁ। আমার আব্বা গাঁ ছেড়ে চলে এসেছে।

কাঙালি : কাজের খোঁজে?

আমিনা : হ্যাঁ। আমরা সেখানে আর যাব না। আমাদের একটা গোরু ছিল।

কাঙালি : কেন?

আমিনা : ওখানে কাজ নেই। গায়ের জমিদারটাও খুব খারাপ। মহেশটাও মরে গেছে।

কাঙালি : মহেশ? মহেশ কে?

আমিনা : আমাদের যে একটা গোরু ছিল। তার নাম মহেশ।

কাঙালি : (*হেসে ওঠে*) গোরুর নাম মহেশ? হি হি হি হি

আমিনা : হাসছ কেন? হাসলে কিন্তু আমি কিচ্ছু বলব না।

কাঙালি : না না। আর হাসব না। এই নাও। মুড়ি খাও।

(*মুড়ি খেতে খেতে দুজনের গল্প*)

আমিনা : জানো, মহেশকে না আমার আব্বা খুব ভালোবাসত। নিজে না খেয়ে মহেশকে খাওয়াত।

কাঙালি : তোমার বাবা কী করত?

আমিনা : আমাদের জমি ছিল। কিন্তু যা খরা! ধান সব শুকিয়ে খড়। আব্বা তো বেশি খাটুনি করতে পারত না। পেটে ভাত নেই, তার উপর জ্বর জারি তো লেগেই আছে।

কাঙালি : ওঃ! কী রোদ দেখেছ। ঘেমে যাচ্ছি।

আমিনা : আমাদের গাঁয়ে তো খুব খরা, একফোঁটা পানি নেই। অনেক দূরে একটা পুকুর থেকে পানি আনতাম। সবচেয়ে মুশকিল হলো মহেশের। তারজন্য পানি কোথায় পাবো?

কাঙালি : আমারও তেষ্টায় যেন ছাতি ফেটে যাচ্ছে। চল্ আমিনা ওদিকে একটা পুকুর দেখেছি। চল্ ওখানে যদি জল পাওয়া যায়।

আমিনা : আব্বু এসে যদি না দেখে আমাকে?

কাঙালি : আমরা তো দেরি করব না। যাবো আর আসব। চল্ যেতে যেতে তোর গায়ের কথা শুনব।

(*ওরা চলে যায়*)

(*মঞ্চে দেখা যায় আগের একটি ঘটনা। জমিদার বসে আছে। নায়েব হিসাব মেলাচ্ছে*)

জমিদার : এবার তো আদায়পত্র তেমন হয়নি দেখছি। (*উঠে পায়চারি*) কী কর তোমরা, এ্যাঁ!

নায়েব : বড্ড খরা পড়ে গেছে হুজুর। ধান খুব কম। —

(*দারোয়ান গফুরকে নিয়ে ঢোকে*)

দারোয়ান : নিয়ে এসেছি হুজুর।

জমিদার : কাকে? ও, গফরা? তুই কি সাপের পাঁচ পা দেখেছিস?

গফুর : কেন হুজুর। আমার কী কসুর হয়েছে? আমি তো —

জমিদার : তুই নস, তোর মহেশ।

গফুর : কী করেছে আমার মহেশ?

নায়েব : কী করেনি বল্? বাবুর উঠোনে ঢুকে সব গাছ মুড়িয়ে দিয়েছে তোর মহেশ। উঠোনের চাতালে ধান শুকোচ্ছিল, সব খেয়ে শেষ করেছে।

দারোয়ান : আমি তো ধরতে পারলে মেরে ঠেং ভেঙে দিতাম। ধরতে গেলাম অমনি এক গুঁতোয় হুজুরের ছোটোমেয়েকে ফেলে দিয়ে ছুটে পালাল।

জমিদার : এবার? কী বলবি বল্ হারামজাদা।

গফুর : দেখুন হুজুর, মহেশ দোষ করেছে, ঘাস জল না পেলে ওরা সামনে যা পায় খেতে চায়। কিন্তু আমাকে আপনি গালাগালি করছেন কেন?

জমিদার : কী? কী বললি?

গফুর : আমি সাচ্ বলছি হুজুর। আমি এখানে খাজনা দিয়ে বাস করি। কারো গোলাম নই।

নায়েব : হুজুরের মুখের উপর এতবড়ো কথা বলতে সাহস হয় কী করে তোর গফরা?

জমিদার: ফট্কে-কে ডাক। তোরা ব্যাটাকে বেঁধে চাবুক লাগা। খাজনা দেওয়া বের করছি দাঁড়া। *(গফুরকে বেঁধে চাবুক লাগাতে থাকে) (দৃশ্য মিলিয়ে যায়। দেখা যায় মঞ্চে আমিনা ফুঁপিয়ে কাঁদছে)*

কাঙালি : কাঁদিস নে। কাঁদিস নে বোন, চোখ মোছ। তারপর কী হলো?

আমিনা : সেদিন ভোর রাতে আব্বা আমাকে ডেকে তুলল। বলল — আমিনা, চল, আমরা চলে যাব। আমি বললাম কোথায়। ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করব। এ গাঁয়ে আর থাকব না।

কাঙালি : সব ওই শয়তান জমিদারের দোষ। *(দাঁড়িয়ে পড়ে)* বুঝলি আমিনা, আমাদের গাঁয়ের জমিদারটাও ওরকম, একটুও মায়াদয়া নেই। আমার বাবাকে ওদের দারোয়ান মেরেছিল, তাই বলতে গেলাম, আমার কথা তুলল না। আমাদের উঠোনের গাছটা বাবা কাটতে যাচ্ছে অমনি দারোয়ান হেঁকে উঠল — *(আগের দৃশ্য)*

নেপথ্যে দারোয়ান : এ রসিক, শালা একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস? চল্ শালা হুজুরের কাছাড়িতে।

(মঞ্চে দেখা গেল জমিদার বসে আছেন। নায়েব সদ্যমৃত জমিদার-গিন্নির শ্রাদ্ধের হিসাবপত্র করছে)

জমিদার : নায়েব, তোমাদের গিন্নিমার কাজের ফর্দ শেষ করেছ? কীরকম লাগবে বলে মনে হয়? আরে! ওটা কে ওখানে? দেখো তো নায়েব?

(কাঙালিলি গুটি গুটি পায়ে ঢোকে)

নায়েব : একটা বাচ্চা ছেলে। এই এদিকে আয়। তুই অভাগীর ব্যাটা ক্যাঙ্লা না?

কাঙালি : আজ্ঞা হ্যাঁ।

জমিদার : তুই এখানে কেন? কী চাস তুই?

কাঙালি : আজ্ঞা দারোয়ানজি আমার বাবাকে মেরেছে।

জমিদার : মেরেছে বেশ করেছে। ব্যাটা খাজানা দেয়নি বুঝি? দেখো তো নায়েব ওর ক'মাসের খাজানা বাকি?

কাঙালি : আজ্ঞা না ঠাকুরবাবু। বাপ আমাদের উঠোনের বেলগাছটা ....

নায়েব : কাটছিল? কেন? গাছটা কাটতে গেল কেন?

কাঙালি : আজ্ঞা আমার মা মরেছে কিনা। তেনার মুখে আগুন দিতে হবে। মা আমায় বলে গেছে। ছেলের হাতে আগুন পেলে মা আমার গিন্নি ঠাকুরুণের মতো সগ্‌গে যেতে পারবেন।

নায়েব : দেখো কান্ড! গিন্নিমা আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী তিনি স্বর্গে তো যাবেনই। তা বলে তোর মা —!

জমিদার : আজকাল সব ব্যাটাই স্বর্গে যেতে চায়, বুঝলে না নায়েব? না না, গাছটাছ হবে না। আজ বাদে কাল আমারই কত কাঠের দরকার।

কাঙালি : আজ্ঞা ওটা আমাদের গাছ, আমার মা নিজের হাতে পুঁতেছে।

নায়েব : তোর মা লাগালেই হলো। জানিস না, এ গাঁয়ের সবকিছু জমিদারবাবুর সম্পত্তি। তোরা কী জাত?

কাঙালি : আজ্ঞা আমরা দুলে। *(এগিয়ে আসতে চায়)*

জমিদার : দুলে বাগদির মড়ায় কাঠ কী হবে? এদিকে আসিস না। নীচু জাতের ছোঁয়া লাগলে সব অপবিত্র হয়ে যাবে। ওরে, আমার চানের জল দে। *(চলে যায়)*

কাঙালি : আজ্ঞা আমার মায়ের মুখে আগুন দেবো না ? মা সগ্‌গে যেতে পাবে না ?

নায়েব : শোন্ শোন্। মাকে নদীর চরায় নিয়ে যা। এক আঁটি খড় জ্বেলে মুখে ছুঁয়ে দে। ব্যাস্। মুখে আগুন হয়ে গেল। তারপর চরায় পুঁতে দে গে। যা যা। কাজের বাড়ি। বিরক্ত করিস নে। *(কাঙালিচরণ বেরিয়ে যায়)*। ওরে কে আছিস, ওখানে একটু গোবরজল ছিটিয়ে দে।

(দৃশ্য মিলিয়ে যায়। মঞ্চে এখন কাঙালি। এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে কি স্বর্গের রথে তার মাকে খুজছে ?)

আমিনা : *(তার কাছে গিয়ে)* ক্যাঙ্‌লাদা। তোমার চোখে পানি পড়ছে। মুছে ফেল ক্যাঙ্‌লাদা। *(কাঙালিলি আমিনার দিকে মুখ ফেরায়। আমিনার চোখেও জল)* জান ক্যাঙ্‌লাদা, আমারও আম্মাজান মরে গেছে। সেই ছোটোবেলায়। মা না থাকলে খুব খারাপ লাগে, তাই না ?

কাঙালি : হ্যাঁ আমিনা, খুব কষ্ট হয়।

আমিনা : তারপর তোমরাও গাঁ ছেড়ে চলে এলে ? ওখানে থাকবে কী করে ? ওই জমিদারটাও তো খারাপ।

কাঙালি : আমার বাবা ভিন্ গায়ে থাকে। আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিল। আমি যাইনি। আমি গাঁ ছেড়ে চলে এলাম।

আমিনা : এখানে কী করবে ?

কাঙালি : কেন ? খাটব। কাজ করব। ওই দেখ আমিনা। কে যেন আসছে না এদিকে ?

আমিনা : হ্যাঁ। একটা ছেলে। দৌড়ে আসছে।

কাঙালি : আমাদের দিকে আসছে কেন ?

আমিনা : চলো আমরা লুকিয়ে পড়ি।

কাঙালি : দাঁড়া না। দেখি আগে ভালো করে।

(হাঁফাতে হাঁফাতে লালুর প্রবেশ)

লালু : এই কেউ যদি এসে জিজ্ঞেস করে আমার কথা বলবি আমরা দেখিনি। *(লুকিয়ে পড়ে) (দুর থেকে ডাক শোনা যায় — লা লু —। এই লে লো। লে লো —। দু-তিনবার ডেকে ক্রমে মিলিয়ে যায়। লালু বেরিয়ে আসে)*

কাঙালি : তোমার নাম বুঝি লালু ?

লালু : হ্যাঁ।

আমিনা : কারা খুঁজছে তোমাকে ?

লালু : আমাদের গাঁয়ের জমিদার মনোহর চাটুজ্জের লোক।

আমিনা : কেন ? ওরা খুঁজছে কেন ?

লালু : খুঁজবে না ? আমি যে জমিদারকে আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছি। বলে কিনা *(ভয়ার্ত জমিদারের কণ্ঠ নকল করে)* আমায় ছেড়ে দাও বাবা, আমি পাঁঠা নই, জেঠা — তোমার জেঠা হই। *(সবাই হেসে ওঠে)* চল্ ওই দোকানটায় চল্। জিলিপি ভাজছে। গরম গরম জিলিপি খাব।

আমিনা : আমার তো পয়সা নেই লালুদা।

লালু : ধেৎ, চল্‌তো — সে ভারি হাসির কান্ড। সব যেতে যেতে বলছি।

আমিনা : আমার আব্বা যে এখানে আমাকে দাঁড়াতে বলে গেছে।

লালু : ও তোকে ভাবতে হবে না। আমি তোকে তোর আব্বার কাছে ঠিক পৌঁছে দেব। চল্ আমার সাথে। *(তিনজনে চলে যায়)*

(মঞ্চে দেখা যায় জমিদার মনোহর চাটুজ্জে উদ্বিগ্ন, পায়চারি করছেন) (বলির বাদ্য শোনা যাচ্ছে। গুরুদেবের প্রবেশ)

গুরুদেব : কই হে মনোহর ? বলির কী হলো ? সময় যে ফুরিয়ে এল।

মনোহর : মনোহর কামারকে তো পাওয়া গেল না, সেই প্রতিবার বলি দিত। এবছর তার শরীর খারাপ। শুয়ে আছে।

গুরুদেব : তা পাড়ায় আর কেউ নেই ?

মনোহর : ওই লালু ছোকরাটাকে ডেকে পাঠিয়েছি। ছোটো হলে কী হবে ও পাঁঠা কাটতে পারে।

গুরুদেব : বড়ো বিপদ হে। মায়ের পূজোয় বলি না হলে যে বড়োই অশুভ হবে বৎস। দেখো। একটা কিছু করো।

মনোহর : এত রাতে ! কাকেই বা আর পাওয়া যাবে ?

(নেপথ্যে): এসে গেছে। লালু এসে গেছে।

মনোহর : এসে গেছে ! ওরে কে আছিস ! শাঁখ বাজা। ঢাক বাজা। (চলে যায়)

গুরুদেব : জয় ! জয় মা ! *(চলে যায়)*

(চিৎকার। ঢাকের বাদ্যি। খাঁড়া হাতে লালুর প্রবেশ। গলায় জবার মালা)

লালু : আর পাঁঠা কই ?

নেপথ্যে পুরোহিত : আর ত পাঁঠা নেই। ওই দুটোই তো —

নেপথ্যে : ফি বছর জোড়া পাঁঠাই তো বলি হয়।

লালু : না। তা হবে না। আরও পাঁঠা চাই। আমার মাথায় খুন চেপে গেছে। পাঁঠা না পেলে যাকে পাবো তাকেই বলি দেবো। *(লালু খাঁড়া দোলাতে দোলাতে চলে যায়। ঢাক বাজনা বন্ধ। প্রাণভয়ে সবাই ছুটে পালাতে থাকে। মঞ্চের এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যায়। মুখে না না চিৎকার —)*

— ওরে বাবারে। গেলাম রে!

— ওরে এ কী হলো রে?

— এদিকে আসছে যে — ও বাবা গো।

(মনোহর, গুরুদেবকে ছুটে পালাতে দেখা যায়। বিপরীত দিক থেকে ঢোকে লালু)

লালু : মনোহর চাটুজ্জে কোথায়?

মনোহর : *(আড়াল থেকে)* আমি — আমি —

লালু : *(চুলের মুঠি ধরে মঞ্চে নিয়ে আসে)* চল্। হাঁড়ি কাঁঠে ফেলব তোকে। চল্।

মনোহর : কেন বাবা, আমি তো পাঁঠা নই। আমি জেঠা। ভালো করে তাকিয়ে দেখো বাবা, আমি তোমার জেঠা হই। আমায় ছেড়ে দাও বাবা।

লালু : না। তোকে বলি দেবো। মায়ের আদেশ।

মনোহর : তা কী করে হয়? মা যে জগজ্জননী।

লালু : জগজ্জননী! সেটা তুমি বোঝো? পাঁঠাকে বলি দিচ্ছ মা ওদের জননী নয়?

মনোহর : ঠিক আছে বাবা। এই আমি নাক কান মলছি বাবা। তিনসত্যি করে বলছি — আজ থেকে কালীপূজোয় আমার বাড়িতে বলি বন্ধ।

লালু : যাও, তোমায় ছেড়ে দিলাম! গুরুদেব কই? পুরুত কোথায় গেল? *(দুজনের কাতর কণ্ঠে কান্না শোনা গেল)*

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। *(খাঁড়া ফেলে দেয়) (হাঃ হাঃ... পুরুত, গুরুদেব বেরিয়ে আসে)*

পুরুত : এ্যা!

গুরুদেব : খুন চাপা টাপা সব মিথ্যে?

মনোহর : এই বিশে। যা তো। ছোঁড়াটাকে ধরে নিয়ে আয়। দেখাব মজা। হারামজাদা বজ্জাত ছোঁড়া! যা। যেখান থেকে পারিস ধরে আন্।

(আগের দৃশ্য শেষ)

(মঞ্চে দেখা যায় ওরা তিনজন ঠোঙা থেকে কী খাচ্ছে)

আমিনা : তোমার খুব সাহস লালুদা।

কাঙালি : তোমার সত্যি খুন চেপেছিল?

লালু : দুর। ওসব না। আমার খুব রাগ হয়েছিল। ঘুম থেকে তুলে বলে কি না যেতে হবে — হুজুরের হুকুম। আমিও ঠিক করলাম হুজুরের হুকুম আজ দেখাচ্ছি। আরে! তোদের তো নাম জানি না। কে তোরা? এখানে কী করছিস?

(ওরা তিন জনে কথা বলতে থাকে মূকাভিনয় করে)

লালু : দুর বোকারা! জমিদার কখনো ভালো হয়? ওদের আচ্ছা করে জব্দ করতে হয়। চল্ আমিনা, তোর আব্বাকে খুঁজে দেখি। ঠিক পেয়ে যাবো। চল্। *(ওরা যেতে থাকে। পর্দা)*

(শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, লালু গল্পগুলি অবলম্বনে)



তারাদের জীবদ্দশা

সুশান্ত দাশ
দেওলী আদর্শ বিদ্যাপীঠ, পূর্ব মেদিনীপুর

সূর্য ছাড়া আকাশে বহু তারা দেখা যায়। অর্থাৎ আকাশটা হলো যেন তারার মেলা। ভর ও আয়তনের দিক থেকে বিচার করে আকাশের তারাদের পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এই পাঁচটি ভাগকে মনে রাখার একটি সুন্দর সূত্র আছে। সূত্রটি হলো — Oh! be a fine girl kiss me অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে বড় ও ভারী তারাগুলি হলো — O-Type, B-Type, A-Type, F-Type, G-Type, K-Type ও M-Type। মহাকাশে M-Type তারার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি, অর্থাৎ ছোট ও কম ভরের তারাদের সংখ্যাই সর্বাধিক। আবার এদের স্থায়িত্বকালও অন্যান্যদের চেয়ে বেশি। মহাকাশে যে সকল তারা আছে তাদের মধ্যে সূর্য হলো মাঝারী ধরনের তারা। অর্থাৎ G-টাইপের তারা। মহাকাশে এদের সংখ্যাও মাঝারী। সবচেয়ে বেশি থাকে K বা M টাইপের তারা।

মহাকাশে প্রতিনিয়ত অসংখ্য তারার জন্ম হয়, আবার মৃত্যুও হয়। যেমন করে একটি মানবশিশু কতকগুলি পর্যায় যেমন — বাল্য, কৈশোর, যৌবন কাটিয়ে বৃদ্ধে উপনীত হয় এবং একসময় মৃত্যুবরণ করে, তেমনি করে আকাশের তারারাও কয়েকটি পর্যায় বা দশা অতিক্রম করে মৃত্যুবরণ করে। কোনো ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় পর্যন্ত নেই।

প্রথম দশায় যখন কোনো নীহারিকার মধ্যে কোনো তারার জন্ম হয়, তখন গ্যাসীয় কণাগুলির ঘনীভবনের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন তাপ আবার পরিচলন পদ্ধতিতে অর্থাৎ গ্যাসীয় কণাগুলির চলাফেরার মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসে। এরফলে তারাটির ভেতরের প্রতিটি বস্তুকণা একটা বহির্মুখী বল অনুভব করে। আবার মাধ্যাকর্ষণ বল ঐ বস্তুকণাগুলিকে ভেতরের দিকে টেনে রাখার চেষ্টা করে। তারাটির মধ্যে এই দুই বিপরীতমুখী বল একই সঙ্গে কাজ করায় তারাটির ভিতর বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকে।

পরিচলন পদ্ধতিতে তারার কেন্দ্র থেকে যতই তাপ বেরোতে থাকে, বহির্মুখী বলের মান ততই কমতে থাকে। একসময় আসে যখন বহির্মুখী বলের চেয়ে মাধ্যাকর্ষণ বলের মান বেশি হয়ে যায়। এই বলের মান বেশি হওয়ার ফলে পরিচলন পদ্ধতি আর চলতে পারে না। শুরু হয় বিকিরণ পদ্ধতির। এই পদ্ধতিতে তারার কেন্দ্রের তাপ বস্তুকণাগুলির স্থান পরিবর্তন না করেই বাইরে চলে আসে। কিন্তু যখন মাধ্যাকর্ষ বলের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়, তখন বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ তারার কেন্দ্র থেকে বাইরে আসতে পারে না। এই ঘটনায় তারার ভেতরের তাপমাত্রা সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যায়। তাপমাত্রা এক কোটি কেলভিনে (এক কেলভিন সমান 273^0C) পৌঁছালে, তারাটির কেন্দ্রে শুরু হয় এক নিউক্লিয় বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়াকে বলা হয় তাপ নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়া যা এখন সূর্যের মধ্যে ঘটে চলেছে। এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে তারার কেন্দ্রে থাকা হাইড্রোজেন গ্যাসের নিউক্লিয়াসগুলি জুড়ে গিয়ে তৈরী করে হিলিয়াম। এরফলেও প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। ফলে প্রচুর তাপে তারাটির ঔজ্জ্বল্য যায় বেড়ে।

আবার প্রচুর পরিমাণ তাপ এক ধরনের চাপ বা বল সৃষ্টি করতে পারে। উজ্জ্বল তারাটিতে তাপের ফলে যে বল সৃষ্টি হয়, তা আবার ভেতরমুখী (কেন্দ্রমুখী) মাধ্যাকর্ষ বলকে প্রতিহত করতে পারে। তখন আর তারার সংকোচন হয় না। কিন্তু কেন্দ্রের হাইড্রোজেনের পরিমাণ যতই কমতে থাকে ততই ধীরে ধীরে মাধ্যাকর্ষ বলের মান আবার বাড়তে শুরু করে, অর্থাৎ তারা সংকুচিত হতে শুরু করে। এই সংকোচনে স্থিতিশক্তি রূপান্তরিত হয় তাপশক্তিতে। তাপশক্তির পরিমাণ বেড়ে গেলে এই তাপশক্তি তারাটির কেন্দ্রের বাইরে থাকা হাইড্রোজেনের স্তরকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বহুগুণ বড় করে তোলে।

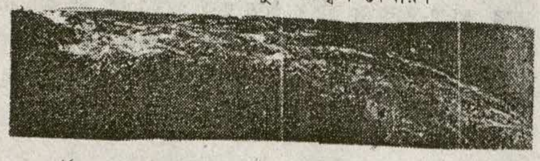
তারার আয়তন যতই বাড়তে থাকে, তাপমাত্রার পরিমাণ ততই কমতে থাকে। ফলে তারাটি তখন তার ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে পারে না, ধীরে ধীরে সে লালবর্ণ ধারণ করে। এই অবস্থার তারাকে বলা হয় 'লাল-দানব'। এখন তারার বাইরের দিক ফেঁপে গেলে কী হবে। ভেতরে ঠিক সংকোচন চলতে থাকে। সংকোচনের ফলে তারার কেন্দ্রে চাপ ও তাপমাত্রা দুই-ই বাড়তে থাকে। কেন্দ্রের তাপমাত্রা যখন দশ কোটি কেলভিনে এবং ঘনত্ব প্রতি ঘন মিটারে দশ কোটি কিলোগ্রাম হয়, তখন শুরু হয় 'আলফা বিক্রিয়া'। এই বিক্রিয়াতে

হিলিয়াম নিউক্লিয়াসগুলির যুক্ত হয়ে কার্বন, অক্সিজেন, নিয়ন, ম্যাগনেশিয়াম, মিলিফন, সালফার, লোহা ইত্যাদি ভারী মৌলগুলি তৈরী হয়। অর্থাৎ এই অবস্থাটার তার হলো ভারী মৌল উৎপাদনের কারখানা।

মানুষ চারটি প্রধান মৌল কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত। এই চারটি প্রধান মৌল তারার 'লাল-দানব' দশায় তৈরী হয়। সেইজন্যই বোধহয় বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ্ ফ্রেড বলেছেন, "আমরা সবাই তারকাচূর্ণ দিয়ে তৈরী।"

আলফা বিক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপ, হাইড্রোজেন সংযোজন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপের চেয়ে অনেক কম। প্রায় কুড়ি ভাগের মাত্র একভাগ। ফলে এই অবস্থায় তারার বাইরের তল থেকে যে পরিমাণ তাপের বিকিরণ ঘটে, সেই পরিমাণ তাপ তারার কেন্দ্রে তৈরী হয় না। সেইজন্যই ধীরে ধীরে তারাটি ঠাণ্ডা হতে শুরু করে। একসময় আসে যখন তারাটির মধ্যে আর তাপ উৎপন্ন হয় না। এই অবস্থায় তারাটির মধ্যে ঘনীভবনের জন্যে দ্রুত সংকোচন ঘটতে শুরু করে।

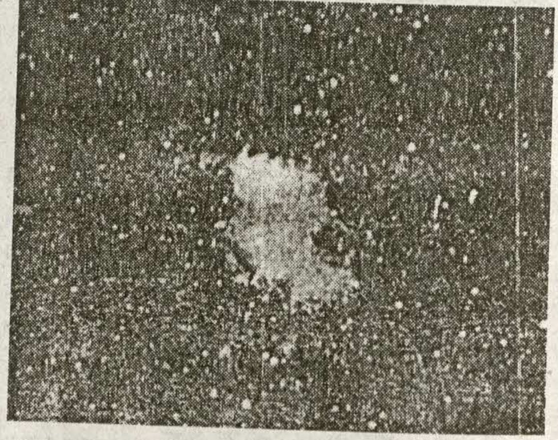
দ্রুত সংকোচন ঘটলে তারাতে অল্পসময়ে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপ তারার কেন্দ্রের বাইরের দিকের হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে তাপ-নিউক্লিয় বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম হয়। বিক্রিয়ার ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেই তাপ তারাটির বাইরের দিকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয়। এই বিস্ফোরণে তারার কিছু অংশ মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারার এইরূপ বিস্ফোরণকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'নোভা' বলে। এই সময়ও তারাটিকে আকাশের মধ্যে খুব উজ্জ্বল দেখায়।



সূর্যের মত মাঝারি তারাদের ক্ষেত্রে এই অবস্থায় মাধ্যাকর্ষ বলের মান বেড়ে যায়। ফলে তারাগুলি এতই ঘনীভূত হয় যে তাদের আয়তন প্রায় পৃথিবীর আয়তনের সঙ্গে সমান হয়ে যায়। অতি ঘনীভবনের ফলে তারার কেন্দ্রে প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় তারার বাইরের দিকের রঙ হয় নীলচে সাদা। তারার এই অবস্থাকে বলা হয় 'সাদা-বামন'। সাদা-বামন তারা ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণ করে, যখন ঠান্ডা হয় তখন তাকে দেখতে হয় কালো রঙের। এরূপ তারাকে বলা হয় কালো-বামন। কালো-বামন কালো হওয়ায় আকাশের বুকে একে দেখা যায় না।

সাদা-বামন দশায় তারার অস্তিত্ব বজায় রাখে ইলেকট্রন গ্যাসের চাপ। এই চাপ সৃষ্টি হয় প্রায় প্রতি ঘনমিটারে $১০^{৯}$ কিলোগ্রামের বেশি ঘনত্বে। অতি ঘনত্বে ইলেকট্রন (ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী কণা)দের মধ্যে অত্যন্ত বিকর্ষণ বল দেখা যায়।

যখন কোনো তারার ভর সূর্যের ভরের দেড়গুণের কাছাকাছি হয়, তখন তারাটি ইলেকট্রন গ্যাসের চাপকে উপেক্ষা করে মাধ্যাকর্ষ বলের প্রভাবে আরও সংকুচিত হতে থাকে। এই অবস্থায় বস্তুকণাগুলির পরমাণুর প্রোটন ও ইলেকট্রন পরস্পর যুক্ত হয়ে নিউট্রন কণা সৃষ্টি করে। তারাটি তখন পরিণত হয় নিউট্রন তারায়। আকাশে এইরূপ নিউট্রন তারা হলো নীহারিকার কেন্দ্রের তারাটি। নিউট্রন তারার সাম্য অবস্থা বজায় রাখে নিউট্রন চাপ। নিউট্রন কণাগুলি একসঙ্গে থাকলে এই ধরনের চাপের সৃষ্টি হয়।



যদি তারার ভর সূর্যের ভরের তিনচারগুণ হয়, তখন নিউট্রন চাপও তারাটিকে সাম্য অবস্থায় রাখতে পারে না। ফলে তারাটি মাধ্যাকর্ষ বলের প্রভাবে আরো সংকুচিত হতে শুরু করে। এই অবস্থায় মাধ্যাকর্ষ বলের পরিমাণ এত হয় যে আলোকরশ্মি পর্যন্ত যে আকর্ষণ বলকে উপেক্ষা করে নির্গত হতে পারে না। তারার এই অবস্থাকে বলে কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল। আকাশে ব্ল্যাকহোলের অবস্থান জানার জন্য, পাশাপাশি তারাদের মাধ্যাকর্ষ বলের প্রভাবে গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল-ই তারার অন্তিম দশা। এরপর শুরু হয় আবার নতুন গ্রহ তৈরীর পালা।

আজ স্বপ্নের দিন

শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, প্রধান শিক্ষক
আনুলিয়া হাইস্কুল, *নদীয়া*

বড় হয়ে তুই কী হবি রে খোকা ? জীবন-লক্ষ্য কী তোর ?
সাফল্য নেই লক্ষ্যবিহীন কোন জীবনের ভিতর ;
এটা বুঝেছিল বলে না প্রতাপ জয় করেছিল চিতোর !

খোকা বলে ঃ জানি, জানি বলেই তো শিক্ষক হয়ে চাই মান,
জানি বলেই তো হতে চাই আমি আচার্য রাধাকৃষ্ণাণ।

শিক্ষক হবি ? জানিস কি তুই শিক্ষক মানেটা কী ?
শিক্ষক মানে—এমন জীবন যে জীবনে নেই ফাঁকি।
শিক্ষকই পারে পচাগলা কোনো সমাজকে দিতে ঝাঁকি।

খোকা বলে ঃ জানি, জানি বলেই তো হতে চাই আমি শিক্ষক
হতে চাই জ্ঞানী, হতে চাই গুণী, জীবনের সুনিরীক্ষক।

জানিস কি খোকা শিক্ষকতাটা পেশা নয় এক ব্রত।
শিক্ষকতার সঙ্গে সততা জড়ানো ওতপ্রোত,
সুশিক্ষকের মন সুবিশাল একটুও নয় ছোট।

খোকা বলে ঃ জানি, জানি বলেই তো তাঁকে করি আইডল,
জানি বলেই তো এখন থেকেই ছিঁড়ি সব শৃঙ্খল।

জানি বলেই তো প্রতিবার এই সেপ্টেম্বর পাঁচে,
শ্রদ্ধা মেশানো ফুল দিতে চাই তাঁদের পায়ের কাছে,
জানি সেখানেই পৃথিবীর সব স্বপ্নেরা জেগে আছে।

বাবা বলে ঃ বেশ তবে সে স্বপ্নে ভ'রে যাক চরাচর,
আগামী পৃথিবী পাক মানুষের উন্নত কারিগর
সে মানুষ হোক নোংরা-ওড়ানো দুরন্ত এক ঝড়।
সূর্য আনুক আরো উজ্জ্বল প্রভাত রবির কর।

এখনো শিক্ষক মানে সমাজের গভীর শিকড়

শিবাণী কুন্ডু-খাঁ
হলুদকানালী এস সি হাইস্কুল, *বাঁকুড়া*

ঝড় বাদলের আঁধার রাত
কাঁকর ভরা পিছল পথ।
তবুও এখনো শিক্ষক মানে সূর্যের তলদেশ থেকে উঠে আসা
সচল ব্যক্তিত্ব। ত্যাগ তিতিক্ষার ভরন্ত জোয়ার।
রুক্ষ প্রতিকূলতার পাহাড়সম বাধা
ভাঙে অনায়াসে,
ভাঙার মন্ত্র উচ্চারণ করে যায় বারে বার
বিরামবিহীন বাগ্‌যন্ত্রের অদ্ভূত প্রয়াসে।

ভোগ বিলাসের প্রাচুর্য তরঙ্গ
আজ উথাল ফেনিল।
সাগরযাত্রী শিক্ষক আজ দোলায়িত।
তবুও এখনো — পার খুঁজে নেয় অবহেলে।
ত্যাগ আর কর্তব্যবোধ দিয়ে
জয় করে সব শিশুমন
গড়ে তুলে সমাজের সুকঠিন ভিত।
উজ্জ্বল হাসিমাখা—
সুস্থ সমাজ শরীর।

এখনো শিক্ষক মানে মানবতার মূর্তবিগ্রহ
শুধু দৃষ্টান্ত
কত মাত্রাবাহী।
এখনো শিক্ষক মানে সব চাওয়া যেখানে
মহত্তম পাওয়াতে মিলায়,
সব প্রশ্ন যেখানে উত্তররূপী
পুষ্টি খুঁজে পায়।
এখনো শিক্ষক মানে—রাধাকৃষ্ণাণীয় ত্যাগে চলা-ভাবে বলা
উত্তরসূরী দল —
সমাজের গভীর শিকড়।

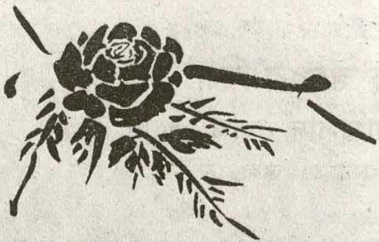
কবি, বেঁচে থাকেন চিরকাল

(সদ্যপ্রয়াত প্রিয় কবি শামসুর রাহমানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে)

বরুণচন্দ্র পাল, প্রধান শিক্ষক
কৃষ্ণনগর হাইস্কুল, *বাঁকুড়া*

আক্ষরিক 'মৃত্যু' নেই কবির ; কবি বেঁচে থাকেন
চিরকাল
...... মাটির গভীরে জাপটে থাকে যেমন শিকড় ;
বড় হতে হতে ক্রমশ মাথা তাঁর আকাশ ওপর—
.... ছুঁয়ে যায় সীমাহীন ব্যাপ্ততা ;
এপার-ওপার নেই—আছে পারাপারের সর্বকালের
সেতু —
.... ভীতু মানুষেরাও গা ঝাড়া দিয়ে বোধহয়
পেয়ে যায় সাহসে বাঁচার পরশপাথর !
হে কবি, তোমার বর্ণমালা যুদ্ধসময় হয়ে ওঠে
প্রতিবাদী ফেস্টুন....
কাকভেজা শিশিরের ঘ্রাণে ;
ভোরের আলোয় জেগে ওঠে নিরন্ন মানুষের মরমী ভাষা !





কবি শামসুর রাহমানের প্রতি ঃ বিদায় জানাতে হবে জেনে

মণীন্দ্রনাথ বাগ, সহ-শিক্ষক
কানাইলাল বিদ্যামন্দির, *হুগলী*

১. ক্রান্তির ক্লান্তি ঠেলে কবি
হেলন চেয়ারে বসে
প্রার্থনার মতো, কী অভিলাষ
সুধাও প্রকৃতিরে, শেষবারের মতো !
'উদার আকাশে
রৌদ্রের সমুদ্রে নিয়ে যাবে কে !'
পূর্বরাগের সমারোহ আসরে
অন্তিমরাগের আমন্ত্রণ পত্রে
কী লিখেছো কবি, উদাস মনে
কোন্ সুরে বাঁধো জীবনের জয়গান .....

২. ফেলে আসা শত—
স্থাপত্যের লিপিরেখা,
স্তব্ধ আলোর উচ্ছ্বাস,
তারুণ্যের বিলাসীসত্তা,
আকাঙ্ক্ষার গীতিমালা,
আলোকময় পথ ধরে
শুধুই কি ফিরে দেখা !

বর্ণচ্ছটায় পরিপূর্ণ আকাশ
মেঠোলালের বিস্তৃতি
সারাটা আকাশ মুড়ে দিতে চায়
সন্ধ্যা আসে ধীর পায়ে
পৃথ্বীরে প্রণতি জানায়।

ঝরা ফুল

(সৌমিক বসু স্মরণে)

সমীর ঘোষ, সহ-প্রধান শিক্ষক
মণীন্দ্রনগর হাইস্কুল, *মুর্শিদাবাদ*

নিঃশব্দে তোমার চলে যাওয়া,
অকালে ঝরে যাওয়া, বৃন্ত হতে ফুল—
মুহ্যমান শোকার্ত বৃক্ষের মতো,
আমরাও মানতে পারিনি,
অসহ্য অব্যক্ত এক বেদনায়,
খান্ খান্ হৃদয়ে জ্বলছে
প্রতিহিংসার আগুন।

প্রতিবাদ আর প্রতিরোধে
গর্জে উঠেছে ; তোমার সতীর্থরা
বাংলার ঘরে ঘরে।
নজিরবিহীন শাস্তির দাবিতে—
নাম গোত্রহীন, ছন্নছাড়া
কাপুরুষদের।
সৌমিক, তুমি দেখে নিও—
তুমি বেঁচে থাকবে,
আমাদের স্মৃতিপটে, চিরকাল।
'ওরা—যারা তোমায় ছিনিয়ে নিয়েছে,
ঘৃণা আর ধিক্কারে
ডুবে যাবে কালের গহ্বরে।
শুধু তুমি থাকবে বেঁচে ; ...... চিরকাল,
শৌর্যের সূর্যের মতো উজ্জ্বল।



অসমাপ্ত ছবি

গোলাম হোসেন, *উত্তর ২৪ পরগণা*

মোহনলাল মীরমদনেরা মায়ের জন্যে
চিরকাল নিজেদের উৎসর্গ করে রেখেছে
আর মীরজাফরেরা মানুষের হাজারো পদাঘাত সয়ে
সদাব্যস্ত তাদের অমানবিক নিষ্ঠুর খেলায়
রায়দুর্লভ জগৎ শেঠের উত্তরসূরীরা বণিকসভার বৈঠকখানায়
লুণ্ঠন সামগ্রীর গোপন বন্টন সেরে নেয়।

হে মহামায়া বিশ্বরূপা বসুন্ধরা
তুমি আর কত শিশু ও নরবলি চাও
এই তো সেদিন লেবাননে কোয়ানার সবশিশু দিলাম
তোমার ভণ্ড পূজারীদের এবার থামাও
স্বাভাবিক মা ডাক আর কে শোনাবে তোমাকে!

সনাতন সভ্যতার সাজানো বাগানে
সুবিন্যস্ত ষড়যন্ত্র বুকে হেঁটে চলে
তবুও প্রেমপ্রীতি ভালবাসা সন্দেহ সংশয়
আপন গতিতে এগিয়ে চলে আলো আঁধারে।
আচ্ছা, বিশ্বত্রাস হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে
ফিরেছে কি আজও!
কেউ তার ফেরার খবর পেয়েছে কখনও?

অনন্ত সময়ের আলপথ ধরে ধরে
উদাসী বিশ্ববাউলের একতারা ছুঁয়ে
জীবনের যত কথাকলি মানুষের কণ্ঠে
মুক্তির গান হয়ে ফেরে
নির্বাধ বাতাসের শরীরী সত্তায়।

বিশ্বের সৃজন শিল্পীরা
তাদের ত্যাগের উত্তরীয় জুড়ে জুড়ে
একটি অখন্ড চাদরে মানবতার ছবি এঁকে যায়
তাদের রেখা ও রঙের কাজ যদিও অসমাপ্ত আজও
কিন্তু একথা সবাই জানে বিশ্বময়
শিল্পীরা মানবসমাজে চিরকাল ছবি আঁকবে
ছবি আঁকতে তারা ভালবাসে
ছবি আঁকাই তাদের কাজ।



ফিরে এবার লেবানন থেকে

জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, *হাওড়া*

কথাগুলো
বাস্তুপুকুরে, দীঘিতে
জীয়োন রাখুন
ঘাই ফেলবে-ই।

সে কি ছুট!
প্রিয় বিশ্বায়নি আগমার্কা অক্সিজেন ভাঁড়ার নিয়ে
সঙ্গে চিড়বিড়ে সমঝোতার পাঞ্চলাইন
মধু-মধু স্বপ্ন-স্বপ্ন ফুলঝুরি-ফুলঝুরি
ভালো বেসে।

নামতে পারতো তো,
যা শক্তপোক্ত গাছ,
চিলতে খানিক ছায়া!
ঝুর ঝুর বন্ধু-বন্ধু ফল!

সাদাসিধে ভোলেভালা বিশ্বায়নে মিস্টি হাসির শ্রেষ্ঠ মানুষটি
কে জানত আজও উৎকুটে মরুঝড়! কয়লা তেমনটি হুবহু
দুরন্ত বেগে ধেয়ে আসা এক একটা বালির কণাই
সূচ বিঁধছে মুখে চোখে
ঘুরছে না, ছাই! ক্যামেরার জুমলেন্স
বালি ঢুকে
ফিরছি
বেরিয়ে
ভ্যালভ্যালে চোখ
কাশতে কাশতে
পুরে কার্বন ডাই অক্সাইড বিষাক্ত বমি-বমি গ্যাস
ঠাসা বুক।

পথ চলা

সপ্না সাহা
নারায়ণপুর হাইস্কুল, *দক্ষিণ ২৪ পরগণা*

চেনা বন্ধুরা কাছে নেই
মা কুয়াশা কুড়োতে সেই ভোরে বেড়িয়েছে
অঘোরে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা
আর আমি ভিজছি
নিজেকে খান্ খান্ করে ভিজছি
ভেজা মাটি আমাকে ডাকছে
প্রথম নারী হওয়ার দিন আমাকে ডাকছে
প্রথম মা হওয়ার মুহূর্ত আমায় ডাকছে

হারিয়েছি
কিন্তু দৌড়চ্ছি
চেনা অচেনা পথে
বন্ধুদের ভালবাসা, মায়ের কুয়াশা
মায়ের মমত্ব আঁচলে বেঁধে
যোজন যোজন পথ হাঁটব।

নাগাসাকি-হিরোশিমা

দাউদ হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক
শিবনগর হাইস্কুল, *মুর্শিদাবাদ*

আকাশের বুক চিরে তড়িৎগতিতে
নেমে এসেছিল পরমাণু দুটি বোমা
নাগাসাকি-হিরোশিমা শহরের বুকে
সহস্র বজ্রের মতো শব্দ হয়েছিল
আচম্বিতে ; পলকে পয়মাল হয়েছিল
দুটি শহরের নিষ্পাপ নাগরিক
তীব্র ঝলকে দুমড়ে মুচড়ে বিকৃত হয়ে
বহুতল ইমারত টুকরো টুকরো হয়ে
উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল আকাশের বুকে
পৃথিবী দাঁড়িয়েছিল নির্বাক মুখে ......

কাঁদারও মানুষ ছিল না কেউ—শুধু
ছিল বাতাসে বাতাসে বোবা কান্নার
উথাল পাথাল ঢেউ, পোড়া শহরের
বুক ভরে উঠেছিল সকরুণ হাহাকারে
সেদিনের কিছু লোক বেঁচে আছে শত
বেদনাকাতর স্মৃতি বুকে নিয়ে আজো!

হল্লাবোল

(সফ্‌দর হাসমিকে স্মরণ করে)

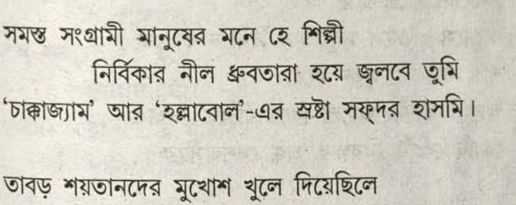
হীরেন পাল, সহ-শিক্ষক
রাজগ্রাম বিবেকানন্দ হিন্দু বিদ্যালয়, *বাঁকুড়া*

নিয়ত নিষ্ঠায় নতজানু, নিবেদিতপ্রাণ এক
অন্যায় আর অপলাপের বিরুদ্ধে 'কলম সজাগ'
প্রতি মুহূর্তে সোচ্চার প্রতিবাদে মুখর
সংগ্রামী চিন্তা আর চেতনার স্ফূরণ ঘটাতে যেন বদ্ধপরিকর।

শ্রমিক মজুরের মনে ও মজ্জায় বিবেকের বন্যার ঢেউ
আছড়ে পড়ে
রক্তে দোলা দেয়।
এই যার বাণী এই যার প্রাণ প্রত্যয় ও প্রেরণা
সে কখনো মরে না   সে কখনো মরে না
সে যে অমর অনন্তকাল।

সমস্ত সংগ্রামী মানুষের মনে হে শিল্পী
নির্বিকার নীল ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলবে তুমি
'চাক্কাজ্যাম' আর 'হল্লাবোল'-এর স্রষ্টা সফ্‌দর হাসমি।

তাবড় শয়তানদের মুখোশ খুলে দিয়েছিলে
এই অপরাধে তুমি 'বলি' হলে হে বীর
ওরা জানে না, হাজার হাজার হাসমির ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর
সর্বত্র সেই দৃশ্য, মজুরের হরতাল, পথনাটকে
তুলবে তুফান,   দিগ্বিদিকে কলরোল
'হল্লাবোল' ...... 'হল্লাবোল' ..... 'হল্লাবোল' .....।





স্মরণ

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক
জুজুড় উচ্চবিদ্যালয়, *বাঁকুড়া*

পূর্ণপাতায় শেষ আমটির মতো
ঝুলে থাকো একা ঈশান কোণে
বর্ষা তখন হয়তো সবেই শুরু
মাঠে তখন জমাটবাঁধা ঘাস
আগাছাদের সময় পোয়াবারো
এখন নিচে নামলে সর্বনাশ!
দোহাই তবে ওইখানেতেই থাকো
আমায় যেন আর ডেকো না ভুলে

এখন পারো উদোম গায়ে ছুটে
ঝাঁপ দিতে সেই কলস্বরার বুকে
দে-দৌড় দিয়ে ছুঁয়ে দূরের বুড়ি
আবার ফেরা রতন চূড়ার ঠাঁই?



সহযোদ্ধাদের প্রতি

আশুতোষ ঘোষাল, সহ-শিক্ষক
চিনপাই উচ্চবিদ্যালয়, *বীরভূম*

এ পৃথিবীতে আমাদেরই হবে জিত,
দিকে দিকে বাজে আমাদেরই সংগীত ;
রক্ত লিখেছে আমাদেরই সংগ্রাম—
দৃপ্ত বক্ষে জানাই লাল সেলাম।

ক্ষুদিরাম তুমি মোদের অগ্রদূত,
শহিদ ভগৎ বিপ্লব বিদ্যুৎ
শোণিতে মোদের বিদ্রোহী মুজফ্‌ফর,
সুভায় রয়েছে অন্তরে ভাস্বর।

আমরা না জানি শঙ্কা, না জানি ভয়
না রাখি মনে, কোনও সংশয়
কাস্তে মোদের প্রাণের ভাষা,
হাতুড়ি মোদের বল।

'সাম্রাজ্যবাদ'—দূর হঠো তুমি,
দূর হও 'সাম্প্রদায়িক'
এ মাটি কৃষক-লাঙলের ভূমি
সর্বহারা, বলশেভিক্।

লেনিন তুমি চেতনা মোদের,
মার্কস তুমি উদ্গাতা ;
মুক্ত কণ্ঠে জানাই মোরা,
বিপ্লব-ইতিকথা।

মুক্ত করো

বনানী সরকার
মহদীপুর উচ্চবালিকা বিদ্যালয়, *মালদহ*

অসহ্য বিষাক্ত কালো ধোঁয়া চারিদিকে —
প্রাণ মেলে যে নিঃশ্বাস নেব
তার ছিদ্রটুকু নেই! .....
কণ্ঠরোধ হয়ে আসে —
চোখ ফেটে জল
হৃৎপিণ্ডটা কেউ চেপে ধরে বলে
প্রাণ তোমার নেবই নেব!
ষাট বছর স্বাধীন আমরা —
পরাধীন আরও বহুবছর!
'৪৭-এর রক্তশ্মশান ছিঁটেফোঁটাও কি আর নেই?
ভুলে গেছে কি মানবিকতা দেশপ্রেম
ভারতবাসী —
সুভাষ, বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-কাজী নজরুলের?
সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে গরল যন্ত্রণা —
বাতাসে-বাতাসে সবুজহীন বিষাক্ত কলরব,
শান্ত করো, মুক্ত করো
আলো আরও আলো দিয়ে বাঁচতে শেখাও
কোটি কোটি নিরক্ষর অন্ধ দেশবাসীকে!



পাঠশালে রাখাল ছেলে

বংশীধর সাহু, সহ-শিক্ষক,
কংসাবতী শিশু বিদ্যালয়, *বাঁকুড়া*

রাখাল ছেলের লেখাপড়ার
গল্প বলি শোনো—
গল্প হলেও ঘটনাটি
সত্যি বলে জেনো।
শহর থেকে অনেক দূরে
অচিন পাড়াগাঁয়ে
এক কুটিরে লালু-কালু
থাকে যে দুই ভায়ে।
খেতমজুরের ছেলে ওরা
অভাবে দিন কাটে ;
পাঠশালাতে না গিয়ে তাই
গোরু চরায় মাঠে।
ওই বয়সের কত ছেলে
পাঠশালাতে যায় ;
লালু-কালু অবাক হয়ে
ফ্যালফ্যালিয়ে চায়।
একদিন ওরা গাঁয়ের মাথায়
পাঠশালারই পাশে
গোরুগুলো চরাচ্ছিলো
মাঠের সবুজ ঘাসে।

এমন সময় মাস্টারমশাই
গল্প বলার ছলে
ছেলেদের ওই পড়ার কথা
দিচ্ছিলেন যে বলে।

গল্প শুনে দু'ভাইয়েরই
লাগলো ভীষণ ভালো ;
মাঠের গোরু নিয়ে তারা
ঘরেই ছুটে গেলো।

ঘরে গিয়েই হঠাৎ করে
মায়ের কাছে বলে—
আমরা কেন গোরু চরাই,
যাই না গো পাঠশালে ?

প্রশ্ন শুনে বলেন মায়ে
ওরে হতচ্ছাড়া
গরিব ছেলের খালি পেটে
হয় না লেখাপড়া।
লেখাপড়া শিখতে লাগে
খাতা-কলম-বই,
তোদের বাপের কিনতে এসব
পয়সাকড়ি কই ?
অত কথা শুনেও তারা
হয় না মোটেই খুশি,
বরং পড়ার বায়না আরো
ধরে বেশি বেশি।
এমনি করে ক'দিন ধরে
কান্নাকাটি করে—
দু'ভায়েতে জেদের বশে
রইলো বসে ঘরে।
আর না উপায় পেয়ে মায়ে
বাবার গিয়ে বলে—
যা হয় হবে দু'ছেলেকেই
দিয়ে দাও ইস্কুলে।
বাবা তখন ভয়ে ভয়ে
ছেলে দুটো নিয়ে
ভরতি করে দিয়ে এলেন
পাঠশালাতে গিয়ে।
তখন থেকে দু'ভায়েতে
পাঠশালাতে যায়,
বিনা দামে বইপত্তর
সবই ওরা পায়।
রোজ দুপুরে পেটটি ভরে
খাবার যে পায় আরো,
লেখাপড়ার কষ্ট কিছু
হয় না তেমন কারো।
দু'ভায়েতে আনন্দেতে
করছে পড়াশোনা,
নতুন নতুন অনেক কিছু
হচ্ছে ওদের জানা।
প্রতিবছর লালু-কালু
উঠছে পরের ক্লাসে
কে জানে কী হবে ওরা
পড়াশোনার শেষে ?

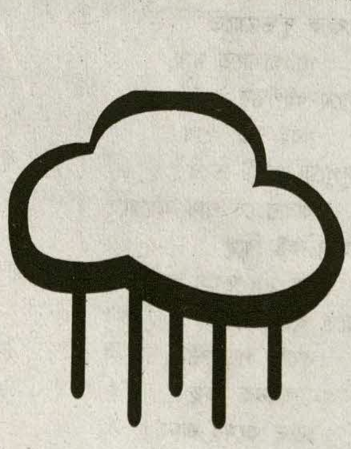
জীবনশৈলী

সুরঞ্জন চক্রবর্তী, কলকাতা



এক

মানবশিশুর বয়ঃসন্ধি অস্থির উদ্বিগ্ন
বোধের অভাবে জীবনছন্দে পদে পদে ঘটে বিঘ্ন!
দেহের বিকাশে হরমোনজাত স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য
কী ছিল কী হ'ল অজানা দ্বন্দ্বে কৈশোর পরিক্লিষ্ট!
জিজ্ঞাসাভারে বিড়ম্বিত অবোধেরা দোলাচলে
কুরুচি ভাবিয়া কহিতে পারে না পাছে কেহ কিছু বলে!
তাইতো লোকিত তরুণ-তরুণী শঙ্কিত লজ্জিত
রয় নির্বাক না বুঝে কারণ বিজ্ঞানবিবৃত!
বল্গাবিহীন ভোগান্বেষী বিশ্বায়নের ছোবলে
বিশ্বসমাজ শিকড়বিহীন সংস্কৃতির কবলে!
তারই নিট ফল চিত্তপ্রসাদে যৌনবিকার ব্যাভিচার
ইন্ধনে যতো মগজগোলানো বিজ্ঞাপনের বিস্ফার!
এ দুর্দিনে উদ্ধরণে শিশুমনে গড়ো যুক্তি
বিশ্লেষণেই যৌবন চায় ভ্রান্তির চিরমুক্তি!
জীবনশৈলী সে উদ্দেশ্যেই সময়ের গড়া হাতিয়ার
সঠিক প্রয়োগে নবীন-নবীনা পেতে পারে দ্রুত নিস্তার!
আমাদের দায় শুধু হওয়াটাই হাতিয়ার হাতে সৈন্য
শিখিবে তারাও আছে যারা আজও চিন্তাজগতে দৈন্য!



দুই

বিশ্বায়নের উগ্র বিষে মনুষ্যত্বের বিপর্যয়
বিশ্বজুড়ে সংক্রমিত মূল্যবোধের অবক্ষয়!
যুক্তিবাদ স্বার্থত্যাগ বিবেকবোধ মানবপ্রেম
এসব প্রায় অর্থহীন বৃথাই পাঠন '........ Ben Adhem!
নিরুদ্দেশ স্নেহমায়া জীবনাদর্শ মমত্ব
ভোগবাদীদের অবলম্বন হিংসাশ্রয়ী প্রভুত্ব!
সভ্যতার এ সঙ্কটে ত্রাহি ত্রাহি কোমল প্রাণ
জীবনশৈলী পাঠক্রমে সুনিশ্চিত পরিত্রাণ!
সেই লক্ষ্যে এই শিক্ষা সময়োচিত পদক্ষেপ
রূপদানে তার নয় সমীচীন গোঁফখেজুরের কালক্ষেপ!
জীবনশৈলী শিক্ষা মানে যৌনশিক্ষা সত্য নয়
জীবনশৈলী জীবনদায়ী ঘটায় দ্রুত বিষক্ষয়!

তিন

জীবনশৈলীর আর একটি দিক সুস্থ দেহ সুস্থ মন
খাদ্যাভ্যাস শরীরচর্চা স্বাস্থ্যবিধি যথাক্রম!
মাদকানীহ রোগসচেতন দৃঢ়চিত্ত আক্ষপাদ
উঠতি বয়স এমন হলে সবল সতেজ রয় সমাজ!
ফাস্ট ফুড ছিত ফল ঠাণ্ডা পানি ঝালমুড়ি
অকালমৃত্যু সংঘটনে সেই রেসিপির নেই জুড়ি!
কুসংস্কারমুক্ত মনে ভীতিপ্রদ রোগকে জয়
জীবনশৈলী শিক্ষাজ্ঞানে জন্মজীবন বিনির্ভয়!

রূপকথা

চিন্ময়ী দে

বেঙ্গমা বেঙ্গমী
ডালে বসে কথা বলল।
রাজপুত্র ভ্রুক্ষেপ করল না।

রাজকন্যা নিদ্রিত
দামী সোনারকাঠি হারিয়ে ফেলল
ঘুম ভাঙল না।

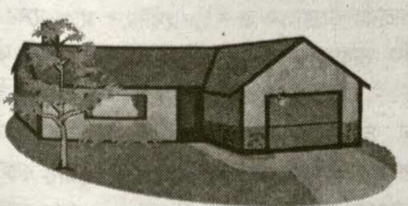
আখাড়ায় কুস্তিতে
সর্বাপেক্ষা বলবান হয়
এক আদিবাসী নারী।

ঋতু বদল ঘটে
সূর্যোদয় সূর্যাস্ত
শ্রবণ ক্ষমতা হারায়।

নবজাগরণে
ইংরাজী অক্ষর ঠেলে
বাংলা বর্ণপরিচয় জায়গা করে নেয়।

পুরনো আমলের চুন-সুড়কি
দিয়ে তৈরী বাড়ী
ঠাকুমার কাসুন্দি
অচল পয়সার জায়গা নেয়।

মহাশূন্যে যান
ভ্রাম্যমান দূরভাষ টিকিট
তবুও তবুও
'ঠাকুমার ঝুলি'
বেস্ট সেলারের জায়গা পায়।





একটি গান

দীনবন্ধু গণ্
বাণীভবন হাইস্কুল, *কলকাতা*

আকাশে এখনও ঝলসানো রুটি
চাঁদ ওঠে
এখনও মোরগ ধনীর দুয়ারে
খুদ খোঁটে

ঠিকানা জেনেও পায়নি খুঁজে
এ সমাজ তো
তাই প্রতিবুকে আজও
সাড়া তোলে সুকান্ত।

ক্ষয়রোগে ভোগে ক্ষয়িষ্ণু
এই সমাজটা
আঠারো বছর নাগপাশে
আজ বিপন্ন
হেমন্ত শেষ হয়নি তবুও
ধানকাটা
ফসলের বান ডাকেনি
হয়নি নবান্ন।

আগ্নেয়গিরি এখনও হয়নি জীবন্ত
তাই প্রতিবুকে আজও সাড়া তোলে সুকান্ত।

পৃথিবীর বুকে জঞ্জাল জমে/হল পাহাড়
মজুতদার আর মালিক জমায়/মৃতের হাড়
বিভীষণ দেশ বেচে দিতে আজ/তুলেছে ঝড়
জ্বলে নাই তবু দেশলাই কাঠি/নিরুত্তর
বারুদের স্তূপে ছেয়ে গেছে আজ দিগন্ত
আগুন জ্বালাতে তাই আরো চাই সুকান্ত
বারুদের স্তূপে ছেয়ে গেছে আজ দিগন্ত
আগুন জ্বালাতে ঘরে ঘরে চাই সুকান্ত।

সমিতি সংবাদ

পশ্চিম মেদিনীপুর

জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট ডেপুটেশন

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ডাকে জেলা শাখার উদ্যোগে এবং মেদিনীপুর সদর মহকুমা শাখার পরিচালনায় গত ১৭ই আগস্ট দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপেক্ষা করে মহকুমা শাখার ৯৩৩ জন সদস্য ও সদস্যা জমায়েতে অংশ নিয়েছেন। এই সমাবেশে জেলা শাখার সহ-সম্পাদক অশোক ঘোষ ও সমিতির সহ-সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। মহকুমা সম্পাদক সুবীর সিংহ ঐ সমাবেশের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং স্মারকলিপি পাঠ করেন। সদর মহকুমা শাখার সম্পাদকমন্ডলী ডি আই (এস ই) মহোদয়ের কাছে পেশাগত সমস্যাগুলির সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রস্তাব দেন। ডি আই সাহেব সমস্যা সমাধানে আরও আন্তরিক হবেন এই কথা জানান। মঞ্চে এসে তিনি তাঁর বক্তব্য সদস্যদের কাছে রাখেন। ডেপুটেশন চলাকালীন বক্তব্য রাখেন অশোক ঘোষ এবং জেলা সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য। সভানেত্রী বাসন্তী ভট্টাচার্য এবং সহ-সভাপতি মিলন দাস সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মেদিনীপুর গ্রামীণ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও বার্ষিক সাধারণ সভা

মেদিনীপুর গ্রামীণ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সমিতির জেলা দপ্তর গোলোকপতি ভবনে গত ৫ই আগস্ট সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়। শাখার অন্তর্গত ১৪টি বিদ্যালয় ইউনিটের মধ্যে ১২টি ইউনিটের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জেলা সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ ও জেলা কোষাধ্যক্ষ সুশীল গোস্বামী।

ঐদিন দুপুর ২-০০টা থেকে আঞ্চলিক শাখার দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা সমিতির জেলাভবনে শুরু হয়। অঞ্চলের স্থায়ী সভাপতি মিলন চন্দ্র দাস সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন।

সভার শুরুতে সভাপতিমন্ডলী, স্টিয়ারিং কমিটি ও অনুলিখন কমিটি গঠিত হয়। নেতৃবৃন্দ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে জোন এলাকার বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করেন।

এরপর আঞ্চলিক সম্পাদক নির্মল প্রামানিক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন এবং কোষাধ্যক্ষ প্রদ্যোৎ ষন্নিগ্রাহী এক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। ১৪টি বিদ্যালয় ইউনিট থেকে ২১৬ জন সদস্যের মধ্যে ৯০জন সদস্য/সদস্যাবন্ধু সভাতে উপস্থিত হন। তারমধ্যে ১২টি ইউনিট থেকে ১২ জন সদস্য প্রতিবেদনের উপর গঠনমূলক আলোচনা করে প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেন ও সমর্থন জানান।

জেলার অন্যতম সহ-সম্পাদক অশোক ঘোষ বক্তব্য রাখেন। তিনি বক্তব্যে সমিতির ৮৫ বছরের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করে বক্তব্য রাখেন। এরপর সদর মহকুমা সম্পাদক সুবীর সিংহ সদস্যবন্ধুদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে সমৃদ্ধ করেন।

সমিতির সহ-সম্পাদক ও জেলা সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য ও মহকুমা সহ-সভাপতি শিশির ত্রিপাঠী সভাতে উপস্থিত হন। এঁদের সকলের উপস্থিতিতে প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

আঞ্চলিক শাখাগুলির বার্ষিক সাধারণ সভা

মেদিনীপুর শহর আঞ্চলিক শাখা — গত ৫ই আগস্ট সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মালদানের মধ্য দিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ শুরু হয়। শহরের শ্রীশ্রী মোহনানন্দ বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় ২২৫ জন সদস্য ও সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। ২০০৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৫জনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জেলা শাখার সহ-সম্পাদক অশোক মন্ডল সভার উদ্বোধনী বক্তব্যে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ব্যবস্থাকে

ঠিক রেখে সংগঠনের প্রতি দায়বদ্ধতা আরও বৃদ্ধি করার কথা বলেন। জোন সম্পাদক গোবিন্দ খাঁনের পেশ করা সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ১২ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং জেলার সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য প্রতিনিধিবন্ধুদের আলোচনা শুনে তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় এবং প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য কী পদক্ষেপ সংগঠকদের গ্রহণ করতে হবে, নতুন প্রজন্মকে বেশি বেশি করে সভা-সমিতিতে নিয়ে আসা, তাদের নিয়ে শিক্ষাশিবির করা, শিক্ষার পণ্যিকরণের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করা প্রভৃতি তাঁর বক্তব্যে পরিস্ফুট হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় এবং সভাপতি ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

গোয়ালতোড় আঞ্চলিক শাখা — গত ৬ই আগস্ট সকাল ১০টায় হুমগড় চাঁদাবিলা হাইস্কুলে সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যদিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ শুরু হয়। মহকুমা শাখার সভানেত্রী বাসন্তী ভট্টাচার্য তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্য পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। সদস্যদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। S.S.C. থেকে আগত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রাইমারী সংসদ সভাপতি ব্রজ পড়িয়া তাঁর বক্তব্যে স্কুলছুটদের ধরে আনা এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে আরও আন্তরিক হতে আহ্বান জানান। সাধারণ সভায় মহকুমা সহ-সভাপতি শিশির ত্রিপাঠী ও সহ-সম্পাদক নির্মল প্রামানিক সাংগঠনিক বক্তব্য রাখেন। অরুণ রক্ষিত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনের উপর ৮ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদের আলোচনা শুনে মহকুমা শাখার সম্পাদক সুবীর কুমার সিংহ প্রতিনিধিদের সব প্রশ্নের উত্তর দেন। বি এড সমস্যা, মিউচুয়্যাল ট্রান্সফার, সাংগঠনিক শিক্ষাশিবির করা ইত্যাদি প্রশ্ন উঠেছিল। আগামীদিনে সংগঠন কীভাবে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানো যায় তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সুবীরবাবু। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সভাপতি সন্তোষ বিষুই ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন। ১৮টি ইউনিটের ১০৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মেদিনীপুর গ্রামীণ আঞ্চলিক শাখা — গত ৫ই আগস্ট সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হয়। সমিতির জেলা কেন্দ্রের হলঘরে ৯০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সাধারণ সভার উদ্বোধন করেন জেলা শাখার সহ-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি তাঁর বক্তব্যে আন্তর্জাতিক, জাতীয় পরিস্থিতি ব্যাখ্যার পাশাপাশি সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে মূল্যবান পরামর্শ দেন। সম্পাদক নির্মল প্রামানিক প্রতিবেদন ও কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করলে ১২ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদের ৪ জনের আলোচনা শুনে জেলা শাখার সহ-সম্পাদক অশোক ঘোষ তাদের প্রশ্নের উত্তর সহ সংগঠন ও পেশাগত সমস্যা নিয়ে সুন্দর বক্তব্য রাখেন। প্রতিনিধিদের আলোচনা শেষে সদর মহকুমা শাখার সম্পাদক সুবীর সিংহ সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। আগামী কর্মসূচির সফল রূপায়ণে সদস্যগণের অংশগ্রহণের উপর জোর দেন। জেলা নেতৃত্ব সুশীল গোস্বামী সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শিক্ষকদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানান। সভাপতি মিলন দাস সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শালবনী আঞ্চলিক শাখা - গত ৮ই আগস্ট বিকাল ৩টায় ভাদুতলা হাইস্কুলে সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ শুরু হয়। সমিতির জেলা শাখার সহ-সভাপতি গদাধর বারিক তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, জাতীয় পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। শিক্ষাকে পণ্য হিসাবে গণ্য করার জন্য কেন্দ্রের সমালোচনা করেন। রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতির প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। আঞ্চলিক সম্পাদক পরিমল মাহাতো প্রতিবেদন পেশ করেন। কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। প্রতিবেদনের উপর ৫ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদের আলোচনা শুনে সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য তাঁর দীর্ঘ, সাবলীল, সুন্দর বক্তব্যে সবাইকে আগামী দিনের কাজ সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করেন। এস এস সি থেকে আগত বন্ধুদের সমিতির প্রতি আনুগত্য আনতে প্রবীণদের আরো আন্তরিকতার সাথে মেলামেশা ও সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেন তিনি। নবীন বন্ধুদের পুষ্পস্তবক ও স্মারক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। অভিনন্দিত করেন সদর মহকুমার সম্পাদক সুবীরকুমার সিংহ। সুবীরবাবু তাঁর বক্তব্যে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন। আগামী ১২ই আগস্ট STFI-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে জমায়েত ও ১৭ই আগস্ট D.I (S.E) দপ্তরে অবস্থান ও জমায়েত-এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব

সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সভায় প্রাথমিক সংসদ সভাপতি ব্রজ পড়িয়া, মহকুমার সহ-সম্পাদক নির্মল প্রামানিক উপস্থিত ছিলেন। ২৫টি ইউনিট থেকে মোট ১৭০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

গড়বেতা আঞ্চলিক শাখা — গত ৯ই আগস্ট ধোবাবেড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়ে সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যদিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। আঞ্চলিক শাখার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারগুলি তুলে দেন জেলা সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য এবং সদর মহকুমা সম্পাদক সুবীর সিংহ। গণনাট্যের গড়বেতা শাখা ও ধোবাবেড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সঙ্গীত পরিবেশন করে। জেলা শাখার সহ-সভানেত্রী বাসন্তী ভট্টাচার্য উদ্বোধনী বক্তব্যে বর্তমান পরিস্থিতি ও সংগঠন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রয়োজনীয় বক্তব্য রাখেন। আঞ্চলিক সম্পাদক মনোরঞ্জন চক্রবর্তী প্রতিবেদন পেশ করেন এবং কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন। ২২টি ইউনিট থেকে মোট ১৬৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবেদনের উপর মোট ১৮ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদের আলোচনার মান খুবই ভাল ছিল। সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা শাখার সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য প্রতিনিধিবন্ধুদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সুন্দর, সহজবোধ্য এবং সাবলীল ভাষায় দেন।

আঞ্চলিক শাখার সভাপতি অমিয় ব্যানার্জী প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদনের প্রস্তাব রাখলে সদস্যগণ হাত তুলে সমর্থন জানন। সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

চন্দ্রকোণা রোড আঞ্চলিক শাখা— গত ৯ই আগস্ট ডাবচা নবকলা হাইস্কুলে সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যদিয়ে সভায় কাজ শুরু হয়। আঞ্চলিক শাখার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারগুলি তুলে দেন জেলা শাখার সহ-সভাপতি গদাধর বারিক। ১৮টি ইউনিট থেকে মোট ১২৪জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন করেন গদাধর বারিক। সম্পাদক সুভাষ মাজী সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। কোষাধ্যক্ষ তারাপদ রায় আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখেন। প্রতিবেদনের উপর ১৬ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। মহকুমা সম্পাদক সুবীর সিংহ আঞ্চলিক শাখার সভাপতি হিসাবে সভা পরিচালনা করেন। প্রতিনিধি বন্ধুদের সব প্রশ্নের উত্তর দেন জেলা শাখার সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য।

সদস্যগণ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন। আঞ্চলিক শাখার সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

কেশপুর আঞ্চলিক শাখা—গত ২৬শে আগস্ট কেশপুর অডিটোরিয়ামে কেশপুর আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যদিয়ে শুরু হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন গণআন্দোলনের রাজ্য নেতৃত্ব তরুণ রায়, সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক তথা জেলা শাখার সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য, জেলার সহ-সভানেত্রী বাসন্তী ভট্টাচার্য, মেদিনীপুর সদর মহকুমা শাখার সম্পাদক সুবীর কুমার সিংহ, সহ-সম্পাদকদ্বয় নির্মল প্রামানিক ও মনোরঞ্জন চক্রবর্তী এবং জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ সভাপতি ব্রজগোপাল পড়িয়া। চল্লিশটি ইউনিট থেকে ৪৩৮ জন সদস্য ও সদস্যা সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী ভাষণে ব্রজবাবু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আরও যত্নবান হতে এবং পাঠদান আরও আকর্ষণীয় করার পরামর্শ দেন। আঞ্চলিক সম্পাদক বিপদতারণ ঘোষ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের হিসার রাখেন। সভাপতিমন্ডলী ৮টি সাব-জোনের ৮ জনকে প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করার আহ্বান জানান।

প্রতিবেদনের উপর আলোচনার শেষে তরুণ রায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন জনজীবনে কী প্রভাব ফেলছে তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। সর্বশেষ বক্তা অপরেশ ভট্টাচার্য আলোচকদের প্রতিটি প্রশ্ন যথা সিলেবাস এবং গ্রেডেশন ও বি এড সমস্যাসহ ৮-১৬-২৪-এর সমস্যা, পেনসন ব্যবস্থার বেসরকারীকরণ সহ আরও সমস্যার উত্তর সাবলীলভাবে ও সহজবোধ্য করে তুলে ধরেন।

আঞ্চলিক সম্পাদক সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সভাপতিমন্ডলী সম্পাদক প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন করান।

মালদা

ইংরেজবাজার আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

ইংরেজবাজার আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় রায়গ্রাম উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত ২৭শে আগস্ট, রবিবার। অঞ্চলের ২৫টি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার প্রায় ১৩০ জন সদস্য-সদস্যাবন্ধু উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন। জেলা সভাপতি কাজল সরকার তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে

শিক্ষকদের সেকাল এবং একালের অবস্থা ও অবস্থানের পার্থক্য খুব সুন্দর ও সাবলীলভাবে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। এরপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন অঞ্চল সম্পাদক তাপস লাহা। তাঁর প্রতিবেদনে ছিল বিগত এক বছরে তাঁর অঞ্চল কী করতে চেয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তারা সাফল্য পেয়েছেন। অঞ্চলের বিগত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব সভায় উপস্থাপন করেন অঞ্চল কোষাধ্যক্ষ শান্তনু চ্যাটার্জী। এরপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাবের ওপর আলোচনা করেন অঞ্চলের ২৫টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৬টি বিদ্যালয় প্রতিনিধি। তাঁরা তাঁদের আলোচনার মধ্যে বিভিন্ন দাবি-দাওয়াও তুলে ধরেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক) শিক্ষাকর্মী নিয়োগে নিয়মিতকরণ, খ) মাসপয়লা বেতনপ্রদান, গ) বিদ্যালয়ে-বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের সংখ্যায় অপ্রতুলতাজনিত সমস্যা, ঘ) বেশকিছু বিদ্যালয় উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও পর্যাপ্ত শিক্ষক না পাওয়ায় পঠন-পাঠনে সমস্যা বৃদ্ধি, ঙ) বিদ্যালয়গত বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষ করে শিক্ষকদের পি এফ এবং পেনশনের ব্যাপারে বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) অফিসের অসহযোগিতা, চ) সার্ভিস বুক নিয়মিত করার ক্ষেত্রে উক্ত অফিসের প্রয়োজনীয় সাহায্য না পাওয়া, ছ) শিক্ষকদের বিশেষ করে এস এস সি দিয়ে চাকরিতে যোগদান করা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মিউচ্যুয়াল ট্রান্সফার অবিলম্বে চালু করা ইত্যাদি।

সবশেষে অঞ্চল সভাপতি বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত প্রতিনিধিদের সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জেলাশাখার উদ্যোগে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসে গণডেপুটেশন

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মালদা জেলা শাখা গত ২৩শে আগস্ট, বুধবার ডি আই অফিসে এক গণঅবস্থান ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালন করে। দুপুর ১২টায় শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলে বিকাল ৪·৪৫ মিনিট পর্যন্ত। উক্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় ১২০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী। এদিনের কর্মসূচিতে জেলা নেতৃত্বের সবাই উপস্থিত ছিলেন। সভার সভাপতিত্ব করেন সমিতির জেলা সভাপতি কাজল সরকার। অনুষ্ঠান শুরু হয় জেলা সম্পাদক তপন চক্রবর্তীর উক্ত ডেপুটেশনের কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে। এরপর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবর্গের বক্তব্যের মধ্যে যে দাবি-দাওয়াগুলি প্রকাশ পায় সেগুলির বেশকিছু যেমন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, আবার বেশকিছু দাবি ক্ষোভ আকারে বেরিয়ে আসে বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) অফিসের বিরুদ্ধেই। বেশকিছু কাজের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) অফিসের অহেতুক টালবাহানা বন্ধ করা ইত্যাদি।

উক্ত ডেপুটেশনে উল্লেখযোগ্য বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ১২ই জুলাই কমিটির জেলা তথা রাজ্য নেতা মলয় ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষ তথা শিক্ষকদের আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরেন। বিকাল ৩টা নাগাদ তপন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সমিতির মহকুমা তথা জেলা নেতৃত্বের এক প্রতিনিধিদল জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক তপন বসুর কক্ষে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য যান এবং ৪·৩০ মিনিট নাগাদ প্রতিনিধিদলের পক্ষে জেলার অন্যতম সহ-সভাপতি ভুবনকুমার ডেপুটেশনের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে শ্রীবসুর বক্তব্য সভায় উপস্থিত সমিতির সদস্য-সদস্যাদের জানান।

উত্তর দিনাজপুর

রায়গঞ্জ দক্ষিণ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

রায়গঞ্জ দক্ষিণ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ২০শে আগস্ট দেবীনগর গয়ালাল রামহরি গার্লস হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন আঞ্চলিক শাখার সভাপতি বিজনবিহারী দাস।

রায়গঞ্জ মহকুমা সম্পাদক বিপুল মৈত্র শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। আঞ্চলিক সম্পাদক রমেশ রায় সারা বৎসরব্যাপী সমিতির শিক্ষাপ্রসারে ও সুস্থ সংস্কৃতি বিস্তারে আঞ্চলিক শাখার বিভিন্ন উদ্যোগের কথা বলেন এবং বিভিন্ন ইউনিটের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার প্রশংসা করেন।

জোনের ২২টি ইউনিটের অধিকাংশ ইউনিটের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

জোন, মহকুমা, জেলাস্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে এবং আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

জোনের অন্তর্গত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের রাজীবলোচন পাল স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করার হয়।

রায়গঞ্জ দক্ষিণ আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৬শে আগস্ট রায়গঞ্জস্থিত জেলা সমিতিভবনে রায়গঞ্জ দক্ষিণ আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সম্পাদক রমেশ রায়।

রায়গঞ্জ মহকুমা সম্পাদক বিপুল মৈত্র বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ও সদস্য-সদস্যাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে সভার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। আঞ্চলিক সম্পাদক কেন্দ্রীয় সমিতি নির্ধারিত বিষয়গুলি লক্ষ্য রেখে তাঁর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন এবং কোষাধ্যক্ষ বাসব চ্যাটার্জী আয়-ব্যয়ের রিপোর্ট পেশ করেন।

জেলা সহ-সম্পাদক ভানুকিশোর সরকার ও রায়গঞ্জ উত্তর আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক প্রতীক চক্রবর্তী শিক্ষা আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন ও সদস্য-সদস্যাদের ভূমিকা এবং নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ঐতিহ্য সামনে রেখে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

জোনের ২২টি ইউনিটের প্রায় সমস্ত ইউনিটের সদস্যরাই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের রিপোর্টের উপর আলোচনা করেন। সংগঠনকে শক্তিশালী করে তাঁদের সহযোগিতার আশ্বাস এবং ১২ই জুলাই কমিটির যৌথ আন্দোলনে নিজেদের আরও সক্রিয় ভূমিকা থাকবে আশ্বাস দেন। প্রায় প্রত্যেকেই D.I of Schools (S.E), অফিসকে আরও সক্রিয় করার আহ্বান জানান।

জবাবী ভাষণে সম্পাদক রমেশ রায় সকলের কাছে আবেদন রাখেন যাতে শিক্ষাবিস্তারে আমাদের ভূমিকা আরও বৃদ্ধি পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে এবং সংগঠনকে আরও সক্রিয় রাখতে সকলের সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে।

হেমতাবাদ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সমিতির হেমতাবাদ আঞ্চলিক শাখার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা গত ১৯শে আগস্ট বাহারাইল ভুবনচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চের নামকরণ করা হয় 'কবি শামসুর রাহমান মঞ্চ'।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জোনের সভাপতি। রায়গঞ্জ মহকুমা সহ-সম্পাদক অমিয়কুমার চক্রবর্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন। জোনাল সম্পাদক অরুণকুমার পাল, সাংস্কৃতিক উপসমিতির সভাপতি নিত্যরঞ্জন ঘোষ এবং উপস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নৃপেন্দ্রনাথ মোহন্ত সমিতির সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার লক্ষ্য ও কর্মকান্ড সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।

এই সাংস্কৃতিক মঞ্চে এস এস সি থেকে আগত নবাগত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

জোনের অন্তর্গত ১৪টি বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ইউনিটই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অভিভাবক, অভিভাবিকা ও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ও উৎসাহ ছিল দেখবার মত। এলাকার মানুষের মধ্যে এর ব্যাপক সাড়া জাগে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এবং মানের ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিযোগিতায় স্থানীয় বাসিন্দাদের লোকসংস্কৃতিমূলক নৃত্যানুষ্ঠান ও রবীন্দ্র নৃত্যানুষ্ঠানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রদর্শনী সকলকে মুগ্ধ করে।

প্রতিযোগিতা শেষে নেতৃবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সার্টিফিকেট এবং জোন ও জোনের প্রধান শিক্ষকদের সৌজন্যে প্রাপ্ত পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন। জোনের অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে মাধ্যমিকে সর্বোচ্চনম্বর প্রাপককে পুরস্কৃত করা হয়।

আয়োজক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুনীলচন্দ্র বর্মণ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হেমতাবাদ আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

সমিতির হেমতাবাদ আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৭শে আগস্ট শাসন আর এন হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়।

"কবি শামসুর রাহমান মঞ্চে" মূল অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন জোনের অন্যতম সদস্য উৎপল ঘোষ।

সভার উদ্বোধন করেন প্রবীণ শিক্ষক অমিয়কুমার চক্রবর্তী। সম্পাদক অরুণকুমার পাল শোক প্রস্তাব পাঠ করেন এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন সম্পাদক এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয়।

উপস্থিত সমিতির জেলা সভাপতি ওমসেদ আলি সরকার, জেলা সম্পাদক কালীরঞ্জন চৌধুরী, জেলা সহ-সম্পাদক ভানুকিশোর সরকার, রায়গঞ্জ মহকুমা সভাপতি অনুকূলচন্দ্র ভৌমিক, মহকুমা সম্পাদক বিপুল মৈত্র সমিতিকে শক্তিশালী করার আহ্বান রেখে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন।

উপস্থিত সমস্ত বিদ্যালয় ইউনিটের সদস্যরা সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাবের উপর আলোচনা করেন ও

সংগঠনকে শক্তিশালী করার গঠনমূলক পরামর্শ দেন এবং নিজেদেরকে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির আশ্বাস দেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও সদস্যদের উপস্থিতি সন্তোষজনক ছিল।

বর্ধমান

পূর্বস্থলী আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পূর্বস্থলী আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৩ই আগস্ট, ২০০৬ জাহান্নগর কুমারানন্দ হাইস্কুলে। আঞ্চলিক শাখার ৩৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩০টি বিদ্যালয়ের মোট ২০০ ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী সহ এলাকার অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান নেতৃত্ব পারুলিয়া কুলকামিনী উচ্চবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জগদীশ কর।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক আনন্দগোপাল মন্ডল এবং সভাপতি গৌরগোপাল কর্মকার। অনুষ্ঠানে এলাকায় বিপুল সাড়া পাওয়া যায়।

পূর্বস্থলী আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পূর্বস্থলী আঞ্চলিক শাখার একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৭শে আগস্ট কাষ্টশালী নিভাননী উচ্চবিদ্যালয়ে। সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যদিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়।

শোক প্রস্তাব পাঠ এবং উদ্বোধনী সঙ্গীতের পরে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মহকুমা সম্পাদক সঞ্জিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শিক্ষার মানোন্নয়নে সমিতির দায়িত্ব ও কর্তব্য, এস এস সি থেকে আগত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমিতিতে যোগদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সমিতির প্রাণ সংগঠনকে আরো শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করার আবেদন জানান। তিনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংগঠনের প্রতি আরো যত্নশীল হতে বিশেষ করে বিদ্যালয় ইউনিটকে সক্রিয় করতে আহ্বান জানান।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক আনন্দগোপাল মন্ডল এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ তুষারকান্তি চক্রবর্তী।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর গঠনমূলক বক্তব্য রাখেন ১৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। আঞ্চলিক শাখার ৩৯টি বিদ্যালয়ের ১০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী যোগদান করেন।

জলপাইগুড়ি

রাজগঞ্জ আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২০শে আগস্ট রাজগঞ্জ আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা কেবলপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা



উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যদিয়ে সাধারণ সভার সূচনা করা হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন জেলা কমিটির সদস্য ভাস্কর ভট্টাচার্য।

এরপর সম্পাদক কর্তৃক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠের পর গত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন আঞ্চলিক শাখার কোষাধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ রায়। মাদ্রাসা বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন ধনপতি রায়।

এরপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা শুরু হয়। মোট নয়জন সদস্য প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সদস্যদের আলোচনায় যে সমস্ত বক্তব্য উঠে আসে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

১) ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যালয়গুলিতে কাজের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। অবিলম্বে ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষাকর্মী (করণিক) নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

২) অবিলম্বে শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণের জন্য 'মিউচুয়াল ট্রান্সফারের' ব্যবস্থা করা।

৩) মাধ্যমিকের খাতায় প্রথম পাতায় ইংরাজীতে নিয়মকানুন সম্বন্ধে লেখা থাকে। অবিলম্বে সেই নিয়মকানুন বাংলায়

প্রকাশ করা দরকার।

৪) পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক (সরকারী) শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বিতরণের ব্যবস্থা করা।

৫) মাদ্রাসা বোর্ডের অফিস উত্তরবঙ্গে স্থাপন করা।

৬) মাদ্রাসার পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা 'আরবি ভাষায়' বই পাচ্ছে না (সরকারি পাঠ্যপুস্তক), তা সঠিক সময়ে সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৭) বি এড পাঠরত শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

মহকুমা কমিটির পক্ষে সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করেন বিপ্লব শিকদার। জেলা কাউন্সিলের সদস্য সুনীল মল্লিক সমিতির পুরানো দিনের মূল্যবান দিন ও ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

মোট ৮৯ জন সদস্য ও সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক সাধারণ সভা আঞ্চলিক শাখার সভাপতি সমাপ্তি ভাষণের মধ্যদিয়ে শেষ হয়।

নদীয়া

জেলা শাখার উদ্যোগে কমরেড অমল ব্যানার্জীকে শ্রদ্ধায় স্মরণ

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, নদীয়া জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি ও সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সদস্য কমরেড অমল ব্যানার্জীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে সমিতির নদীয়া জেলা অফিসে গত ১৬ই আগস্ট, ২০০৬ এক সংক্ষিপ্ত সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির নদীয়া জেলা শাখার সহ-সভাপতি সুভাষ সরকার। কমরেড অমল ব্যানার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সুভাষ সরকার। স্মৃতিচারণামূলক বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক বীরেন মন্ডল। কমরেড অমল ব্যানার্জীর স্মৃতিরক্ষার্থে সমিতি অফিসের ত্রিতলে 'কমরেড অমল ব্যানার্জী স্মৃতিকক্ষ' নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জেলা সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

জেলা শাখার উদ্যোগে সমাবেশ ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-এর নিকট গণডেপুটেশন

সমিতির পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে গৃহীত কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের নিকট উত্থাপিত দাবিসমূহ সহ Died-in-harness category তে দ্রুত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, Embargo Free পদগুলিতে দ্রুত Prior Permission মঞ্জুরের দাবি সহ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক), নদীয়া অফিসের কর্মধারার সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে গত ১০ই আগস্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-এর নিকট গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশন দেবার পূর্বে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সমাবেশে ডেপুটেশনের মূল দাবিগুলি ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক বীরেন মন্ডল, জেলা সহ-সম্পাদক (পেশা) সুধন্য সরকার এবং জেলা সহ-সম্পাদক (সংগঠন) রণজিৎ মন্ডল। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি আবুল কাশেম সরকার। সমাবেশ থেকে জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সম্পাদক এবং মহকুমা সম্পাদক গণসম্মিলিত ভাবে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-এর



নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) স্মারকলিপি গ্রহণ করে সমাবেশে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নিকট আগামীদিনে তাঁর অফিসের কার্যধারার উন্নতির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। সমাবেশে ছয় শতাধিক শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

যৌথ উদ্যোগে স্কুল টিচার্স ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

STFI-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে গত ১২ই আগস্ট কৃষ্ণনগর শহরে সত্যপ্রিয় ভবনে জেলা এ বি টি এ এবং এ বি পি টি এ-র যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রারম্ভে STFI-এর পতাকা উত্তোলন করেন এ বি পি টি এ-র জেলা নেত্রী চন্দনা গোস্বামী। সভায়

প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা অধ্যাপক বাদল দত্ত। তিনি তাঁর ভাষণে শিক্ষার বেসরকারীকরণের ভয়াবহ বিপদ সম্বন্ধে শ্রোতৃমন্ডলীকে বিশেষ ভাবে অবহিত করেন এবং সমগ্র শিক্ষক সমাজকে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হবার আহ্বান জানান। সভায় উভয় সংগঠনের শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন এ বি টি এ-র জেলা সম্পাদক বীরেন মন্ডল। শ্রীমন্ডল তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে দাবিদিবসের তাৎপর্য এবং STFI-এর আগামী কর্মসূচিসমূহ ব্যাখ্যা করেন। উক্তদিন জেলার সকল বিদ্যালয়ে সমিতির সদস্যরা STFI-এর দাবিব্যাজ ধারণ করেন।

যৌথ উদ্যোগে ২২শে শ্রাবণ উদ্‌যাপন

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কৃষ্ণনগর পূর্ব আঞ্চলিক শাখা এবং গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, কৃষ্ণনগর শাখার যৌথ উদ্যোগে গত ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৬৬তম প্রয়াণ দিবসে কবিগুরুর রাশিয়া সফরের ৭৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সমিতির জেলা সম্পাদক বীরেন মন্ডল। আলোচনা সভার প্রধান বক্তা সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক প্রণব চট্টোপাধ্যায় পূর্বতন সোভিয়েত প্রেক্ষাপটে 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন। সভায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

রাণাঘাট আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির রাণাঘাট জোনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় আনুলিয়া উচ্চবিদ্যালয়ে গত ২০ আগস্ট। আবৃত্তি, সঙ্গীত, প্রবন্ধ, অঙ্কন, গল্প বলা, গল্পপাঠ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রভৃতি বিষয়ে মোট একাশিজন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। সবশেষে বিদ্যালয়ের মঞ্চে পুরস্কার বিতরণী সভায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জোনের সহ-সভাপতি অসীমকুমার মৈত্র। বক্তব্য রাখেন শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, গীতালি দত্ত প্রমুখরা। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যতনকুমার সাহা, দিব্যেন্দু দে, বিকাশ ভট্টাচার্য, শুভব্রত কর প্রমুখ সদস্যবৃন্দ। সকলকে ধন্যবাদ জানান জোনাল সম্পাদক ক্ষিতীশ সরকার।

উত্তর ২৪ পরগণা

বাগদা আঞ্চলিক শাখা আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও কৃতী সংবর্ধনা

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির বাগদা আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ১২ই আগস্ট হেলেঞ্চা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে হয়। এলাকার



মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, জুনিয়র হাইস্কুল এবং মাদ্রাসা মিলিয়ে ২৫টি বিদ্যালয় থেকে আসা দুইশতাধিক ছাত্রছাত্রী আবৃত্তি, সঙ্গীত, বসে আঁকো, প্রবন্ধ রচনা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এছাড়া ২০০৬ সালের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সমিতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন সমিতির আঞ্চলিক শাখার সভাপতি দীনবন্ধু মন্ডল। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ভাষণ দেন শাখা সম্পাদক অসিতকুমার দত্ত। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী মনীষা বিশ্বাস এবং অবনীভূষণ কাঞ্জিলাল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আঞ্চলিক শাখার সাংস্কৃতিক আহ্বায়ক এবং মামাভাগিনা বাপুজী বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণপদ ঘোষ।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মগরাহাট আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১৯শে আগস্ট মগরাহাট আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা মগরাহাট এ ও ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বপ্রথমে প্রিয় সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন নিখিল বঙ্গ

শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখার সম্পাদক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। উক্ত সাধারণ সভায় অঞ্চলের ২২টি বিদ্যালয়ের মোট ১৩৫ জন সদস্য ও সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

শোক প্রস্তাবের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন রায়। বার্ষিক সাধারণ সভায় খসড়া প্রতিবেদন পাঠ করেন শাখার সম্পাদক স্বপনকুমার বিশ্বাস। এরপর ১১টি বিদ্যালয় থেকে প্রতিনিধিরা খসড়া প্রতিবেদনের উপর গঠনমূলক ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন। জেলা সম্পাদক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সহ-সম্পাদক অপূর্ব মণ্ডল, পর্ষদ সদস্য ও ডায়মন্ডহারবার মহকুমা সম্পাদক অলোক ভট্টাচার্য, রবীন রায় প্রমুখ তাঁদের বক্তব্যে সাধারণ বিদ্যালয় কীভাবে আক্রান্ত হচ্ছে তা বর্ণনা করেন। শিক্ষায় বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে সমিতির ভূমিকা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের গুণগত মান বাড়িয়ে তুলে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান সম্পর্কে নবচিত্র ফুটে ওঠে।

মগরাহাট আঞ্চলিক শাখার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

মগরাহাট আঞ্চলিক শাখার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা গত ২৬শে আগস্ট মগরাহাট এ ও ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত হয়। ২২টি বিদ্যালয়ের মোট ১৫৫ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে অংশ নেয়। অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে ৫০ জন এবং শাখার সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যগণের উপস্থিতিতে এই প্রতিযোগিতা একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের রূপ নেয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সাংস্কৃতিক বিভাগের সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সিনহা। পরিশেষে শাখা সম্পাদক স্বপনকুমার বিশ্বাস বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন।

হাওড়া

উলুবেড়িয়া আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উলুবেড়িয়া আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে গত ১৩ই আগস্ট নোনা হাইস্কুলে অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয় ইউনিটের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬টি বিদ্যালয়ের মোট ১৫৪ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ছাত্রছাত্রী ছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মিগণ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিগত বছরের তুলনায় একদিকে যেমন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে অভিভাবকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির আঞ্চলিক শাখার সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির উলুবেড়িয়া মহকুমা শাখার সম্পাদক মানস দাস, সহ-সম্পাদক শ্রীচরণ ঘোষ, মহকুমা শাখার প্রাক্তন সম্পাদক সলিল সেনগুপ্ত, উলুবেড়িয়া আঞ্চলিক শাখার প্রাক্তন সভাপতি মহঃ আবদুল্লাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার প্রসার ঘটাতে তথা তাদের সুপ্ত প্রতিভা ও সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোর সার্বিক বিকাশে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব কী অপরিসীম তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক মহঃ ফারুক।

মহকুমা শাখার সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ঐক্যকে সুদৃঢ় করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। অতঃপর বিভিন্ন বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয় এবং শংসাপত্র প্রদান করা হয়। সর্বশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বীরভূম

খয়রাশোল আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গত ১৯শে আগস্ট খয়রাশোল আঞ্চলিক শাখার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় খয়রাশোল বালিকা বিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলা পরিষদের শিক্ষা-কর্মাধ্যক্ষ সাম্যসাধক সরকার। উদ্বোধনী বক্তব্যে বর্তমান ছাত্র সমাজে কীভাবে দূরদর্শনের বিভিন্ন অপসংস্কৃতিমূলক চ্যানেলগুলি সাংস্কৃতিক চেতনা-চিন্তা-ভাবনাগুলিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে তা ব্যাখ্যা করেন। তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে সমিতি যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক চেতনা, সৃজনশীল গুণগুলির পরিস্ফুটনের চেষ্টা করছে এবং তার প্রভাব সমাজজীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পড়ছে তা তুলে ধরেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক শাখার সভাপতি মোহনচন্দ্র ঘোষ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সমিতির কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যা শ্রীমতী অনিমা রায়, জেলা কাউন্সিলের

সদস্য সুনীল কর্মকার। জোনের ১৯টি বিদ্যালয়ের প্রায় ১৩০ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। সেই মঞ্চেই পুরস্কৃত করা হয় জোনের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক'০৬ সালের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র যথাক্রমে অরুণাভ রায় ও সুমিতকুমার নন্দীকে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জোন সম্পাদক বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় এবং সহ-সম্পাদক মহঃ ইউনুস।

মুরারই-১ আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২০শে আগস্ট মুরারই-১ আঞ্চলিক শাখার ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা মুরারই কবি নজরুল কলেজে আঞ্চলিক শাখার সভাপতি মহঃ কামারুজ্জমান কর্তৃক সমিতির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। অধিবেশন কক্ষে সভাপতিমন্ডলী, স্টিয়ারিং কমিটি ও অনুলেখন কমিটি গঠিত হয়।

সভার উদ্বোধন করেন রাজ্য কমিটির সদস্য ও মহকুমা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ওঝা। উদ্বোধক তাঁর ভাষণে ইউনিট স্তরের ভূমিকা, বিধানসভা নির্বাচনে বামপ্রার্থীদের বিজয়, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি ও ভর্তির সমস্যা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সময়ানুবর্তিতা, ও শ্রেণিপঠনের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোকপাত করেন।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক মনমোহন নন্দী। সভায় এস এস সি থেকে আগত ৪২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য এম এ এ মোবিন, তোরাব আলি ও রামপুরহাট-২ আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য। এস এস সি থেকে আগত ২ জন শিক্ষক বক্তব্য রাখেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ১৭ জন সদস্য। পেশাগত, বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমস্যা, শিক্ষা-কর্মী নিয়োগ, এস এস সি'র মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক ও সহ-শিক্ষক নিয়োগের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এরপর রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক মহঃ নূরজ্জমান ভাষণ দেন।

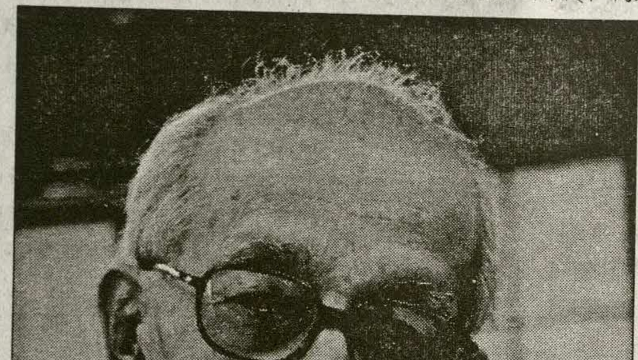
আঞ্চলিক সম্পাদকের জবাবী ভাষণের পর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সভায় অনুমোদিত হয়। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণের পর সভার কাজ সমাপ্ত হয়। সভায় অঞ্চলের ৮৯ জন সদস্য ও ২জন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের বন্ধু হাজির ছিলেন।

শোক

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের নির্ভীক সৈনিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী, শ্রদ্ধেয় কমিউনিস্ট নেতা কমরেড সুবোধ রায়ের জীবনাবসান

কমরেড সুবোধ রায় চলে গেলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দীর্ঘদিন কারাবাস বা দীপান্তরের সাজা পাওয়া কমিউনিস্টদের অন্যতম ছিলেন কমরেড সুবোধ রায়। তিনি গত ২৬শে আগস্ট, শনিবার রাত্রি ১০-৫০ মিনিটে পি জি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। বার্ধক্যজনিত অসুখে তিনি আক্রান্ত ছিলেন।

তিনি ১৯১৬ সালে চট্টগ্রামের এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন চট্টগ্রাম আদালতের নামকরা



উকিল। উদারচেতা এই মানুষটি সর্বদাই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সমর্থন করে গেছেন। তাই যখন পিতার বন্দুক চুরি করে ১৫ বছরের কিশোর সুবোধ রায় চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল এবং দীর্ঘদিন কারাবাসের সাজা পেয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন 'এরকম পুত্রের জন্য আমি গর্ব অনুভব করি'। এইরকম পিতার সুযোগ্য পুত্র হয়ে উঠেছিলেন সুবোধ রায়। জমিদার বংশের সন্তান হয়েও তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আন্দামানে কারাবাসে থাকাকালীনই কমরেড নারায়ণ রায় প্রমুখের সংস্পর্শে মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন। একটানা প্রায় দশবছর কারাবাসের পর ১৯৪০ সালে মুক্তি পেয়েই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং কমরেড মুজফ্ফর আহ্‌মদের নির্দেশে চট্টগ্রামে ফিরে পার্টির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। পরে তিনি পার্টির সর্বসময়ের কর্মী হন। স্বাধীনতার পরে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং পার্টির প্রাদেশিক দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দিল্লীতে জাতীয় মহাফেজখানায় ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। দু'বছর প্রচন্ড পরিশ্রমের পর প্রকাশিত হয় কমরেড সুবোধ রায়ের লেখা "কমিউনিস্ট ইন ইন্ডিয়া—আনপাবলিশড ডকুমেন্টস" নামে তিনখন্ডের গ্রন্থটি। তিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণ সে দেশে যান এবং সেখানকার মহাফেজথানায় কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণা করেন। ১৯৯৫ সালে পার্টির অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন থেকে রাজ্য কমিটির সদস্য হন। ২০০৫ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে সংবর্ধিত হন। সরল, অনাড়ম্বর ছিল তাঁর জীবন। তিনি ছিলেন সদালাপী, নিরহঙ্কারী মানবদরদী একজন প্রকৃত কমিউনিস্ট।

সানাইসম্রাট বিসমিল্লা খানের সানাই থেমে গেল

সুরের জগতের এক উজ্জ্বল শুকতারা নিভে গেল। যিনি হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারণ করেছিলেন— "যে সুর অন্তরাত্মা থেকে আসে, সে সুর সবকিছু করতে পারে। আমি তাই নিজেকে সঙ্গীতসাধনার কাছে উৎসর্গ করেছি, অন্যকিছু আশা করিনি"। সেই মহান সুরস্রষ্টা বিসমিল্লা খান গত ২১শে আগস্ট প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।



সানাইয়ের জাদুকরের শেষ ইচ্ছা ছিল দিল্লীর ইন্ডিয়া গেটের সামনে একবার বাজানো। ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির প্রতীক এই শিল্পীর জীবন ছিল অত্যন্ত অনাড়ম্বরে। যশ, অর্থের কোনো মোহই তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। তাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বারানসীর সরাই হারার গলির বসত বাড়ি ছেড়ে কোথাও থাকার কথা ভাবেননি। সুর সৃষ্টি, সুর সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ২১শে মার্চ বিহারের ডুমরাওয়ে তাঁর জন্ম। তাঁর পূর্বপুরুষরা ডুমরাওয়ের সামন্তরাজাদের দরবারে সানাই বাজাতেন। তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন তাঁর মামা আলি বক্স। ছোট থেকেই পড়াশুনার চেয়ে সুরের জগতকেই তিনি নিজের ভুবন বলে বেছে নিয়েছিলেন।

দেশ-বিদেশে অসংখ্য সম্মান তিনি পেয়েছেন। ২০০১ সালে তিনি 'ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত হন। তার আগে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছেন সাম্মানিক ডক্টরেট। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইরাক, ইরান সহ বহুদেশে সানাই পরিবেশন করে শ্রোতাদের সুরের মোহজালে আবিষ্ট করেছেন। আর এতেই ছিল তার যত আনন্দ। দারিদ্র্যের জ্বালা বুকে নিয়েও তিনি বলতে পারতেন— "সুর বিশুদ্ধ, তার সঙ্গে প্রতারণা করা চলে না, সেও কাউকে প্রতারণা করে না"। সুরের জগতে বিসমিল্লা খানের আসন চিরস্থায়ী।-

গ্রন্থাবলোকন

১। 'কথা না রাখার কথা'
বিদ্যুৎ ভৌমিক
আনন্দময়ী প্রকাশনী
৪২, পোস্টাল পার্ক, বাঁশদ্রোণী
কলকাতা-৭০, দাম ঃ ষাট টাকা

২। 'অনুপম নীরবতা'
মানস মন্ডল
প্রোরে নাটা
২১, ধর্মদাস কুন্ডু লেন, শিবপুর,হাওড়া
দাম ঃ তিরিশ টাকা

কবিতাচর্চায় মনস্কতার একটি বিশেষ অবস্থান আছে। এখন এই অনুশীলনে ছায়ার সংগে লড়াই অপেক্ষা নিজের ভাবনার সংগে প্রতি মুহূর্তের বিশ্লেষণ বিশেষ জরুরী। একটি লাইন ব্যবহারের আগে তার নিহিত সত্যাসত্য নিয়ে যাচাই করে নিতেই হয়। নইলে এই অন্তরঙ্গতা মাটি পায়না। হাজার লাইন কবিতা লেখাপেক্ষা মাটির কাছে, মানুষের কাছে যাবার ঐতিহাসিক অনিবার্যতা তাই বোধহয় সচেতন কবিতায় উঠে আসে। এটা একটা পক্ষ। অপর পক্ষে কৈবল্যবাদীদের জ্বালায় এই মানববন্ধন সবসময় যে যথার্থ অঙ্গীকারের আকাশ ছুঁয়ে যায় তা নয়। আর সেই বিবদমান দুই সত্তার লড়াই যেমন স্থানু না হয়ে চলতেই থাকে জীবনভোর তেমনই পাঠক উদ্ধার করে নেন সেই ছ্যাতা পড়া সত্যকেই। যা দিয়ে আগামীর লেখার পাতা সজীব হয়।

'কথা না রাখার কথা' কবি বিদ্যুৎ ভৌমিকের ৪ ফর্মার শক্ত মলাটের একটি আত্মকথন। যদি উচ্চারণ করি 'কেউ কথা রাখেনি' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) তাহলে যেমন বিসর্গ চিন্তনের দুঃখানুভব কবিকে তাঁর অষ্টপ্রহর ইষ্টনামের মতো একটি কঠিন সিদ্ধান্তকে অন্তরে স্থাপিত করে। এবং এরমধ্যে একপ্রকার নঙর্থক অভিজ্ঞতা কবিকে আগামীতে কিছু না বলার শক্তি জোগায়। তেমনই কবি বিদ্যুৎ ভৌমিক-এর 'কথা না রাখার কথা'য় একপ্রকার প্রশ্রয় থাকে। যেখানে তিনি সিদ্ধান্তে না গিয়ে অপরূপ অভিজ্ঞতাকে নিজের মধ্যেই ধরে রাখেন এবং অনুপুঙ্খ তন্ময়তায় উচ্চারণ করেন একটি 'ধ্রুপদী হৃদয়তান্ত্রিক উচ্চারণ'— 'সব শব্দ ঘুমিয়ে পড়ার পর ; নিঃশব্দরা চুপি চুপি জেগে ওঠে'। আর সেই নিভৃত অন্তরালে কবি রচনা করেন তাঁর অবসরের কবিতা প্রহর। কবির নাম কবিতায় একটি আদ্যন্ত স্পষ্ট অনুভূতি বারবার আমাদের ফিরে পড়ায়। এখানে একটি শপ্‌শপে ভিজে জলবায়ুর বৃষ্টিছাড়া মেঘ যেমন আছে তেমনই আছে তাকে অতিক্রম করে বৃষ্টি পতনের গান। তাই তাঁর স্পষ্ট এবং ব্যতিক্রমী লাইন 'যে পৃথিবী ভেজার কথা সে পৃথিবী ভেজেনি'। আর তাই 'যে কবিতা লেখার কথা সে কবিতা আসেনি'। এই ছট্‌ফটানি কিংবা আত্মখেদ দিয়েই কবি বেঁচে থাকেন। বেঁচে থাকে কবিতা। রিল্‌কে তাই তাঁর নিজের শ্রেষ্ঠ কবিতাটির জায়গায় একটি করে টাট্‌কা গোলাপ দিয়ে রাখতেন। আবার নিজেকে চিনতে চিনতে নিজের লেখা পড়তে পড়তে তিনি যখন লেখেন—'আমি যেন ভাঙছি নিজেকে, আমার প্রত্যন্ত গভীরের/সেল্‌গুলো অকপটে একই সঙ্গে ভাঙছে' (বৃষ্টি শেষে আবার বৃষ্টি) তখন এক উত্তরণ তাঁকে চিনে নিতে শেখায়। এখানে সত্য যাকে একটি নিপাট বুননের অভীপ্সায়। আর সেই উত্তরণ সত্য হয় আরও স্পষ্ট হয় তাঁর লেখায় 'আড়ালে অচ্ছুত্ জ্যোৎস্না, প্রচ্ছন্ন সতরঞ্জ জুড়ে/ কী ভীষণ উষ্ণ গন্ধে প্রাণ নড়ে জ্বলন্ত বৈধব্যে'। কথা উঠতে পারে কি সেই জ্বলন্ত বৈধব্য ! তা কি 'ধ্রুপদী কথোপকথন ঘর থেকে রাস্তায়' এসে মেলে ধরে 'অসমাপ্ত ডায়েরি'র পাতা। যেখানে রবীন্দ্রগানের পরামর্শ কবিকে ক্লান্ত করে। পরিশ্রান্ত হৃদয়ের উৎসে দিয়ে যায় নিবিড় ঐক্যের গান—'সে চলে গেল বলে গেল না, সে কোথায় গেল ফিরে এলো না'। তাঁর 'ছায়াপদ্য' এই ধরনের একটি মথিত অবগাহন হলেও 'মহল্লার অন্ধকার নিয়ে শিরীষ গাছ' হয়ে বেঁচে থাকে। অথচ আমরা ভুলে যাই 'বৃষ্টি কী অতীব জরুরি' (মৃত্যু তাঁকে ধাওয়া করেছে)। বেশ কিছু কবিতার শব্দচয়ন, বাক্‌মহিমা সর্বোপরি ছবিতার চিত্রধ্বনি খুব ক্লোজআপে কবিকে চিনতে সাহায্য করে তুল্যমানতার বিচারে কয়েকটি পারম্পরিক শব্দ সহযোদ্ধা অনেক সময়ই তাঁকে শব্দের কঙ্কাল উপহার দিয়েছে। শব্দচয়ন

এসেছে যত সহজে ভাবনায় অনেক কম ভারি তারা। এ প্রসঙ্গে 'অস্তিত্বের কদম ফোটাই গন্ধর্ব বিধিতে' কিংবা 'চৈতন্যে ফিরেছে প্রেমের সর্বনাশ'-এর মতো কবিতাগুলি মনে করাই। শব্দচয়নের আভিজাত্য অনেক সময়েই দুর্বল করে দেয় সামগ্রিক ভাবনাকে। তবুও কবি সতর্ক তাঁর কাব্যে। কারণ 'এখানে স্বপ্ন প্রবাহমান'। সবদিক দিয়ে কবি বিদ্যুৎ ভৌমিকের 'কথা না রাখার কথা' পেছন মলাটের আত্মস্তুতি বাদ দিয়ে ভালো লাগার। তাঁর কবিতা লেখার হাত আরও মজবুত হোক। আমরা পড়ার অপেক্ষায়। বইয়ের প্রচ্ছদ মনে ধরেনি।

আমার আলোচনার অপর কবি মানস মন্ডল। তাঁর 'অনুপম নীরবতা' কাব্যের কবিতাগুলিতে অনুপম মৃত্যুর মতো সেই অলংকারিক বিশেষণ যা কিনা জীবনকে বৃষ্টিপতনের মতো স্পর্শ করে যায় প্রত্যেক মুহূর্তে তারই ধারাবিবরণ অনুপম বোধ হয়ে ধরা দেয়। মানসের কবিতার অপর বিশেষত্ব খুব ছোট অবয়বে অনেক বড় ভাবনাকে তুলে আনতে পারেন তিনি। 'পোশাকের জন্মদিন' কবিতার যে রূপক তা শুধু কোনো এক বড় অনুভবের অনুপম নীরবতা নয়, বরং একে বলা যায় একপ্রকার অসহায়তাবোধ। যা শুধু জন্মদিনেই স্থিত হয়। আবার 'শরীরে জাগিয়ে রাখি প্রতিদিন/ প্রতিটি সকাল। আর/ প্রতিটি গভীর রাত জাগরণগুলি পাশে রেখে/ আমাকে জাগায় আরও, আরও অন্ধকারে' (অন্ধকারের উপকথা)। আসলে সেই অন্ধকারবর্জিত সকালের প্রত্যেক সজীব অনুভূতিগুলি জাগিয়ে রাখার মধ্যেই আমাদের বেঁচে থাকা মানিয়ে যায়। বিশ্বাসের সেই সরল মহাকর্ষটানে জীবন অভিমুখী সেই দায়বদ্ধতাই কবিকে ছুঁয়ে যায়। কবি মানসের ছন্দের তিন তিন ভাবনায় নিজেকে সামলে ওঠার এক অনবদ্য পত্রপুষ্প মনে হয় জীবনের বিশেষ ইঙ্গিতেই রচিত। আর তাই সেই সত্য ছুঁয়ে তিনি যখন লেখেন—'গহিন গাঙে গভীর মেঘে বিদ্যুৎ চমকালে/ পথ হারিয়ে পথকে আবার তারাই ধমকালে'। অন্ধকারকে ধমক দিয়ে আলোর স্পর্ধাতেই কবি নির্ভর করতে ভালবাসেন। এ কবিতার (শেষ কিস্তি) ছন্দ অন্তমিলে স্তব্ধ হয়ে থাকলেও তা কবির ইজেলকে মস্ত কেনভাসে রাঙিয়ে তোলে। জমিজিরেতের ফসল নিয়ে সরীসৃপ হয়ে যারা অভিমানকে আঁকড়ে বাঁচতে ভালবাসে তাদের জন্যে মানসের ট্রিপস্ 'রাতবিরেতে জাগেন নদী জাগেন জমিজিরেত'। 'সফলতাগুলি সব/ একে একে দিয়েছি ভাসিয়ে। নামটুকু ছিল/ ভেসে গেল তাও' (প্রত্যাবর্তন)। প্রত্যাবর্তনের এই সুরে কি তবে কবি বলতে চান রবীন্দ্রনাথের সর্বনাশের কথা। 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়' (রবীন্দ্রনাথ)। আমাদের সফলতা যেমন সিদ্ধির সমার্থক তেমনই তাকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো ত্যাগ করার অভ্যেসটুকুও আয়ত্ত করতে হয়। তাঁর 'পথের শেষে' কবিতার যে নীরবতা তা কিন্তু তাঁকে নীরব থাকতে দেয়নি। আর তাই তিনি লিখেও ফেলেন 'ঘরের মুখোশ থেকে নেমে গেছি পথের ভিতর'। আবার চলে যাবার (অসময়ে কিনা জানিনা) যে অভিপ্রায় যেখানে তিনি লেখেন 'চলে যেতে চাই/ ঘর ও বাহির থেকে একেবারে চলে যেতে চাই'। কিন্তু জীবন থেকে পালিয়ে এ বাঁচার মধ্যে কবি মানস তবে কি সেই অনুপম নীরবতাকে শীর্ষাসনে ধ্রুবক হিসাবে দেখতে/ দেখাতে চান! আমাদের সে ব্যায়ামে কিন্তু আপত্তি আছে। কারণ আমাদের তিমিরহন্তারক সত্তাই শেষপর্যন্ত টিকে থাকে জৈব জিজ্ঞাসার বাইরে। সমগ্রতার বিচারে কবি মানস মন্ডলের এ কাব্য আসলে এক নীরবতাকে ডিঙিয়ে অনেক কথা বলার আশ্চর্য জীবনমুখী পরিশ্রম। যা কবিকে অন্যদের সংগে আলাদা করে চেনায়। বই-এর প্রচ্ছদ 'অনুপম নীরবতার' সংগে অভাবিত ভাবে মিলে যায়। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

— অশোক অধিকারী



রাজ্যের অনুরোধে কেন্দ্রের অর্ডিন্যান্স, আপাতত স্বস্তি পাচ্ছেন বি এড ছাত্ররা

কলকাতা, ১৩ই সেপ্টেম্বর — ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশনের (এন সি টি ই) অনুমোদনহীন বি এড এবং বি পি এড কলেজগুলির ছাত্রছাত্রীদের অনিশ্চয়তা কিছুটা কাটালো কেন্দ্রীয় সরকারের অর্ডিন্যান্সের ফলে। গত ১১ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার বিভাগ এসংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স জারি করে এবং ৬ মাসের জন্য তা জারি থাকবে বলে জানায়। এই অর্ডিন্যান্সের ফলে যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এন সি টি ই আইন ১৯৯৩ অনুযায়ী যথাসময়ে অনুমোদনের জন্য দরখাস্ত করেনি তারা আবেদন করতে পারবে। দ্বিতীয় অনুমোদনহীন অবস্থায় যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান একাধিক পরীক্ষা নিয়েছে এবং সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা বি এড, বি পি এড পাস করে গেছে তারাও অতীতের সময়কে ধরে (রেট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট) আবেদন করতে পারবে। যদি সেই সমস্ত শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অনুমোদন পায় তবে তা হবে রেট্রোস্পেকটিভ এফেক্টে। তৃতীয়ত যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান দরখাস্ত করেছিল এবং যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এন সি টি ই তরফে পরিদর্শন হয়েছিল কিছু অনুমোদন পায়নি তারা ফের অনুমোদনের আবেদন করতে পারবে।

প্রসঙ্গত এন সি টি ই-র অনুমোদন না থাকায় কলকাতা হাইকোর্ট বেশ কিছু বি এড এবং বি পি এড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বৈধ নয় বলে ঘোষণা করে। এর ফলে ঐ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত ছাত্রছাত্রী, এমনকি উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রছাত্রীরা সঙ্কটের মধ্যে পড়েন। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে চলতি শিক্ষাবর্ষে বহু শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত পরীক্ষাসূচী বাতিল হয়ে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থের কথা ভেবে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আরজি জানায়। তারই ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রীয় সরকার গত ১১ই সেপ্টেম্বর 'এন সি টি ই অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যান্ড ভ্যালিডিটিয়েশন ২০০৬' অর্ডিন্যান্স জারি করে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ সম্পর্কে বুধবার রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই অর্ডিন্যান্স ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্কট দূর করবে। সামগ্রিকভাবে শিক্ষক শিক্ষণ ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে তার দূরীভূত হবে। রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে জানিয়েছেন, এটা ঠিক এই অর্ডিন্যান্সের ফলে আপাতত সুবিধা পাওয়া যাবে। যাঁরা অসুবিধায় ছিলেন তাঁরা সুযোগ পাবেন। কিন্তু এর একটা সুদূরপ্রসারী দিক আছে। কারণ এতে রাজ্যের অধিকার চলে যাবে। তাই আইনে পর্যবসিত হওয়ার আগে এটা নিয়ে আলোচনা দরকার।

কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন অ্যাক্ট-র চ্যাপ্টার ৪এ কয়েকটি বিষয় যুক্ত করে সংশোধন করে এবং অর্ডিন্যান্স জারি করেছে। মূলত ৪টি বিষয় এই সংশোধনীতে যুক্ত করা হয়েছে।

সৌজন্যে ঃ গণশক্তি, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬

প্রতিবেদন

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত সমিতি ভবনে মাদ্রাসা শিক্ষামন্ত্রী আবদুস সাত্তারের সম্বর্ধনা ও মাদ্রাসা শিক্ষা কনভেনশন

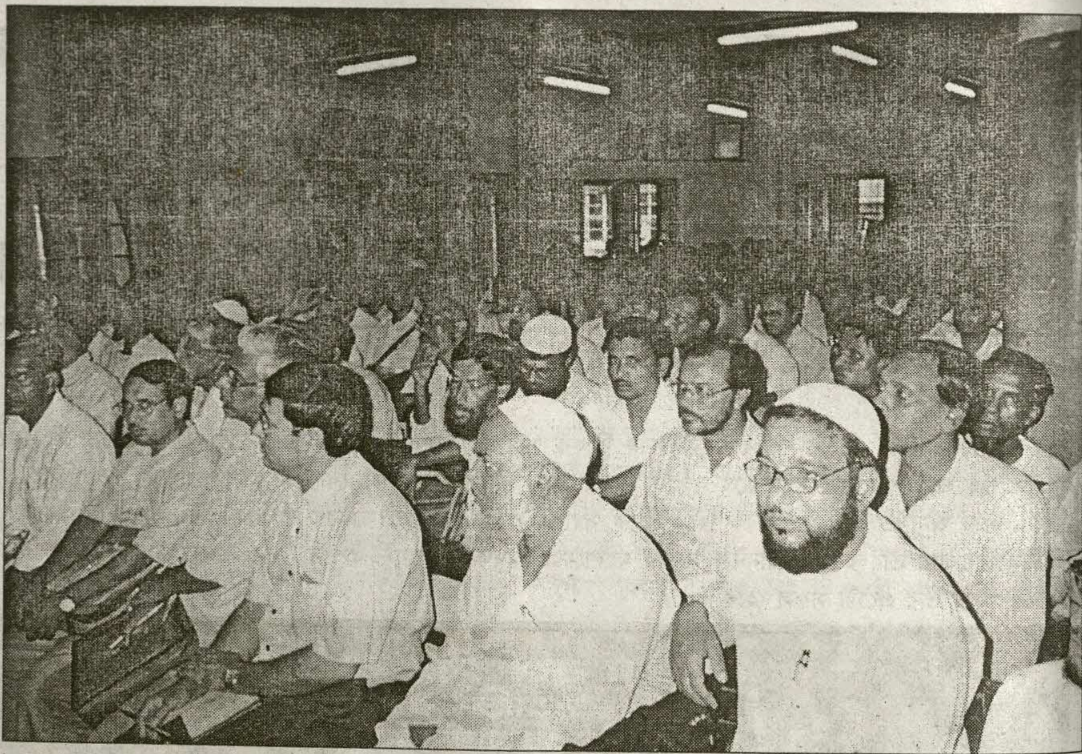
গত ১৩ই আগস্ট, ২০০৬, রবিবার নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে সমিতি ভবনের রবিকক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় ডঃ আবদুস সাত্তার মহাশয়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সমিতির সভাপতি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধিত করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে মাননীয় সাত্তার মহাশয়ের কর্মদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির স্বার্থে তাঁর প্রচেষ্টা সফল হোক।



সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ এবং শিক্ষা ও শিক্ষক-আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা সত্যপ্রিয় রায়ের জন্মশতবর্ষে তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলনের ভাবধারাকে পাথেয় করে শিক্ষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

দ্বিতীয় পর্বে মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে এক কনভেনশন হয়। উদ্বোধক রূপে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা



শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুস সাত্তার। কনভেনশনের উদ্বোধন করে তিনি শিক্ষকসমাজকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজসচেতন এবং মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বর্তমানে তথাকথিত বিশ্বায়নের দৌরাত্ম্যে সমষ্টিগত চিন্তার তুলনায় ব্যক্তিচিন্তার প্রকোপ বাড়ছে। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতাকে প্রতিরোধ করে এই সুন্দর পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের সকলের দায়িত্ব বিশ্বায়ন-বিরোধী লড়াই-আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়া।

এরপর কনভেনশনে প্রতিবেদন পেশ করেন মাদ্রাসা স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক তথা সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য। প্রতিবেদনে মাদ্রাসা শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকার আসার পূর্বে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসী আমলে মাদ্রাসার সংখ্যা, ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংখ্যা ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত সুযোগ-সুবিধার একটি পর্যালোচনামূলক পরিসংখ্যান দেন। এছাড়াও সিলেবাস সংক্রান্ত বিষয়ে হাই মাদ্রাসার আলিম, ফাজিল, কামিল ও এম এম-এর বর্তমান সিলেবাস, কিদ্ওয়াই কমিটির সুপারিশ ও সরকারের গৃহীত সিলেবাসের তুলনামূলক রিপোর্ট রাখেন। মাদ্রাসা শিক্ষকদের বিশেষ করে সিনিয়র মাদ্রাসা এবং হাই মাদ্রাসা শিক্ষকদের সঙ্গে আরবী বিষয়ক শিক্ষকদের বেতন বৈষম্যের উল্লেখ করে তা সমাধানের দাবি কনভেনশন থেকে উত্থাপিত হয়।

কনভেনশনে প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি জেলা থেকে একজন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিবেদনটি কনভেনশনে গৃহীত হয়।

— মোজাম্মেল হক

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

মাদ্রাসা শিক্ষা কনভেনশন

সত্যপ্রিয় ভবন

১৩ই আগস্ট, ২০০৬ ● বেলা ১২টা

মাননীয় সভাপতি, উদ্বোধক, রাজ্য নেতৃত্ব ও আজকের মাদ্রাসা শিক্ষা কনভেনশনে উপস্থিত শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের অবহেলিত শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটে। এর আগে মাদ্রাসা শিক্ষা ছিল আরও বেশি অবহেলিত, বিশেষ করে সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অবৈজ্ঞানিক এবং সিনিয়র মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা থেকে ছিলেন বঞ্চিত। জনসাধারণের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করেই এই মাদ্রাসাগুলি পরিচালিত হতো। অধ্যাপক মোস্তাফা বিন কাসেমের নেতৃত্বে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সিনিয়র মাদ্রাসার আলিম কোর্সকে প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাবর্ষে রূপান্তরিত করে অতিরিক্ত ৪ জন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করে ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ন্যায় সিনিয়র মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বেতন কাঠামোর আওতায় এনে তাঁদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে বামফ্রন্ট সরকার। পেশাগত সমস্যার সমাধান হলেও মাদ্রাসা শিক্ষার আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য থাকায় মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা রয়েই যায়। আর এই সমস্যাগুলিকে মূলধন করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাদ্রাসা শিক্ষকদের একাংশকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের ঐ অংশকে বিভ্রান্তির কবলমুক্ত করে শিক্ষার মূল স্রোতের সাথে আন্দোলনের মাধ্যমে যুক্ত করতে না পারলে তাঁরা শুধু শিক্ষার অগ্রগতিকেই ব্যাহত করবেন না, সমাজজীবনেও বিভ্রান্তি ছড়াবেন। কাজেই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এক্ষেত্রে নীরব ভূমিকা পালন করতে পারে না। মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলি সমাধানের মধ্যদিয়ে সমস্ত মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের শিক্ষা আন্দোলনের মূল স্রোতের সাথে যুক্ত করে শিক্ষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

আপনারা জানেন, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ইতোমধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল এ আর কিদ্‌ওয়াইকে সভাপতি করে ও পরবর্তী সময়ে কলকাতা উচ্চ আদালতের অন্যতম অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাননীয় কে এম ইউসুফকে সহ-সভাপতি করে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে ৭ জনের এক কমিটি গঠন করে। কমিটি তার ১১টি বিচার্য বিষয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মধ্যদিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষায় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি সহ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের কাছে তাঁদের মতামত আহ্বান করে ও পরবর্তী সময়ে আলোচনার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাকক্ষে মিলিত হয়। একমাত্র নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি সম্পর্কে লিখিতভাবে সমিতির অভিমত কিদ্‌ওয়াই কমিটির নিকট পেশ করেছে, যদিও একটি বিশেষ শিক্ষক সংগঠন যারা নিজেদের মাদ্রাসা শিক্ষার ধারক ও বাহক বলে মনে করে, ঐ সভায় উপস্থিত ছিল। আমরা মনে করি, সমস্যা সমাধানে যাঁরা মতামত দিতে পারেন না, মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে কথা বলার নৈতিক অধিকার তাঁদের নেই। যাই হোক, কমিটি দীর্ঘ আলোচনা, সরেজমিনে কিছু মাদ্রাসা পরিদর্শন ও বাস্তব পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে তাদের রিপোর্ট চূড়ান্ত করে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট গত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩ সালে জমা দিয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী তা ৩০শে জুলাই, ২০০৪ তারিখে বিধানসভায় পেশ করার পরই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কিদ্‌ওয়াই কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। কিদ্‌ওয়াই কমিটির সুপারিশ কার্যকরী না করার জন্য মাদ্রাসা ছাত্রদের একাংশ আন্দোলন শুরু করেছে এবং কেউ কেউ তাদের মদত যোগাচ্ছে। আশার কথা, জামাত-ই-উলামায়ে বাংলা হুগলী জেলার ফুরফুরা শরীফে যাদের কার্যালয়, কিদ্‌ওয়াই কমিটির নিকট কোনো মতামত না জানালেও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তারা মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে সিনিয়র মাদ্রাসার সিলেবাসের ব্যাপারে একটি প্রস্তাব দেয় যা সরকার গ্রহণ করে এবং মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদে তা কার্যকরী হয়।

এখন দেখা যাক, বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসায় কী সিলেবাস আছে, কিদ্‌ওয়াই কমিটির সুপারিশ কী এবং বর্তমানে সরকার কতটুকু গ্রহণ করেছে।

আলিম কোর্স ঃ

বর্তমান সিলেবাস		কিদ্‌ওয়াই কমিটির সুপারিশ		গৃহীত সিলেবাস	
ভাষা বিভাগ (Language)					
বাংলা :	১০০	বাংলা :	২০০	বাংলা :	১০০
আরবী :	১৫০	আরবী :	১০০	আরবী :	১০০
ইংরাজী :	১০০	ইংরাজী :	১০০	ইংরাজী :	১০০
	৩৫০		৪০০		৩০০
বিজ্ঞান বিভাগ (Science)					
গণিত :	১০০	গণিত :	১০০	গণিত :	১০০
ভৌত বিজ্ঞান :	৫০	ভৌত বিজ্ঞান :	১০০	ভৌত বিজ্ঞান :	৫০
জীবন বিজ্ঞান :	৫০	জীবন বিজ্ঞান :	১০০	জীবন বিজ্ঞান :	৫০
	২০০		৩০০		২০০
সমাজ বিজ্ঞান (Social Science)					
ইতিহাস :	১০০	ইতিহাস :	১০০	ইতিহাস :	১০০
ভূগোল :	৫০	ভূগোল :	১০০	ভূগোল :	৫০
	১৫০		২০০		১৫০
ইসলামিক ধর্মতত্ত্ব (Islamic Theology)					
হাদীশ :	১০০	ইসলামিক স্টাডিজ :	১০০	হাদীশ :	১০০
তপশীর :	১০০			তপশীর :	১০০
ফিকা :	৫০			ফিকা	৫০
ফারায়েজ :	৫০				
	৩০০		১০০		২৫০
সর্বমোট	১০০০		১০০০		৯০০

ফাজিল কোর্স ঃ

বর্তমান সিলেবাস		কিদ্‌ওয়াই কমিটির সুপারিশ		গৃহীত সিলেবাস	
আরবী ভাষা					
১ম পত্র :	১০০	আরবী ভাষা :	২০০	আরবী :	২০০
২য় পত্র :	১০০	ইংরাজী :	২০০	ইংরাজী :	২০০
৩য় পত্র :	১০০	বাংলা :	২০০	বাংলা :	২০০
৪র্থ পত্র :	১০০	ইসলামিক স্টাডিজ :	২০০	ইসলামিক স্টাডিজ	
হাদীশ :	১০০	উচ্চমাধ্যমিক কোর্সের		(হাদীশ + তপশীর) :	২০০
তপশীর :	১০০	অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে			
ফিকা :	১০০	১টি :	২০০		
উশুল :	১০০				
			১০০০		৮০০

উচ্চমাধ্যমিকের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে

কালাম	: ১০০		১টি কম্বিনেশন	: ২০০
তারিখ-ই ইসলাম	: ১০০		এবং ১টি অ্যাডিশনাল	: ২০০
		অতিরিক্ত ১টি বিষয় : ২০০		
সর্বমোট	: ১০০০	১২০০		১২০০

কামিল কোর্স : ৩ বছর

বর্তমান সিলেবাস

আরবী ১ম পত্র	:	১০০
আরবী ২য় পত্র	:	১০০
আরবী ৩য় পত্র	:	১০০
আরবী ৪র্থ পত্র	:	১০০
হাদীশ	:	১০০
তপশীর	:	১০০
ফিকা	:	১০০
উশুল	:	১০০
কালাম	:	১০০
তারিখ-ই-ইসলাম	:	১০০
মোট	:	১০০০

কিদ্‌ওয়াই কমিটির সুপারিশ :—

A. Three compulsory papers :-

a) First Language (Bengali) : 50 Marks

b) Second Language (English) 50 Marks

c) Environmental Studies 50 Marks

B. i) Islamic Studies at Honours level subjects - Islamic History, Tafsir, Hadith, Fique and Shariyat.

ii) Any two subsidiary subjects out of the following Advanced course in languages: Arabic, Persian and English.

iii) Social Science – History, Economics, Political Science, Philosophy and Sociology.

Vocational Courses – Journalism and Computer Sciences.

গৃহীত সিলেবাস **(Reoriented Syllabus for Kamil) Examination - Part I, II, III Equivalent to B. A. General**

Part-I General

1. English– 50 Same as University of Calcutta
2. Bengali/Urdu– 50 Same as University of Calcutta

3.	Environmental Studies–	50	Same as University of Calcutta
4.	Islamic Studies–	100	(To be submitted)
5.	Arabic Literature–	100	Same as University of Calcutta
6.	Elective subject (any one of the following):		
	a) General History–		
	b) Islamic History–		
	c) Political Science–	100	Same as University of Calcutta
	d) Computer Science–		
	e) Bengali–		
	f) Urdu–		

Total Marks–450

Part-II General

1. Islamic Studies (Theology) — 2 x 100 = 200 to be submitted 2 papers. 100 marks each.
2. Arabic Literature 2 papers, 100 marks each — 2 x 100 = 200 Same as University of Calcutta
3. One Elective subject which has been opted in Part-1 from 6 (a to f) 2 papers, 100 marks each — 2 x 100 = 200 Same as University of Calcutta

Total Marks- 600

Part-III General

1. Islamic Studies (Theology) One paper — 1 x 100 = 100 to be submitted
2. Arabic Literature One paper — 1 x 100 = 100 Same as University of Calcutta
3. One Elective subject which has been opted in Part-I from 6 (a to f) One paper — 1 x 100 = 100 Same as University of Calcutta

Total Marks–300

Grand Total (Part I+II+III) = 1350

Reoriented Syllabus for Kamil, 3 years Examination
Part-I, II & III Equivalent to B.A. (Hons.)

Part-I Hons.	Name of Subject/Group	Marks	Full Marks	Syllabus
1.	English	50	50	Same as University of Calcutta
2.	Bengali/Urdu	50	50	Same as University of Calcutta
3.	Environmental Studies	50	50	Same as University of Calcutta
4.	Elective subject– Arabic Literature or Islamic Studies (Theology)	100	100	Arabic Literature Same as University of Calcutta or Islamic Studies to be submitted
5.	Elective subject (any one of the following) a) General History b) Islamic History c) Political Science d) Computer Science e) Bengali f) Urdu	100	100	Same as University of Calcutta

Total Marks–350

Part-II Hons.			
1.	Islamic Studies (Theology) or Arabic Literature 4 papers, 100 marks each	4 x 100 = 400	Arabic Literature Same as University of Calcutta or Islamic Studies (Theology) to be submitted Arabic Literature
2.	Elective subject Arabic Literature or Islamic Studies (Theology) 2 papers, 100 marks each	2 x 100 = 200	Same as University of Calcutta or Islamic Studies (Theology) to be submitted
3.	Elective subject (any one of the following) a) General History b) Islamic History c) Political Science	2 x 100 = 200	Arabic Literature Same as University of Calcutta or Islamic Studies (Theology) to be submitted

d) Computer Science
e) Bengali
f) Urdu
2 papers, 100 marks each

Total Marks–350

Part-III Hons.

1.	Islamic Studies (Theology) or Arabic Literature 4 papers, 100 marks each	4 x 100 = 400	Arabic Literature Same as University of Calcutta or Islamic Studies (Theology) to be submitted

Total Marks–400

Grand Total (Part I+II+III) = 1550

মোমতাজুল মোহাদ্দেশিন কোর্স (এম এম) ঃ ২ বছরের কোর্স

বর্তমান সিলেবাস

১) বোখারী শরীফ ১ম পত্র	: ১০০
২) বোখারী শরীফ ২য় পত্র	: ১০০
৩) তিরমিজী শরীফ	: ১০০
৪) মুসলিম শরীফ	: ১০০
৫) ইবনে মাজাহ শরীফ (সায়েন্স অফ হাদিত)	: ১০০
৬) তপশীরে বাইদাবী	: ১০০
৭) আবু দাউদ শরীফ	: ১০০
৮) নাসায়ী শরীফ	: ১০০
৯) তপশীরে কাস্বাফী (কোরানিক সায়েন্স)	: ১০০
১০) তারিখ-ই-ইসলাম	: ১০০

মোট ১০০০

কিদ্‌ওয়াই কমিটির সুপারিশ ঃ

Momtazul Mohaddethin (equivalent to M.A.) M.M. Course is meant for specialisation in Islamic Studies with the following subjects:-

M.M. 1st Year– Islamic History and Philosophy. Tafsir, Hadith, Fique and Shariyat.

M.M. 2nd Year– Specialisation in any of the above subjects.

গৃহীত সিলেবাস ঃ

Reoriented Syllabus for Momtazul Mohaddethin/Momtazul Udaba/Momtazul Muarrekhin Examination (equivalent to M.A.).

Part-I

	Name of Subject/Group	No. of Paper	No. of Par	Marks	Full Marks
any one subject of the following	Hadith/Arabic Literature Tarikh-e-Islam (Islamic History) 500	Five Paper	Paper I	100	
			Paper II	100	
			Paper III	100	500
			Paper IV	100	
			Paper V	100	
					500

Part-I

	Name of Subject/Group	No. of Paper	No. of Par	Marks	Full Marks
any one subject of the following	Hadith/Arabic Literature Tarikh-e-Islam (Islamic History) 500	Five Paper	Paper I	100	
			Paper II	100	
			Paper III	100	500
			Paper IV	100	
			Paper V	100	
					500

Grand Total (Part I+II) 500+500 = 1000

Momtazul Mohaddethin : M.A. in Hadith
Momtazul Udaba : M.A. in Literature
Momtazul Muarrekhin : M.A. in Tarikh-e-Islam (Islamic History)

হাইমাদ্রাসার সিলেবাস

হাই মাদ্রাসার সিলেবাস পুরোপুরি মাধ্যমিকের ন্যায়। কেবলমাত্র ১০০ আরবী ভাষা ও ১০০ অ্যাডভান্স পেপার ইন আরবী একটি কম্পালসারী ও একটি কম্পালসারী অপশনাল অতিরিক্ত পড়তে হয়। আমাদের দাবি, ১টিকে কম্পালসারী রেখে অন্যটিকে অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

এখানে উল্লেখ্য যে, কলকাতা মাদ্রাসার ২২৫ বছর পূর্তি বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভার উদ্বোধক পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য উদ্বোধনের সময় কলকাতা মাদ্রাসাকে কলেজের মর্যাদা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এই সুপ্রাচীন মাদ্রাসা কলেজকেই কামিল কোর্স ও এম এম কোর্স পড়ানোর প্রশাসনিক ও পাঠক্রম-পাঠ্যসূচি সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। অতএব এরপর কামিল ও এম এম কোর্স সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক সমস্ত দায়িত্বই পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের পরিবর্তে কলকাতা মাদ্রাসা কলেজ পালন করবে। আমাদের নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দাবিও ছিল বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা এবং কলেজ স্তরের শিক্ষা একই বোর্ডের অধীন থাকা উচিত নয়। কলেজ স্তরের শিক্ষা কলকাতা মাদ্রাসা

কলেজের সংস্কারের মাধ্যমে ঐ প্রতিষ্ঠানকেই দেওয়া উচিত। মাদ্রাসা কলেজের ২২৫ বছর পূর্তি উৎসবের মাধ্যমে সেই বিভাজনই করা হয়েছে। অদ্যকার কনভেনশন এজন্য পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :
সিনিয়র মাদ্রাসা-২, জুনিয়র মাদ্রাসা ও জুনিয়র হাই মাদ্রাসা-১৭৬, হাই মাদ্রাসা-৮। মোট-১৮৬।

১৯৭৬-১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার সময় মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :
সিনিয়র মাদ্রাসা-৭৫, জুনিয়র হাই মাদ্রাসা-৭১, হাই মাদ্রাসা-৯২। মোট-২৩৮।

আর বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন শ্রেণির মাদ্রাসার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে নিম্নরূপ :
সিনিয়র মাদ্রাসা-১০৩, জুনিয়র হাই মাদ্রাসা-১২৯, হাই মাদ্রাসা-২৭৬। মোট-৫০৮।

এই ২৭৬টি হাই মাদ্রাসার মধ্যে ৬২টি মাদ্রাসাকে হায়ার সেকেন্ডারী মাদ্রাসায় উন্নীত করা হয়েছে। হায়ার সেকেন্ডারী মাদ্রাসায় উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া এখনও চলছে, কাজেই এই সংখ্যা আরো বাড়বে। ১০৩টি সিনিয়র মাদ্রাসার মধ্যে ১৭টি মাদ্রাসায় ফাজিল কোর্স পর্যন্ত পড়ানো হয়। আর ৪টি মাদ্রাসায় পড়ানো হয় কামিল ও এম এম কোর্স। ১০৩টি সিনিয়র মাদ্রাসার মধ্যে ১০২টি মাদ্রাসায় আলিম কোর্স পড়ানো হয়। আর আলিম কোর্স হচ্ছে ১ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি। আমাদের দাবি, ১ম শ্রেণি থেকে ৪র্থ শ্রেণিকে সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে বাদ দিয়ে তা প্রাইমারী কাউন্সিলের সাথে যুক্ত করা হোক ২ জন শিক্ষক সহ। তাহলে অন্যান্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় সিনিয়র মাদ্রাসাও হবে ৫ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি এবং অনুমোদিত শিক্ষক থাকবে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও হাই মাদ্রাসার ন্যায় ১২ জন। প্রশাসনিক জটিলতা এড়ানোর জন্য এটা অপরিহার্য।

এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার আলাদা বৈশিষ্ট্যের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমস্যার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে বাড়তি কিছু সমস্যা আছে। আর এই সমস্যাগুলি নিয়েই কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষক সংগঠন ও ছাত্র সংগঠন মাঝে মাঝেই সরকার-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করছে। এই সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে অদ্যকার কনভেনশন তা সমাধানের দাবি জানাচ্ছে।

সমস্যাগুলি নিম্নরূপ :

১। ১০২টি সিনিয়র মাদ্রাসার প্রাথমিক বিভাগকে প্রাইমারী কাউন্সিল-এর সাথে যুক্ত করা হোক।

২। বর্তমানে মোট ৬টি জুনিয়র মাদ্রাসা আছে — ১ম শ্রেণি থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি। এই মাদ্রাসাগুলিরও প্রাথমিক বিভাগকে (১ম শ্রেণি থেকে ৪র্থ শ্রেণি) প্রাইমারী কাউন্সিল-এর সাথে যুক্ত করে ঐ মাদ্রাসাগুলিকে জুনিয়র হাই মাদ্রাসায় (১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি) উন্নীত করা হোক।

৩। হাই মাদ্রাসার ১০০ নম্বর আরবী ভাষা ও ১০০ নম্বর অ্যাডভান্স পেপার ইন আরবীক যা ছাত্রদের ইচ্ছানুযায়ী একটি কম্পালসারী ও অন্যটি কম্পালসারী অপশনাল আছে তা বাতিল করে ছাত্রদের ইচ্ছানুযায়ী একটিকে কম্পালসারী রেখে অন্যটিকে অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট-এর অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

৪। এম এম কামিল ও এফ এম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে রিজার্ভেশনের নিয়ম শিথিল করে তাৎক্ষণিকভাবে ঐ পদে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব ডি আইদের ওপর দেওয়া হোক। বিনিময়ে সমসংখ্যক পদ জেনারেল বিভাগ থেকে রিজার্ভ করা হোক। অন্যথায় ঐ পদে শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। কেন-না এখন পর্যন্ত এস সি, এস টি তো দূরের কথা, কোনো হিন্দু ছেলেই ঐ বিষয়ে পড়াশোনা বা পাশ করেনি।

৫। এম এম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকগণ জুনিয়র হাই ও হাইমাদ্রাসায় নিয়োগ হলে ৫ বছর আন্ডার গ্র্যাজুয়েটদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রম পান। ৫ বছর পর তাঁরা গ্র্যাজুয়েটদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রম পান (সার্কুলার নং ৩৭২ ই ডি এন (বি) তাং ৩১-৭-৮১। অথচ ঐ একই যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক সিনিয়র মাদ্রাসায় নিয়োগ হলে শুরু থেকেই গ্র্যাজুয়েটদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রম পান (সার্কুলার নং ২২০ ই ডি এন (এম) তাং ২২০ ই ডি এন (বি) আই এম ২৫/৮২ তাং-২৯-৫-৮২। এই বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে শুরু থেকেই সকলকে গ্র্যাজুয়েটদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রম দেওয়া হোক।

৬। কামিল পাশ শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত কোনো বেতনক্রম নেই। এঁদেরও কোনো কোনো ডি আই এফ এম-দের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন দিচ্ছে, আবার কোনো কোনো ডি আই অনুমোদন দিচ্ছে না। অবিলম্বে এঁদের জন্য একটি বেতনক্রম ঘোষণা করতে হবে।

৭। সিনিয়র মাদ্রাসার এম এম যোগ্যতাসম্পন্ন সুপারিনটেন্ডেন্টদের কোনো নির্ধারিত বেতনক্রম নেই। তাঁরা গ্র্যাজুয়েটদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রম পান। এঁদের একটা অ্যালাউন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

৮। সিনিয়র মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্টদের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে এম এম + বি এড ১০ বছরের অভিজ্ঞতা যা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। পাওয়া যাচ্ছে না, নিয়োগও হচ্ছে না। টি আই সি দিয়ে মাদ্রাসা চালাতে হচ্ছে। কনভেনশনের দাবি, যোগ্যতার মানদন্ড শিথিল করা হোক। অন্তত এম এম, বি এ, বি এড, ১০ বছরের অভিজ্ঞতা করা হোক।

৯। যে সমস্ত সিনিয়র মাদ্রাসায় ৬০০'র বেশি ছাত্র-ছাত্রী ৩ বছর ধরে আছে সেই সমস্ত মাদ্রাসায় সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর পদ সৃষ্টি করে ঐ মাদ্রাসায় কর্মরত এম এ, বি এড, ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের নিয়োগ করা হোক।

১০। মাদ্রাসায় সুষ্ঠুভাবে শিক্ষক নিয়োগের স্বার্থে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক অথবা অধ্যক্ষকে স্কুল সার্ভিস কমিশনে যুক্ত করা হোক।

১১। বিগত ২০০০ সালের পর বেশ কিছু নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় অনুমোদন পেলেও কোনো নিম্নমাধ্যমিক মাদ্রাসা (জুনিয়র হাই মাদ্রাসা) অনুমোদন পায়নি সরকারী নিয়ম অনুযায়ী। কিছু জুনিয়র হাই মাদ্রাসার অনুমোদন দেওয়া হোক।

১২। কিদ্‌ওয়াই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আলিমের পরিবর্তিত সিলেবাস সুষ্ঠুভাবে পঠন-পাঠনের জন্য ১ জন ইংরাজী ও ১ জন অঙ্কের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করে দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করা হোক।

১৩। অনুরূপভাবে যে ১৭টি মাদ্রাসায় ফাজিল পড়ানো হয়, সেই মাদ্রাসাগুলিতেও ২ জন অতিরিক্ত পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ করা হোক।

১৪। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে সংবিধান সংশোধন করে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ও সর্বশিক্ষা অভিযান শুরু হয়েছে। অথচ মুসলিম ছেলেমেয়েদের একটা অংশ মক্তব ও খারেজি মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে যার সাথে সাধারণ এই শিক্ষাব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। এই ধরনের সরকারী সাহায্যবিহীন মক্তব ও খারেজি মাদ্রাসাগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের মডার্ণাইজেশন স্কীম-এর আওতায় এনে এদের মাতৃভাষা, অঙ্ক ও সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে এরা সমাজজীবনের মূল স্রোতে যুক্ত হতে পারবে। এই কনভেনশন মাননীয় মন্ত্রীর এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

এ বি টি এ একটি বৃত্তিজীবী গণসংগঠন। বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় বৃত্তির ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকবেই। কেন-না একটা সমস্যা সমাধানের সাথে সাথে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেবে এবং ভবিষ্যতে তা সমাধানের জন্য নতুন নতুন আন্দোলনের কর্মসূচিও গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে চেতনার উন্মেষ ঘটাতে না পারলে শুধু দাবি-দাওয়া আদায়ের মধ্যে দিয়ে সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করা যায় না, আর তা করতে না পারলে এরা প্রতিক্রিয়ার শক্তিকেই মদত যোগাবে ও শক্তিশালী করবে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের একাংশের মানসিকতা পর্যালোচনা করলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার আগে মাদ্রাসা শিক্ষকদের বিশেষভাবে সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষকদের কী অবস্থা ছিল তা মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই খুব ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এঁরা প্রগতিশীল শক্তিকে সহায়তা না করে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে মদত যোগাচ্ছেন কেন? সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে এঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে না পারলে শুধু বৃত্তিগত সমস্যার সমাধানের মধ্যদিয়ে এঁদের সমাজ-সচেতন দায়বদ্ধ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা যাবে না। কাজেই এ বি টি এ-কেই এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে ঃ

১। প্রতিটি জেলায় শুধু কাগজ-কলমে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন না করে এই কমিটির নিয়মিত সভা করতে হবে।

২। এ বি টি এ-র সদস্য করার জন্য পরিকল্পিতভাবে জেলাগুলিকে উদ্যোগ নিতে হবে।

৩। প্রতি বছর মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে জেলাগত কনভেনশন করতে হবে।

৪। হাই মাদ্রাসা টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন যাতে এ বি টি এ থেকে নেওয়া হয় তার উদ্যোগ নিতে হবে।

৫। আলিম পরীক্ষার টেস্ট প্রশ্নপত্র এ বি টি এ-কে ছাপানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

৬। পেশাগত সাধারণ সমস্যার সাথে মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষকদের বিশেষ কিছু আলাদা সমস্যা আছে। সমস্যাগুলি সমাধানে জেলাগুলিকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে এবং যেগুলি রাজ্য পর্যায়ের সেগুলো কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠিয়ে দিতে হবে।

সাথীবৃন্দ, মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান পর্যায়, পরিস্থিতি ও সমস্যা সম্পর্কে যে প্রতিবেদন রাখা হলো তা আপনাদের গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করবেন, যা আগামীদিনে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক হবে।

অভিনন্দন সহ,
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

প্রতিবেদন

ওড়িশা শিক্ষাবিকাশ অভিযান মঞ্চ আয়োজিত শিক্ষা সেমিনার

স্থান ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন লিমিটেড (ইউকল) অডিটোরিয়াম, ভুবনেশ্বর

২৯-৩০ জুলাই, ২০০৬

'ওড়িশা শিক্ষা বিকাশ অভিযান' মঞ্চের উদ্যোগে ভুবনেশ্বরের ইউকল প্রেক্ষাগৃহে ২৯-৩০শে জুলাই, ২০০৬ এই দুইদিন ব্যাপী এক সময়োপযোগী গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারীকরণ ও গৈরিকীকরণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করা হলো এই শিক্ষা সেমিনারে। এই সেমিনারের উদ্বোধক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস। উল্লেখযোগ্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রিজেশ শর্মা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রীসুদর্শন রায় চৌধুরী, বিশ্ব শিক্ষক সঙ্ঘের প্রাক্তন নেতা অধ্যাপক অবনী বড়াল প্রমুখ। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস টি এফ আই-এর সভাপতি শ্রীকার্তিক মন্ডল, সহ-সভাপতি শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ওড়িশা শিক্ষা বিকাশ অভিযানের সভাপতি অধ্যাপক বিভূতি পট্টনায়ক। আহ্বায়ক প্রফুল্ল মহন্ত সিং, ওড়িশা সেকেন্ডারী টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কিশোর কুমার পান্ডে, অল উৎকল প্রাইমারী টিচার্স ফেডারেশনের নেতা বিভূতিভূষণ দাস, ওড়িশার এস এফ আই-এর পূর্বতন রাজ্য সভাপতি সুরেশ পানিগ্রাহী, ওড়িশার গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ডঃ নির্মল রথ, ওড়িশা সেকেন্ডারী টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের চারুলতা মহাপাত্র, অধ্যাপক সুরেন্দ্র কুমার জেনা, অধ্যাপক দেবব্রত প্রধান, এস এফ আই-এর পূর্বতন ছাত্রনেতা অধ্যাপক পার্থসারথী দাস, ওড়িশার এস এফ আই-এর বর্তমান রাজ্য সম্পাদক শরৎ দাস প্রমুখ।

২৯·৭·০৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক বিভূতি পট্টনায়ক। স্বাগত ভাষণ দেন ওড়িশা শিক্ষা বিকাশ অভিযান মঞ্চের আহ্বায়ক প্রফুল্ল মহন্ত সিংহ। তিনি বলেন, সাধারণ গরিব মানুষ শিক্ষার আলো পাবে কিনা সেটাই আজ বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বড়লোকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুবিধা করে দিচ্ছে। অথচ সকল

মানুষের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক সমমানের শিক্ষা দেশের উন্নয়নের জন্য আজ খুবই প্রয়োজন। সেই শিক্ষার জন্য সংগ্রাম গড়ে তুলতেই ওড়িশা শিক্ষা বিকাশ অভিযানের কাজ শুরু হলো আজ থেকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্বতন বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস বলেন, আজ ২৯শে জুলাই। ১৮৭৬ সালে এই দিনটিতে (Indian Science Congrees স্থাপিত হয়। এই দিনটিতেই পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রয়াত হন। নারীশিক্ষার বিস্তারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। নিজ খরচায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তিনি। এই বিদ্যালয়গুলির সমগ্র ব্যয়ভার তিনিই বহন করতেন। তিনি বলেছিলেন, আমার মা ভগবতী দেবী না হলে আমি বিদ্যাসাগর হতে পারতাম না। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০০৫ অনুযায়ী মানবসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে বিশ্বের ১৭৭টি দেশের মধ্যে ভারত আছে ১২৭ নম্বর স্থানে। ওয়ার্ল্ড এডুকেশন মণিটরিং রিপোর্ট অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে ১২১টি দেশের মধ্যে আমরা আছি ১০০তম স্থানে। স্বাধীনতার ৫৮ বছর পরে এই হলো আমাদের শিক্ষার হাল। আজও আমরা বুঝলাম না স্বাক্ষর মায়ের সন্তান নিরক্ষর থাকে না। বিশ্বে নারীর সংখ্যা ১২৫টি দেশে বেশি। Gender related education report-এ বলা হয়েছে, নারীশিক্ষায় আমরা আছি ১০৩ নম্বর স্থানে। পরাধীন ভারতে প্রথম দুই মহিলা স্নাতক হন। তাঁরা হলেন ঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও চন্দ্রমুখী বসু। বিদ্যালয়ে যায় না ৬-১০ বছরের এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যা বিশ্বে ১০ কোটি ৩০ লক্ষ। এই সংখ্যা ভারতে ২ কোটি ১০ লক্ষ ; এই ২ কোটি ১০ লক্ষের ৬১·৯ শতাংশ শিশুকন্যা। সীমাহীন পশ্চাদপদতা ! বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা সারা বিশ্বে ৭৭·১ মিলিয়ন আর ভারতে বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা ২৬·৭ মিলিয়ন। বয়স্ক বলতে ১৫ বছরের উর্দ্ধে যাদের বয়স তাদের বোঝানো হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটর, ২০০৫ অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার ৩৪·৬ শতাংশ আজও নিরক্ষর। শিশু-শ্রমিক বলতে বোঝায় ৫-১৪ বছরের বালক-বালিকাদের — যারা কাজ করতে বাধ্য হয় আর্থিক দুরবস্থার কারণে। আই এল ও প্রতিবেদন, ২০০৬-এ বলা হয়েছে, বিশ্বের ১৮ শতাংশ শিশু-শ্রমিক রয়েছে আমাদের দেশে। মারাত্মক কাজে নিযুক্ত শিশু-শ্রমিক রয়েছে ৬টি দেশে। তার মধ্যে ভারত আছে। লেখাপড়া শিখলে এতসব জানা যায়, তাই বোধহয় লেখাপড়া শেখানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মাথাব্যথা নেই।

ওড়িশার শিক্ষাচিত্র সম্পর্কে কান্তি বিশ্বাস তথ্যভিত্তিক বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী জাতীয় সাক্ষরতার হার যেখানে ৬৫·৩৮ শতাংশ, সেখানে ওড়িশায় সাক্ষরতার হার ৬৩·৫৮ শতাংশ। ওড়িশায় নারীদের সাক্ষরতার হার ৫০·৯৭ শতাংশ। ওড়িশায় ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণিতে ৪৯ লক্ষ ছেলেমেয়ে পড়ে। এরমধ্যে যেমন ৬ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়ে আছে তেমনই আছে ৯ বছরের বেশি বয়সের ছেলেমেয়ে। ভারতে ১ম-৫ম শ্রেণিতে পড়ে ১২ কোটি ৩০ লক্ষ ছেলেমেয়ে। ওড়িশা সরকার শিক্ষার জন্য মাথাপিছু ব্যয় করে মাত্র ৫৩৮ টাকা (প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত)। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে ১৪ লক্ষ ৩০ হাজার ছেলেমেয়ে ; সারা ভারতে পড়ে ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ছেলেমেয়ে। অর্থাৎ দেশে এই শ্রেণিগুলিতে পড়ছে যত ছেলেমেয়ে, তার মাত্র ২·৮ শতাংশ পড়ছে ওড়িশায়। ওড়িশায় ২৩ শতাংশ বিদ্যালয় হলো প্রাইভেট আন্‌এডেড। পশ্চিমবাংলায় মাত্র ২ শতাংশ বিদ্যালয় প্রাইভেট আন্‌এডেড। ওড়িশায় ১২ হাজার পার্শ্বশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত 'বিদ্যালয় ছুট'দের হার সারা ভারতে হলো ৬৩ শতাংশ আর ওড়িশায় এই স্তরে 'বিদ্যালয় ছুট'-এর হার ৬৫ শতাংশ। নবম থেকে দশম শ্রেণিতে সারা দেশে পড়ে ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ছেলেমেয়ে আর ওড়িশায় এই দুই শ্রেণিতে পড়ে মাত্র ৮ লক্ষ ছেলেমেয়ে। ওড়িশায় একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ছেলেমেয়ে। সারা ভারতে এই দুই শ্রেণিতে পড়ে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ছেলেমেয়ে। অর্থাৎ দেশের এই দুই শ্রেণির মোট ছাত্র-ছাত্রীর ১·৪ শতাংশ আছে ওড়িশায়। ওড়িশায় শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি আছে দীর্ঘ সময় ধরে।

শিক্ষা কমিশন, কমিটি গঠনে ভারত একনম্বরে। নায়গ্রা জলপ্রপাতের মতোই অজস্র শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে এদেশে স্বাধীনতার পর কিন্তু ঐ কমিশনগুলির সুপারিশগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ সাহারা মরুভূমির মতোই শুষ্কতায় ভুগছে।

শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ওড়িশার প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। ওডিশি নৃত্য ২০০০ বছর আগে জন্মলাভ করেছে — পরে এসেছে কথাকলি প্রভৃতি নৃত্যশৈলী। কলিঙ্গ যুদ্ধের শিক্ষা ওড়িশাকে নতুন পথে পরিচালিত করেছে। ওড়িশা শিক্ষা বিকাশ অভিযান মঞ্চ তার কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে ওড়িশার বর্তমান পশ্চাদ্‌পদতার অবসানে যোগ্য ভূমিকা পালন করুক।

তিনি বলেন, বিশ্বায়ন আয়-বৈষম্য বাড়াচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে কোটিপতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায়।

তারপরেই ভারতের স্থান। ভারতের ৫ ধনী পরিবারের সম্পদের পরিমাণ ইংলন্ডের ৫ ধনী পরিবারের সম্পদের চেয়ে বেশি। অথচ ভারতেই সবথেকে বেশী গরিবের বাস। বিশ্বায়নের ফলে পতিতাবৃত্তি, বিশেষ করে শিশুদের দিয়ে পতিতার কাজ করানো ভীষণ বেড়েছে। বিশ্বের তৃতীয় লাভজনক ব্যবসা হলো নারী নিয়ে ব্যবসা। এই সর্বনাশা বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে শ্রেণিকক্ষের বাইরে চাই আন্দোলন। আশা করি, ওড়িশা শিক্ষা বিকাশ অভিযান মঞ্চ এ-কাজ করবে।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রকুমার জেনা বলেন, শিক্ষার আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হলে বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে হবে। অধ্যাপক জেনা শিক্ষার সেমিনার-এর ভিত্তিপত্র উপস্থাপিত করেন। শিক্ষা আন্দোলন ও গণ-আন্দোলনের কর্মী মাননীয় সন্তোষ দাস শিক্ষার যে সংকট দেশে দেখা দিয়েছে, তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের পথে হাঁটছেন কেন্দ্রীয় সরকার। উচ্চমূল্যে শিক্ষা বিক্রি হচ্ছে দেশে। ফলে গরিব মানুষের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকছে। রাষ্ট্রকেই শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

৩০·০৭·০৬-এর প্রথম অধিবেশন সকাল সাড়ে ন'টায় শুরু হয়। শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী মাননীয় সুদর্শন রায়চৌধুরী ওড়িয়া ভাষায় রচিত, 'শিক্ষা স্মরণিকা' প্রকাশ করেন। ঐ স্মরণিকায় সর্বভারতীয় শিক্ষা কনভেনশনের ভিত্তিপত্রে প্রকাশিত অধ্যাপক ব্রিজেশ শর্মা, অধ্যাপক প্রভাত পট্টনায়েক প্রমুখের লেখা শিক্ষার সংকট ও সমাধান সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি ওড়িয়ায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছে।

এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল ঃ "ওড়িশার বিদ্যালয় শিক্ষা পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা"।

বিষয়টি নিয়ে মুখ্য বক্তা ছিলেন এস টি এফ আই-এর সহ-সভাপতি ও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য পেশ করে বলেন, বিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে নানা কমিশন, কমিটি যেসব সুপারিশ করেছে তার মূল সুরটা হলো যে, শিক্ষার লক্ষ্য হলো পূর্ণ মানুষ তৈরি করা। সুস্থ সমাজের উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করা। বিদ্যালয় শিক্ষার চরিত্রে বিধৃত থাকবে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও সাম্য। আর শিক্ষাকে হতে হবে বিজ্ঞানভিত্তিক। পাঠক্রমের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীরা এই মূল্যবোধগুলি শিখবে। এন সি ই আর টি বলছে, আমাদের জনসংখ্যার ৩৭ শতাংশ নিরক্ষর। আমাদের দেশে বসবাসকারী মানুষের ৫৪ শতাংশের বয়স ২৫-এর কম। এই যে বিশাল মানবসম্পদ, একে বিকশিত করতে আমাদের রাষ্ট্র কী ব্যবস্থা নেবে তার ওপরেই তো দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কেন্দ্রীয় সরকার আজও জি ডি পি'র ৬ শতাংশ ব্যয় করলেন না। স্বাধীনতার পর ৫৮ বছর কেটে গেল। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবেই নিরক্ষরতা ও ধন-বৈষম্য বাড়ছে। বর্তমান 'উপা' সরকার শিক্ষাকে পণ্য হিসাবেই গণ্য করে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক বিদেশী পুঁজি নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। শিক্ষাকে তাঁরা মানুষের জন্মগত অধিকার বলে মনে করেন না। তাই শিক্ষার অধিকার বিল, ২০০৪ এবং শিক্ষার অধিকার বিল, ২০০৫-এর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। এখন 'উপা' সরকার সংসদকে না জানিয়ে গোপনে মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬ পাঠিয়ে দিয়েছে রাজ্যগুলিতে। এই বিলে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্যের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে 'উপা' সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার তার সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যাচ্ছেন। আশ্চর্য্য কান্ড! শিক্ষার জন্য মোট সরকারী ব্যয়ের মোট মাত্র ৯ শতাংশ বহন করে কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকারগুলি বহন করে ৯১ শতাংশ। এই বিলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে 'উপা' সরকারকে বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে তাদের অনুসৃত নরম হিন্দুত্বের নীতি ত্যাগ করতে হবে। সভায় ওড়িশার বিদ্যালয় শিক্ষার পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন ওড়িশা সেকেন্ডারী টিচার্স ফেডারেশন, অল উৎকল প্রাইমারী টিচার্স ফেডারেশন, এস এফ আই-এর নেতৃবৃন্দ।

দ্বিতীয় অধিবেশন দুপুর ১২টায় শুরু হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল ঃ ওড়িশায় উচ্চশিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের বিপদ। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দেবব্রত প্রধান। মুখ্য বক্তা ছিলেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রিজেশ শর্মা। অধ্যাপক শর্মা তাঁর ভাষণে বলেন, আমাদের দেশে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ চলছে ১৯৮৬ থেকে। ১৯৯০ থেকে আইন ছাড়াই শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ শুরু হলো। বলা হলো, উচ্চশিক্ষার খরচের ২৫ শতাংশ ছাত্রবেতন থেকে তোলা হবে। ১৯৮৫-তে বিশ্বব্যাঙ্ক শিক্ষা নিয়ে ভারতকে যে পথে চলতে বলে ১৯৮৬'র জাতীয় শিক্ষানীতিতে তারই প্রতিফলন ঘটে। ১৯৯৭ সালে চিদাম্বরম বলেছিলেন, উচ্চশিক্ষা non-merit good. বলা হচ্ছে উচ্চশিক্ষায় সরকার টাকা ঢালবে না — উচ্চশিক্ষার টাকা কেটে সেই টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। আমরা চাই সরকারী ব্যয়ে কলেজগুলো গড়ে উঠুক। ২০০২-২০০৪ সালের

মধ্যে ৫৭১৯টি নতুন কলেজ খোলা হয়েছে দেশে। এই কলেজগুলির ৬০ শতাংশ সরকারী টাকায় গড়ে ওঠেনি। ব্যক্তিপুঁজির বিনিয়োগে গড়ে উঠেছে। দেশে প্রায় ১ কোটি ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। এর ৮৭ শতাংশ পড়ে কলেজে, ১৩ শতাংশ পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে। নামমাত্র ছেলেমেয়ে ওড়িশায় উচ্চশিক্ষা নেয়। সবাইকে নিয়ে আন্দোলন করতে হবে শিক্ষার দাবিতে। কেন্দ্রের 'উপা' সরকার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বিল আনার তোড়জোড় শুরু করেছে। বিড়লা-আম্বানি রিপোর্টে বলা হয়েছিল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ইউনিয়ন গড়তে পারবে না। বাজার-বন্ধু পাঠক্রম করতে হবে। ছাত্রবেতন বাড়াতে হবে। Self-financing কলেজ বাড়াতে হবে। স্পনসরড রিসার্চকে উৎসাহিত করছে। এর মানে কী ? টোরেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পনসরড রিসার্চ হয়। গবেষকদের বলা হয় গবেষণায় কোনো নেতিবাচক কথা থাকবে না। অর্থাৎ শর্ত মেনে গবেষণা করতে হবে।

উচ্চশিক্ষা নিয়ে বক্তব্য রাখেন এস এফ আই-এর পূর্বতন ছাত্রনেতা অধ্যাপক পার্থসারথী দাস এবং ওড়িশা এস এফ আই-এর সম্পাদক শরৎ দাস।

'ফিজে' বা বিশ্ব শিক্ষক সংঘের প্রাক্তন সম্পাদক এবং শিক্ষক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা অধ্যাপক অবনী বড়াল ওড়িশায় বিদেশী বিদ্যালয় স্থাপনের তীব্র বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। 'বেদান্ত বিশ্ববিদ্যালয়' নামে ওড়িশায় বিদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। তবে এটা অকস্মাৎ হচ্ছে না — ধীরুভাই আম্বানি অনেক আগেই পরিকল্পনা দিয়েছে ওড়িশা সরকারকে হাইটেক্ ইউনিভার্সিটি করবে বলে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যেখানে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে ৭০০ বা ৮০০ একর জমির ওপর, সেখানে বেদান্ত বিশ্ববিদ্যালয় চাইছে ১৮ হাজার একর জমি। ব্যাপারটা কী ? ভাবা যায় ? ওড়িশায় ৮টি দরিদ্রতম জেলা রয়েছে। সেই ওড়িশায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতা কী ?

এন ডি এ আমলে শিক্ষাবিদরা শিক্ষানীতি নির্ধারণ করলেন না, শিক্ষানীতি নির্ধারণ করলেন প্রধানমন্ত্রীর শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে পরামর্শদাতা পর্ষদ। শিক্ষা নিয়ে তৈরি হলো 'বিড়লা-আম্বানি রিপোর্ট', যার মূল কথা মুনাফার স্বার্থে ব্যাপকভাবে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ। সেই 'বিড়লা-আম্বানি রিপোর্ট ইউ পি এ আমলেও থেকে গেছে।

সমাপ্তি অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী বলেন, ১৯৮৬ সাল থেকে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে নিচ্ছেন। দেশের মাত্র ৭ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে আসছে। বৃহৎ বুর্জোয়ারাই ভারত রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণিগুলির নেতৃত্ব করছে। কাজেই তারা তাদের শ্রেণিস্বার্থের দিকে নজর রেখেই শিক্ষানীতি নির্ধারণ করছে। স্বাধীনতার সংগ্রামের সময় দু'টি প্রধান লক্ষ্য নির্ধারিত হয় ঃ এক, ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র ; দুই, স্বাধীন ভারতে শাসনের সুফলগুলি সমস্ত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। উল্টোটা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে আজও কোটি কোটি ভারতবাসী বঞ্চিত। শিক্ষা সবচেয়ে অবহেলিত। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ হচ্ছে এখন। সরকার শিক্ষার দায়িত্ব দিচ্ছেন ব্যক্তিপুঁজির হাতে। তামিলনাড়ুতে ৫০% এবং অন্ধ্রে ৭০% self-financing college, আজ সরকার Development grant for education দিচ্ছেন না। অথচ ওই grantটাই তো শিক্ষাক্ষেত্রে working capital.

অধ্যাপক বিভূতি পট্টনায়েক শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণে বিপদের কথা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেন। সে বিপদ আজও রয়েছে, সে কথা বলে সকলকে সতর্ক করেন।

এস টি এফ আই-এর সভাপতি কার্তিক মন্ডল আগামী ২২শে নভেম্বর দিল্লীতে এস টি এফ আই ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে যে সংসদ অভিযানের ডাক দিয়েছে, সেই দাবিগুলি পাঠ করে ব্যাখ্যা করেন এবং ওড়িশার শিক্ষক সংগঠনগুলিকে ঐ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রকুমার জেনা ঘোষণা করেন, ওড়িশার ৩০টি জেলায় ও ব্লক স্তরে এই ১৫ দফা দাবি নিয়ে শিক্ষা কনভেনশন করা হবে।

ওড়িশার প্রয়াত শিক্ষক নেতা অনন্ত করের নামে 'অনন্ত কর স্মারক বক্তৃতা'র আয়োজন করা হবে আগামী অক্টোবর মাসে। এই শিক্ষা সেমিনার-এর মধ্যদিয়ে ওড়িশায় নতুনভাবে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা হলো।

— *নিজস্ব প্রতিনিধি*

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র উদ্যোগে লেখক-পাঠক সভা (অংশগ্রহণমূলক)

বর্ধমান বিভাগ

১৬ই আগস্ট, ২০০৬, বুধবার

স্থান ঃ সত্যপ্রিয় ভবন

ঃ অনুষ্ঠানসূচি ঃ

নিবন্ধীকরণ ঃ সকাল ৯-৩০ — ১০টা

প্রথম পর্ব

	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান	ঃ	সভাপতি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
১০-০০	উদ্বোধক	ঃ	অরুণ চৌধুরী, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক *নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি*
	স্বাগত ভাষণ	ঃ	শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক
	ভিত্তিপত্র উপস্থাপনা	ঃ	অপর্ণা সান্যাল (ব্যানার্জী), যুগ্ম সম্পাদক, শিক্ষা ও সাহিত্য
	সঞ্চালক	ঃ	*বিকাশ মন্ডল, সম্পাদক, শিক্ষা ও সাহিত্য*
১০-৪৫	দলগত বিভাজন	ঃ	**বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও সক্রিয়তা**
১-০০		ঃ	**মধ্যাহ্নভোজন**

দ্বিতীয় পর্ব

২-০০		ঃ	দলগত বিষয়ভিত্তিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সঞ্চালকদের লিখিত বক্তব্য ও সুপারিশ পাঠ
৩-০০	প্রশ্নোত্তরপর্ব	ঃ	উত্তরদাতা ১। অমিতাভ সেন, প্রাক্তন সম্পাদক, শিক্ষা ও সাহিত্য ২। অজিত বাগ, প্রাক্তন সম্পাদক, শিক্ষা ও সাহিত্য ৩। প্রশান্ত ধর, প্রাক্তন সম্পাদক, শিক্ষা ও সাহিত্য এবং উপস্থিত নেতৃবর্গ
৩-৪৫		ঃ	সঞ্চালকদের বক্তব্য, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও অংশগ্রহণকারীদের উত্তরপত্রের ভিত্তিতে লেখক-পাঠক সভার নির্যাস উপস্থাপন — রামরমণ ভট্টাচার্য, সদস্য, জার্নাল কমিটি
৪-০০		ঃ	সভাপতি কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন

ভিত্তিপত্র

'শিক্ষা ও সাহিত্য' সমিতির মুখপত্র — সংগ্রামের হাতিয়ার, এক শক্তিশালী মাধ্যম। সমিতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালীকে সবার কাছে পৌঁছে দিতে 'শিক্ষা ও সাহিত্য' প্রথম থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। 'শিক্ষা' ও 'সাহিত্যে'র যথাযথ মেলবন্ধন হলে একদিকে যেমন পত্রিকার মানোন্নয়ন সম্ভব তেমনি সংগঠনকেও মজবুত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা সম্ভব। মনে রাখতে হবে, সংগঠনের অবস্থান মাঝখানে। একপাশে শিক্ষা, অন্যপাশে সাহিত্য। তাই লেখক-পাঠকদের সবসময় সংগঠনের কথা মাথার রাখতে হবে। শিক্ষাসংক্রান্ত মননশীল ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ, শিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ লেখা, পেশা ও তার বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধান-সম্বলিত লেখা, শিক্ষার মানোন্নয়নে রাজ্য সরকারের ভূমিকা ও পদক্ষেপ এবং তার সুফলসংক্রান্ত বিভিন্ন লেখা, সমিতির অতীত ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখা যেমন কাম্য তেমনি অন্যদিকে আমাদের সমাজদর্শন, মূল্যবোধ, আদর্শ ও দায়বদ্ধতাকে সাহিত্যের গুণ বজায় রেখে কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির মধ্যদিয়ে পাঠকের কাছে তুলে ধরাও কাম্য। শিক্ষা ও সাহিত্যে'র দুই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 'শিক্ষা' ও 'সাহিত্য'। বিভিন্ন ধরনের লেখার মধ্যদিয়ে এই দুই অঙ্গের যথাযথ বিকাশ ও সমন্বয় 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-কে আরো সমৃদ্ধ করে তুলবে।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের আগ্রাসন ও আধিপত্যমূলক ভোগবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদের লেখনি চালনা করতে হবে। বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে 'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র লেখক-পাঠকগণ নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেন না। প্রতিবাদ, প্রতিরোধমূলক লেখা উঠে আসুক। মৌলবাদ, ফ্যাসিবাদ ও নানাবিধ সামাজিক শোষণ-পী ড়নের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে আমাদের আন্দোলন। সংস্কৃতি আজ নানাভাবে বিপন্ন। জাতীয় ক্ষেত্রে জাতপাত, কুসংস্কার, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা, ধর্মান্ধতা, অন্ধ ঐতিহ্য প্রভৃতির দ্বারা সংস্কৃতি আক্রান্ত। এসবের বিরুদ্ধে কলম ধরতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমস্যা আরো ভয়াবহ — সর্বগ্রাসী বিশ্বায়নী সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বের সমস্ত সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে একটামাত্র ভোগবাদী সংস্কৃতি চালু করতে চায়। মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে এ এক বিরাট অশনি সংকেত। বিশ্বজোড়া বৈচিত্র্যময় সব সংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটতে দিলে তা হবে আত্মহননের সমতুল। শিক্ষক সমাজই এই বিপদে পথ দেখাতে পারেন। তাদের সঙ্গে সমাজের সব অংশের নাড়ির যোগ। ভারতের আছে অফুরন্ত লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার, তাকে অবলম্বন করে বিশ্ব ভোগবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হবে। লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত নিবেদিতপ্রাণ মসি হাতে সংগ্রামী সৈনিকদল আমাদের পথ দেখাবে। যারা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেশ ও সমাজের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করে যথাযথ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি নানাবিধ সাহিত্যকর্মের মধ্যদিয়ে।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির একটা ভিন্নতর সমস্যা তৈরি হয়েছে। বঙ্গভাষী মানুষের বৃহত্তর অংশ থাকে ওপার বাংলায়। এক ভাষা এক সংস্কৃতির প্রবাহ ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কী? কাঁটাতারের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এবং মৌলবাদী আগ্রাসন কি সেই স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করছে না? অন্যদিকে ঝাড়খন্ডে, বিহারে ও আসামে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। সেখানে ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার দাপটে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি মুমূর্ষু। শিক্ষক সমাজের চেতনাতে কি এসব পরিস্থিতি আঘাত হানবে না?

চিরকালই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে দেশের মানুষ জানতে চায় শিক্ষক সমাজ কী ভাবছেন? কী তাঁদের পরামর্শ, যথার্থ পথ কী? সমাজ-ন্যস্ত এই দায়িত্ব আচার্যকুল এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই 'শিক্ষা ও সাহিত্য'কে তাঁরা হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিন, সমাজকে পথ দেখান, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুন। শিক্ষককে 'সমাজ গড়ার কারিগর' হিসাবে সার্থক করে তুলতে 'শিক্ষা ও সাহিত্য' উপযুক্ত ভূমিকা পালন করুক। সমিতির মুখপত্র আজন্ম এ কাজে ব্রতী, একে আরো সমৃদ্ধ করে তোলার দায়িত্ব বর্তমান প্রজন্মের লেখক সাহিত্যিকদের।

বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করার জন্য লিখতে হবে। সকলের জন্য শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে 'শিক্ষা ও সাহিত্য'কে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। স্বাধীনতার আগে, পরে এবং বামফ্রন্টের আমলে শিক্ষাচিত্রের পরিচয় দিয়ে প্রবন্ধ ও গল্প লিখতে হবে। যারমধ্যে গ্রামীণ জীবনের যে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে তা প্রতিফলিত হবে। আমরা 'কলাকৈবল্যবাদী' নই, আমরা নিরপেক্ষ নই, আমরা

জীবনের জন্য, মানুষের জন্য শিল্প-সাহিত্যের পক্ষে, আমরা প্রগতিশীল লেখার পক্ষে।

লেখার একদিকে যেমন লেখক বা স্রষ্টা থাকেন তেমনি অন্যদিকে থাকেন পাঠক বা উপভোক্তা। পাঠককে যদি আকৃষ্ট না করা যায়, যদি তাদের মধ্যে 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি না করা যায় তাহলে সংগঠনগত ও সাহিত্যগত উভয়বিধ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। তাই একদিকে যেমন সাহিত্যধর্মী লেখার মান ও পরিমাণ দুটোই বৃদ্ধি করতে হবে তেমনি অন্যদিকে পেশাসংক্রান্ত নানা বিষয়ে লেখা যুক্ত করতে হবে। এরসঙ্গে সাংগঠনিকভাবে প্রতিটি বিদ্যালয় ইউনিটে পত্রিকা পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। 'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বৈচিত্র্যের কথা সদস্যদের কাছে তুলে ধরতে হবে। জোন, মহকুমা ও জেলাস্তরে লেখক-পাঠক সভা সংগঠিত করতে হবে। এবংবিধ প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে 'শিক্ষা ও সাহিত্য'কে সদস্যদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

সমবেত গুণীজন। আসুন, আমরা এই লক্ষ্যে আমাদের এই লেখক-পাঠক সভাকে পরিচালিত করি। নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের মধ্যদিয়ে আমাদের এই সভার উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলি। সংগঠনের হাতিয়ার হিসাবে 'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র ভূমিকাকে আরো উজ্জ্বল এবং সংগঠনকে আরো সময়োপযোগী ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলি।

প্রতিবেদন

গত ১৬ই আগস্ট, ২০০৬ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র উদ্যোগে বর্ধমান বিভাগের জেলাগুলিকে নিয়ে একদিনের লেখক-



পাঠক সভা (অংশগ্রহণমূলক) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সত্যপ্রিয় ভবনে। সভার উদ্বোধন করেন সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক শ্রদ্ধেয় অরুণ চৌধুরী মহাশয়। শ্রী চৌধুরী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 'শিক্ষা ও সাহিত্য' সমিতির সূচনালগ্ন থেকেই সংগ্রামের অপরিহার্য হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। তিনি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন সমিতির এই পত্রিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু কবি কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। একে আরো শাণিত করতে, পাঠকদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে এই ধরনের লেখক-পাঠক সভা অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। এরপর স্বাগত ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি সভায় অংশগ্রহণকারী লেখক, পাঠকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ভোগবাদী বিশ্বায়নের প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে। এই লড়াইয়ের প্রতিফলন যেন আপনাদের লেখায় থাকে। পত্রিকা যেন প্রকৃত অর্থে সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এরপর লেখক-পাঠক সভায় ভিত্তিপত্র উপস্থাপন করেন 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-র সম্পাদক বিকাশ মন্ডল। ভিত্তিপত্র উপস্থাপনের পরে তিনি লেখক-পাঠকদের উৎসাহিত করে বলেন, আপনাদের আন্তরিকতা ও আগ্রহই পত্রিকার মূলধন, আপনারাই পত্রিকার মান-মর্যাদা ধরে রেখেছেন, আপনাদেরই দায়িত্ব এর মানকে আরো বৃদ্ধি



করার, সবার কাছে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলার। তিনি বলেন, আপনারা যেমন ভিত্তিপত্রের আলোকে আলোচনায় অংশ নেবেন তেমনি আলোচনার জন্য দলভিত্তিক যে বিষয়গুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলির প্রতিফলন 'শিক্ষা ও সাহিত্যে' যথাযথ ঘটছে কিনা এবং ভবিষ্যতে এই প্রতিফলন কীভাবে পত্রিকার মানোন্নয়নে সহায়ক হবে সে বিষয়ে একজন সঞ্চালকের নেতৃত্বে দলগতভাবে আলোচনা করবেন এবং তারপর সঞ্চালকের মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য ও পরামর্শ সভায় উপস্থিত করতে হবে। এছাড়াও আর কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা সমিতির মুখপত্রে থাকা উচিৎ সে বিষয়ে দলগত পরামর্শ লিখে জানাতে তিনি অনুরোধ করেন। সমিতির এই উদ্যোগকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মূল্যবান ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন 'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র দুই শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন সম্পাদক অমিতাভ সেন এবং অজিত বাগ মহাশয়। তাঁরা দুজনেই অতীত স্মৃতিচারণার মাধ্যমে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন এবং পত্রিকার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। এরপর আগত প্রতিনিধিরা ৬টি দলে বিভক্ত হয়ে ৬টি পৃথক বিষয়ের উপর উপস্থাপক ও সঞ্চালকের নেতৃত্বে আলোচনায় অংশ নেন। 'অংশগ্রহণকারীদের মতামত' শিরোনামে ২০টি প্রশ্নসম্বলিত একটি প্রশ্নমালা পূর্বেই অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া হয় এবং তাঁরা তাঁদের মতামত লিখে জমা দেন। সভার দ্বিতীয় পর্বে ৬টি দলের সঞ্চালকগণ তাঁদের লিখিত মতামত ও পরামর্শ সভায় পড়ে শোনান। তারপর সঞ্চালকদের বক্তব্য ও অংশগ্রহণকারীদের উত্তরপত্রের ভিত্তিতে লেখক-পাঠক সভার সারাৎসার উপস্থিত করেন এই সভার সভাপতি, জার্নাল কমিটির প্রবীণ সদস্য শ্রদ্ধেয় রামরমণ ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলেন, ফেব্রুয়ারিতে প্রেসিডেন্সি বিভাগের লেখক-পাঠক সভায় এবং আজকের বর্ধমান বিভাগের এই লেখক-পাঠক সভায়



অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের উৎসাহ এবং তাদের মতামত আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা আশা করি আগামীদিনে জেলাগুলিতেও আপনারা এই ধরনের সভা সংগঠিত করবেন এবং আমাদের সংগ্রামের হাতিয়ার 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-কে আরো শাণিত করে তুলতে সাহায্য করবেন, নতুন লেখকগোষ্ঠী তৈরির কাজ অব্যাহত রাখবেন। তিনি আরো বলেন, শুধু লেখকগোষ্ঠী তৈরি নয়, আমাদের সমান নজর দিতে হবে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করার দিকেও। তবেই এই ধরনের সভা করার উদ্দেশ্য সার্থক হবে। এরপর সবাইকে

অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার দল (১)

বিষয় : বিপন্ন বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি দেশে দেশে

উপস্থাপক : সোনালী দত্ত ● সঞ্চালক : রবীন্দ্রনাথ সর

অংশগ্রহণকারী	নাম	জেলা
১।	রবীন্দ্রনাথ সর	পশ্চিম মেদিনীপুর
২।	মিতালী চ্যাটার্জী	পুরুলিয়া
৩।	দেবাশিস ব্যানার্জী	বর্ধমান
৪।	পার্থ চক্রবর্তী	পূর্ব মেদিনীপুর
৫।	অশোক পাল	পশ্চিম মেদিনীপুর
৬।	জয়ন্ত দত্ত	মুর্শিদাবাদ

বক্তব্য

১) বাংলাভাষা চর্চার জন্য সচেতনতা বাড়াতে হবে।

ক) সরকারী বিজ্ঞপ্তিগুলি অবশ্যই সব বাংলাভাষায় প্রকাশ করা দরকার।

খ) দূরদর্শনে বেশিরভাগ হিন্দীতে বা ইংরাজীতে প্রচার করা হয়। বাংলায় খুবই কম। ছেলেমেয়েদের বাংলা অনুষ্ঠান দেখার আগ্রহ কম। সুতরাং বাংলায় ভালো লেখা ও প্রোগ্রাম তৈরি ও প্রচার একান্ত জরুরী।

২) শিক্ষা ও সাহিত্যে শিক্ষকদের আকর্ষণ করবে এমন লেখা বাড়াতে হবে ও ইউনিট স্তরে আলোচনা করা একান্ত দরকার। লেখা সংগ্রহের কাজেও হাত লাগাতে হবে।

৩) বিশুদ্ধ উচ্চারণ দরকার, প্রচার-বিক্রয় করা জিনিসের হিন্দী-ইংরাজী নয়, বাংলায় হোক।

৪) ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী লেখা, প্রয়োজনে পাঠ্যবিষয়ের উপর আলোচনা লেখা হলে আগ্রহ বাড়বে।

৫) দেশের বরেণ্য লোকেদের জীবনী, আদর্শ অবশ্যই লেখা ও প্রচার দরকার। যেমন — রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত। এর কতটা সুফল পাওয়া গেল দেখতে হবে।

৬) ভাষাদিবস পালন, বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের অবদান নিয়ে আলোচনা দরকার।

৭) শুরু থেকে শিক্ষা ও সাহিত্যের কিছু বিষয়কে পুনরায় প্রকাশ করতে হবে।

৮) একই দেশের/রাজ্যের যে আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে সেগুলিকে লেখার মাধ্যমে শিক্ষক ও ছাত্রদের জানাতে হবে। পুনরুদ্ধারের চেষ্টা একান্ত জরুরী।

৯) বিদ্যালয়স্তরে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের অবশ্যই বিশুদ্ধভাবে বাংলাভাষায় বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। এতেও প্রচার বাড়বে।

১০) ঝাড়খন্ড, বিহার, উড়িষ্যায় যেখানে অনেক বাঙালী থাকেন সেইসব জায়গায় আন্দোলন করে বিষয়টি পড়ানো (পাঠ্য) ও চর্চার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১) বিজ্ঞান বিষয়গুলিতে পরিভাষার ব্যবহার বন্ধনীতে দিয়ে বিজ্ঞান প্রবন্ধ লেখা বাড়াতে হবে। গবেষণাপত্রগুলিকে অবশ্যই বাংলাভাষায় প্রকাশ হওয়া দরকার, যা সাধারণের মধ্যেও পৌঁছাতে পারে।

১২) সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র বাংলাকে প্রধান ভাষারূপে মর্যাদা দেওয়া একান্ত কাম্য। সরকারী (পশ্চিমবঙ্গ) কার্যালয়ে ইংরাজীতে লেখা, দরখাস্ত করতেও হয় ইংরাজীতে, এর পরিবর্তন দরকার।

১৩) শিক্ষাবিজ্ঞানকে অস্বীকার করে রাজ্য সরকার পুনরায় প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এটা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

১৪) প্রতিটি বিষয়-শিক্ষককেই নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি শিক্ষক মহাশয়দের প্রথম শ্রদ্ধাবান হতে হবে।

ভগৎ সিং দল (২)

বিষয় : 'শিক্ষা ও সাহিত্য' আজন্ম সমিতির সংগ্রামের হাতিয়ার

উপস্থাপক : বিকাশ মন্ডল ● সঞ্চালক : সমীর মন্ডল

অংশগ্রহণকারী	নাম	জেলা
১।	সমীরণ মণ্ডল	হুগলী
২।	উপেন পাত্র	পশ্চিম মেদিনীপুর
৩।	শেখ মণিরুল ইসলাম	পশ্চিম মেদিনীপুর
৪।	প্রকাশ কুসুম দাস	পূর্ব মেদিনীপুর
৫।	সুমাল্য দাস	বর্ধমান
৬।	নারায়ণ চন্দ্র দাস	পুরুলিয়া
৭।	শর্মিলা রায়	হুগলী
৮।	বংশীধর সাহু	বাঁকুড়া

বক্তব্য

১) 'শিক্ষা ও সাহিত্য' জন্মলগ্ন থেকেই সংগ্রামের হাতিয়ার,

১৯২১ সাল থেকেই পরাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত দাবীদাওয়ার স্বার্থে এই পত্রিকার জন্ম। উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সমাজে সর্বস্তরে শিক্ষার আলোকবার্তা বহন করে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের চেতনা জাগ্রত করা। সেই ধারা আজও বহমান।

২) শিক্ষা ও সাহিত্য দু'টি বিষয় একে অপরের পরিপূরক। দৈনন্দিন জীবনচর্চার যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করি তারই প্রতিফলন আমাদের পত্রিকায় ঘটাতে হবে।

৩) সাহিত্যানুরাগী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পাঠে অনুরাগী করে তোলার লক্ষ্যে বিষয়-শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ক পৃথক একটি বিভাগ খোলা হোক এবং প্রতিমাসে বিষয়-বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপযোগী লেখা প্রকাশ করা হোক।

৪) ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিশোর বিভাগ চালু করা যায় কিনা পত্রিকা দপ্তর ভাববেন, যাতে পত্রিকাটি ছাত্রমহলেও জনপ্রিয় হয়। তাছাড়া আজ যারা ছাত্র কয়েক বছর পরে তারাই তো শিক্ষকতা কাজে যোগ দিচ্ছে। তাই গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মূলকথাগুলি ছাত্রদের জানানো দরকার। তা দপ্তর ভাববেন।

৫) ইংরেজি বিভাগটিকে উন্নততর করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হোক।

৬) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অধুনা-মান্য বানানবিধি সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা হোক।

৭) আমরা সমাজতন্ত্র চাই এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের সাহিত্যকে আরও বিকশিত করে সকল মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে।

৮) ভারতীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করে নজরুল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখদের দিশারী করে শিক্ষা ও সাহিত্য বিকশিত হোক।

৯) সমিতির বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষার্থীদের রচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হোক।

১০) সমাজের অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের জীবন-যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি পত্রিকায় প্রতিফলিত হোক।

১১) কুসংস্কার ও অপবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতামূলক লেখা প্রকাশিত হোক।

১২) এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সমাজের বিভিন্নস্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সচেষ্ট হতে হবে।

১৩) অন্যান্য রাজ্যের শিক্ষক আন্দোলন, শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলন সম্পর্কে পত্রিকা সকলকে অবগত করুক।

১৪) প্রচারমাধ্যমের নেতিবাচক ভূমিকার মোকাবিলা করতে 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-এ ইতিবাচক লেখা প্রকাশিত হোক।

মঙ্গল পান্ডে দল (৩)

বিষয় : বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা ও
'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র লেখকদের ভূমিকা

উপস্থাপক : সত্য সাউ ● সঞ্চালক : প্রিয়রঞ্জন ঘটক

অংশগ্রহণকারী	নাম	জেলা
১।	প্রিয়রঞ্জন ঘটক	হুগলী
২।	অশোক ব্যানার্জী	পুরুলিয়া
৩।	অমিয় কুমার পাল	পুরুলিয়া
৪।	উমাশঙ্কর নিয়োগী	পশ্চিম মেদিনীপুর
৫।	শিখা বিশ্বাস	

বক্তব্য

১) শিক্ষা ও সাহিত্য সুস্থ চেতনা এবং সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের জন্য সহায়ক। তাই 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকার লেখকদের খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে।

২) সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সাম্রাজ্যবাদ আরও শক্তিশালী হয়ে সমস্ত দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ ধ্বংস করে দিতে চাইছে। এই একমেরুবিশ্বের বিরুদ্ধে আদর্শ বিকল্প হিসেবে সংগঠিত হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব। পত্রিকায় এই বিষয়ের প্রতিফলন চাই।

৩) ইরাক, আফগানিস্তান, প্যালেস্তাইন ইত্যাদি দেশে সাম্রাজ্যবাদ যখন যুদ্ধ নামিয়ে এনেছে এবং সারা পৃথিবী তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে তখন ভারতের মনমোহন সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহন করছে। এমনকী তারা সংসদকে না জানিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং মার্কিন দেশ থেকে পরমাণু জ্বালানি আমদানি করতে চলেছে।

৪) আমাদের সংস্কৃতি আজ সবচেয়ে বেশি করে আক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা। এই অবস্থায় নাগরিকদের বিশেষত সুকুমারমতি শিক্ষার্থীদের রুচিবোধ গড়ে তোলায় পত্রিকার লেখকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। যেমন (ক) লেখায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথা বলতে হবে। (খ) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ের কাহিনিকে উপজীব্য করতে হবে। (গ) সাম্রাজ্যবাদ নয়, শেষ কথা বলবে খেটে-খাওয়া মানুষ — লেখকদের এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই লিখতে হবে। (ঘ) অর্থনৈতিক শোষণের শিকার মানুষের ছবি পরিস্ফুট করতে হবে (ঙ)

দেশীয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের কাহিনি তুলে ধরতে হবে। যেমন মহাবিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ও ওয়াহাবি আন্দোলন।

মাতঙ্গিনী হাজরা দল (৪)

বিষয় ঃ বিশ্বায়নী থাবায় আক্রান্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি
উপস্থাপক ঃ অরুণ চৌধুরী ● সঞ্চালক ঃ সমীর কর্মকার

অংশগ্রহণকারী	নাম	জেলা
১।	সমীর কর্মকার	বাঁকুড়া
২।	সচ্চিদানন্দ মুখার্জী	পুরুলিয়া
৩।	মল্লিকা সান্যাল	পুরুলিয়া
৪।	সমরেশ দাস	পূর্ব মেদিনীপুর
৫।	সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়	বর্ধমান
৬।	অরূপ চৌধুরী	বর্ধমান
৭।	পারুল ভট্টাচার্য	দক্ষিণ ২৪ পরগণা

বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিম্নলিখিত অবলম্বন করা যেতে পারে—

প্রতিরোধের উপায়

শিক্ষা

১) শিক্ষাকে বিশ্বায়নের আগ্রাসী ভূমিকা থেকে মুক্ত করার জন্য বিশ্বায়নের কু-প্রভাব সম্পর্কে বেশি লেখা প্রকাশ করতে হবে।

২) ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিশ্বায়ন সম্পর্কে বিতর্ক সভা করতে হবে।

৩) বিদ্যালয় ইউনিটেই বিশ্বায়নের বিপদ সম্পর্কে আলোচনাসভা করতে হবে।

৪) প্রথাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের নির্ভরশীলতার বৃদ্ধি ঘটাতে হবে।

৫) পাঠক্রমের মধ্যে বিশ্বায়ন বিরোধী রচনার সংখ্যা বাড়াতে হবে।

সংস্কৃতি

১) বিশ্বায়নের ফলে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করতে হবে

২) ঐতিহ্যমন্ডিত হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩) পাঠক্রমে সুস্থ সংস্কৃতিসম্পন্ন রচনা ও চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৪) শিক্ষা ও সাহিত্যে লোকসংস্কৃতি ও ধ্রুপদী সংগীত চর্চায় আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য রচনার প্রকাশ করতে হবে।

৫) মনীষীদের সংগ্রামী জীবন ও আদর্শ বিষয়ক আলাপ-আলোচনার সুযোগ রাখতে হবে।

৬) পঃবঙ্গের ঐতিহ্যমন্ডিত গ্রামীণ মেলা বিষয়ক।

৭) বিদ্যালয়ে প্রগতিশীল নাট্যচর্চার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

আসফাকুল্লা খান দল (৫)

বিষয় ঃ বামফ্রন্টের শিক্ষানীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ এবং তার সুফল শহরে ও গ্রামে
উপস্থাপক ঃ দীননাথ সেন ● সঞ্চালক ঃ সুনীল কর্মকার

অংশগ্রহণকারী	নাম	জেলা
১।	সুনীল কর্মকার	বীরভূম
২।	প্রভাত কুমার মুখার্জী	পুরুলিয়া
৩।	লায়লুন নেহার বেগম	বীরভূম
৪।	পূর্ণচন্দ্র গিরি	পূর্ব মেদিনীপুর
৫।	শ্যামল বেরা	পূর্ব মেদিনীপুর
৬।	ব্যোমকেশ দাস	পুরুলিয়া

বক্তব্য

বামফ্রন্টের শিক্ষানীতি মূলত তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরী যথাক্রমে— (১) অবৈতনিক শিক্ষা (২) সর্বজনীন শিক্ষা (৩) অনগ্রসর শ্রেণির জন্য শিক্ষা। সে সম্পর্কে সাফল্য ও ব্যর্থতা বিষয়ে আলোচনা হলো।

১। অবৈতনিক শিক্ষা ঃ (ক) দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক হয়েছে। (খ) অনেক ছাত্র-ছাত্রী পিছিয়ে থাকা শ্রেণি এই সুযোগ নিতে এগিয়ে এসেছে। (গ) এই সুযোগের ফলে অনেক ভালো ভালো ছেলে উচ্চ-শিক্ষায় সুযোগ পেয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আর্থিক ব্যয়ভার সরকার দিয়েছে।

সীমাবদ্ধতা ঃ (ক) দায়ভার সম্পূর্ণ সরকারের উপর থাকার ফলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আসছে (খ) গৃহশিক্ষকতায় যেখানে অভিভাবকরা বিরাট আর্থিক ব্যয়ভার বহন করছেন সেখানে অর্থনৈতিক অগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুটা ব্যয়ভার বহন করতে পারে।

পরিকাঠামোর অভাব দূর করা—

২। সর্বজনীন শিক্ষা ঃ বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠাক্ষণে যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল শিক্ষাকে সর্বস্তরে প্রসারিত করা। ফলে সামাজিক শোষণ বঞ্চনার

শিকার যাঁরা তাদের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি হবে। শিক্ষার অধিকার সকলের এই বোধ থেকেই শিক্ষা সম্প্রসারণে নানা পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। 'সর্বশিক্ষা অভিযান' এরকম একটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মিলে আগামী ২০১০ সালের মধ্যে ৫-১৪ বছরের সমস্ত শিশুকে এই প্রকল্পে আনা হবে।

বামফ্রন্ট সরকার এতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে আসছে।

সীমাবদ্ধতা ঃ (ক) গুণগতমান আশানুরূপ নয়। (খ) শিক্ষক-শিক্ষণকে গুরুত্ব দিতে হবে। (গ) Drop out বন্ধ করতে হবে। (ঘ) নিরক্ষর সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

৩। অনগ্রসর শ্রেণির জন্য শিক্ষা ঃ (ক) এঁরা সমাজের বৃহত্তম অংশ এবং তাই এঁদের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারিত করার সরকারী উদ্যোগ মহৎ। (খ) এতে সমাজ অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর হবে। (গ) অল্প খরচে এই শিক্ষা লাভ করা যেতে পারে। (ঘ) মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা আর্থিক সহায়তা পান।

সীমাবদ্ধতা — অনগ্রসর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা দরকার এবং সিলেবাস সহজ ও বাস্তবধর্মী হওয়া প্রয়োজন।

সূর্য সেন দল (৬)

বিষয় ঃ চাই সার্থক রচনা — চাই পাঠক, অবশ্যই সুপাঠক

উপস্থাপক ঃ রামরমণ ভট্টাচার্য ● সঞ্চালক ঃ আবুল কালাম খান

অংশগ্রহণকারী	নাম	জেলা
১।	আবুল কালাম খান	পূর্ব মেদিনীপুর
২।	সুশীল রঞ্জন মাইতি	পূর্ব মেদিনীপুর
৩।	মানস মন্ডল	বর্ধমান
৪।	দিলীপ কুমার গোস্বামী	পুরুলিয়া
৫।	মণীন্দ্রনাথ বাগ	হুগলী
৬।	সুহাস ভট্টাচার্য্য	হুগলী

বক্তব্য

১) সার্থক রচনা সেটাই যার মধ্যে সাহিত্যরস, আঙ্গিক, মূল্যবোধ, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্ব ও দর্শন, আকাঙ্ক্ষার যথাযথ প্রতিফলন ঘটে।

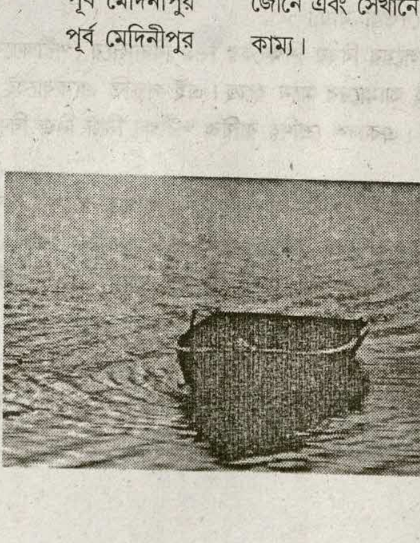
২) নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আদর্শ ও ঐতিহ্য অনুযায়ী তাদের মুখপত্রে প্রকাশিত রচনায় ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তব্য থাকবে।

৩) রচনায় থাকতে হবে বৈজ্ঞানিক চেতনা ও মূল্যবোধে সম্পৃক্ত শোষণ এবং দূষণমুক্ত সমাজে সুনাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্য। আর থাকবে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের কথা।

৪) সমালোচনা ও আত্মসমালোচনাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

৫) পত্রিকার বর্ষসেরা লেখকদের (বিভিন্ন বিভাগের) পুরস্কৃত করতে হবে এবং প্রতিবছর ন্যূনতম এই জাতীয় আলোচনাসভার আয়োজন করতে হবে।

৬) লেখক-পাঠকসভা করতে হবে প্রতিটি ইউনিটে, জোনে এবং সেখানে পত্রিকা উপ-সমিতির সদস্যদের উপস্থিতি কাম্য।



সাধারণ সম্পাদকের পত্র

মাননীয় সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ
বিদ্যাসাগর ভবন, কলকাতা

মহাশয়,

আগামী ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা সম্পর্কে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির অভিমত আপনাকে জানাতে চাই।

আমরা জানতে পারলাম সংসদ একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা নতুন পদ্ধতিতে পরিচালনা করবে। গত বছরে যে পদ্ধতিতে সংসদ একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তাতে বাংলার শিক্ষক সমাজকে ও বিদ্যালয় প্রশাসনগুলিকে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তবে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি সংসদকে যথোপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে এবং সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকরী করার মধ্যদিয়ে উক্ত পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে কোনরকম স্বীকৃতি লাভের অপেক্ষা না করেই। ২০০৭ সালের একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা সম্পর্কে সংসদ যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে আমাদের আশঙ্কা তাতে নতুন জটিলতা তৈরী হবে।

একই সময়ে পরীক্ষা চলবে একাদশ, দ্বাদশ এবং অনেক বিদ্যালয়ে পঞ্চম-নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষাও। একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা শুরুর সময় ১১টা থেকে (বেলা ১২টার পরিবর্তে) হওয়া উচিত।

দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে সংসদ-নির্ধারিত একাদশ শ্রেণির পরীক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার সুষ্ঠু পরিকাঠামো সর্বত্র নেই। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষাসূচির ফাঁকা দিনগুলিতে অনেক বিদ্যালয়েই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা নিতে হবে। এই ধরনের বিদ্যালয়গুলিতে কয়েকদিন আগেই মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করতে হবে। সংসদের পরিকল্পনা অনুসরণ করলে প্রায় ক্ষেত্রেই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষাগ্রহণের মূল কেন্দ্রকেই পরিকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে একাদশ শ্রেণির পরীক্ষার মূল কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে যা একপেশে অহেতুক বাড়তি চাপ বলেই গণ্য হবে। গত বছরের পদ্ধতি অনুসরণ করে একাদশ শ্রেণির প্রশ্নপত্র সংসদ সরবরাহ করবে ঠিকই, কিন্তু প্রশ্নপত্র বন্টনকেন্দ্র অনেক বেশি বাড়ানো দরকার যাতে দ্রুত ৫/৬টি বিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র পৌঁছে দেওয়া যায়।

সংসদের এবারের ভাবনায় এক বিদ্যালয়ের বিষয়-শিক্ষকের ভিন্ন বিদ্যালয়ে (পরীক্ষাকেন্দ্রে) গিয়ে উত্তরপত্র সংগ্রহ করার পরিকল্পনাটি তাৎক্ষণিক চিন্তাপ্রসূত বলেই আমাদের মনে হচ্ছে। এই পদ্ধতি একেবারেই বাস্তবসম্মত নয়। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে নতুন জটিলতা না বাড়ানোই উচিত। একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা নিজ নিজ বিদ্যালয়ে হওয়াটাই এই পর্যায়ে সঠিক হবে।

সবশেষে জানাই, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি সদস্য-সদস্যাদের পেশাগত স্বার্থের উপরে স্থান দেয় প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের স্বার্থকে। একাজে আমরা দায়বদ্ধতা বজায় রেখেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদকে সহযোগিতা করতে চাই। তবে সংসদের প্রশাসনিক সুবিধার অভাব থাকলে তা পূরণে সবিনয়ে আমাদের সামর্থহীনতা জ্ঞাপন করছি।

ধন্যবাদান্তে,

তারিখ ঃ ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

সাধারণ সম্পাদকের পত্র

মাননীয় পার্থ দে

বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহাশয়,

১৯৯০ সালের জুন মাসে রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তরের এক নির্দেশনামায় [G.O. No. 163 Edn (B) dt 15.6.90] ১৯৮১ সালের ১ এপ্রিলের আগে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেনশন প্রকল্পের অধীনে আনা হয়, কিন্তু ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে আকস্মিকভাবে বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর থেকে এক নির্দেশনামা জারি করে (G.O. No. 126 SE (B) dt 12.4.06) এইসব অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) পেনশন দেওয়ার জন্য যে নির্দেশনামা জারি করা হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। গত আটমাস যাবৎ তাঁদের আয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সমিতির পক্ষ থেকে অবিলম্বে এঁদের পেনশন পুনরায় চালু করার জন্য দাবি জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তারিখ ঃ ২৮.৮. ২০০৬

সাধারণ সম্পাদক, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

●

মাননীয় অসীম দাশগুপ্ত

অর্থমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহাশয়,

দু'হাজার ছয়ের শারদোৎসব ও ঈদ উৎসবের মাসের বেতন উৎসব শুরুর এক সপ্তাহ আগে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের হাতে দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

উৎসব উপলক্ষে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের এবছর মাথাপিছু চারশত টাকা একস্‌গ্রেসিয়া দেবার প্রস্তাব রাখছি। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মূল বেতনের সঙ্গে ৫০ শতাংশ ডি এ যুক্ত করে দেবার প্রস্তাব রাখছি।

আশা করি, প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত করে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

তারিখ ঃ ৫.৯.২০০৬

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

●

মাননীয় পার্থ দে

বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহাশয়,

দু'হাজার ছয়ের শারদোৎসব ও ঈদ উৎসবের মাসের বেতন উৎসব শুরুর এক সপ্তাহ আগে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের হাতে দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

উৎসব উপলক্ষে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের এবছর মাথাপিছু চারশত টাকা একস্‌গ্রেসিয়া দেবার প্রস্তাব রাখছি। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মূল বেতনের সঙ্গে ৫০ শতাংশ ডি এ যুক্ত করে দেবার প্রস্তাব রাখছি।

আশা করি, প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত করে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

তারিখ ঃ ৫.৯.২০০৬

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

আটটি বামপন্থী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনের উদ্যোগে

যৌথ কনভেনশন

স্থান ঃ সত্যপ্রিয় ভবন

তারিখ ঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬

সময় ঃ বেলা ১টা

আলোচ্য বিষয় ঃ মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬

বন্ধুগণ,

১৯৯৩ সালে নয়াদিল্লীতে ইউনেস্কো সকল শিশুর জন্য শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। ওই সম্মেলন থেকে প্রারম্ভিক শিক্ষাকে (৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের) সম্পূর্ণরূপে সর্বজনীন করা এবং নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছিল। ওই সম্মেলন শেষে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসীমা রাও ভারতে প্রারম্ভিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

এই অঙ্গীকার গ্রহণের বারো বছর পরে আমরা লক্ষ্য করছি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের যে শিশুরা এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে গেছে, সারা বিশ্বে তাদের সংখ্যা ১০ কোটি ৩০ লক্ষ — তার মধ্যে ভারতে ২ কোটি ১০ লক্ষ। বিশ্বের ১৭ শতাংশ মানুষের বাস যে ভারতে সেখানে বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা বিশ্বের মোট শিশুদের ২০·৪ শতাংশ রয়ে গেছে।

মাননীয় অর্জুন সিংহ এখন কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর তত্ত্বাবধানে গত ১৬ই জুন '০৬ সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক (৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্তদের শিক্ষা) শিক্ষা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব দেশের রাজ্য সরকারগুলির কাছে পাঠানো হয়েছে। এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, কেন্দ্র এই সম্পর্কে আর কোনও আইন তৈরী করবে না। রাজ্যগুলিকেই আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সেই আইনের একটি নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। নাম ঃ মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬। এরসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা সচিব চম্পক চ্যাটার্জীর একটি চিঠি রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে। এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা। বিষয়টি সংসদে আলোচিত হয়নি। সর্বজনীন আবশ্যিক প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তার কোনো কথাই বলা হয়নি। উপরন্তু, রাজ্যগুলিকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, রাজ্য বাজেটের ব্যয়ের প্রধান ও প্রথম খাত হবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং দ্বিতীয় প্রধান খাত হবে শিক্ষা। শিক্ষাটা কিন্তু যুগ্ম তালিকাতেই আছে। বর্তমানে রাজ্যগুলি তার বাৎসরিক ব্যয়-বরাদ্দের ১২ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ ধার্য করে শিক্ষার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান আর্থিক বছরে বরাদ্দ করেছে তার মোট ব্যয়-বরাদ্দের ৪·৩ শতাংশ। আজও কেন্দ্রীয় সরকার জি ডি পি-র ৬ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন না। সুতরাং রাজ্যগুলির প্রতি এই উপদেশ বর্ষণ অর্থহীন।

রাজ্যগুলিকে এই বিল গ্রহণ করার জন্য টাকার টোপ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, যে রাজ্য কেন্দ্রের বর্তমান প্রস্তাব পুরোপুরি মান্য করবে না, সেই রাজ্য একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্প বাবদ অনুমোদিত ব্যয়ের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে পাবে। আর যে রাজ্য অক্ষরে অক্ষরে কেন্দ্রীয় প্রস্তাব মেনে নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তারা ওই প্রকল্প বাবদ অনুমোদিত ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ পাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে। রাজ্যগুলির পক্ষে এই শর্ত অসম্মানজনক।

আজ কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার একদিকে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের প্রয়াস চালাচ্ছে, অন্যদিকে প্রারম্ভিক শিক্ষা বিস্তারের সমস্ত আর্থিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব থেকে চতুরালি করে দূরে সরে যাচ্ছে বিশ্বায়নী উদারনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে। দেশব্যাপী এর বিরুদ্ধে শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই জরুরী কাজটির অঙ্গ হিসাবেই আজকের এই কনভেনশন

আহ্বান করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই কনভেনশন শিক্ষার ওপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্দেশ্যেই আহূত।

আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো ঃ কেন্দ্রীয় সরকারকেই প্রারম্ভিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য সমস্ত আর্থিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব বহন করতে হবে এবং এজন্য সংসদে কেন্দ্রীয় সরকারকেই আইন প্রণয়ন করতে হবে।

অভিনন্দন সহ,

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক
নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

রাজকুমার রাহা
সাধারণ সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ

সুবোধ দত্ত
সাধারণ সম্পাদক
বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি

তড়িৎ ব্রহ্মচারী
সাধারণ সম্পাদক
সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি

প্রদীপ বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক
নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

সুকুমার চক্রবর্তী
সাধারণ সম্পাদক
প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ (পশ্চিমবঙ্গ)

জওহরলাল চ্যাটার্জী
সাধারণ সম্পাদক
বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

সুদীপ নারায়ণ গোস্বামী
সাধারণ সম্পাদক
সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

আটটি বামপন্থী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনের উদ্যোগে

যৌথ কনভেনশন

স্থান ঃ সত্যপ্রিয় ভবন (এ বি টি এ'র রাজ্য দপ্তর)

তারিখ ঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬

সময় ঃ বেলা ১টা

আলোচ্য বিষয় ঃ মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬

উদ্বোধক ঃ শ্রী পার্থ দে, বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আলোচক ঃ শ্রী ভবেশ মৈত্র, শ্রী কান্তি বিশ্বাস

প্রশ্নোত্তরপর্ব থাকবে

সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

(স্থাপিত-১৯২১)

সত্যপ্রিয় ভবন

পি-১৪, গণেশ চন্দ্র এভেনিউ, কলকাতা

বুলেটিন

১২ই সেপ্টেম্বর ২০০৬ • কেবলই সদস্যদের জন্য

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে ৩রা নভেম্বর কেন্দ্রীয় সমাবেশ সফল করুন

আগামী ৩রা নভেম্বর, ২০০৬ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে রানি রাসমণি এভেনিউতে বেলা ১টায় কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। ২০০৬ সালের বার্ষিক সাধারণ সভাগুলি এবং মহকুমাগুলির কার্যকরী কমিটি ও জেলা কাউন্সিলগুলির এক বছরের পালিত কর্মসূচির ওপর সভাগুলি শেষ হয়েছে। এই সভাগুলির রিপোর্ট রাজ্য দপ্তরে আসছে। ৮০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত দাবিগুলি নিয়ে এবং সর্বভারতীয় শিক্ষা কনভেনশনে উত্থিত ১৫ দফা দাবি নিয়ে এইসব সভায় আলোচনা হয়েছে। শেষ হয়েছে মহকুমার অতিরিক্ত জেলা পরিদর্শকের দপ্তরের সামনে উল্লিখিত দাবিগুলির ভিত্তিতে সমাবেশ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি। পূর্বে ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী **৩রা নভেম্বর, ২০০৬-এ এবার অনুষ্ঠিত হবে কেন্দ্রীয় সমাবেশ। স্থান ঃ রানি রাসমণি এভেনিউ, কলকাতা। সময় ঃ বেলা ১টা।** এই সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে মহোদয়। সমিতির পক্ষ থেকে আমরা তাঁর হাতে দাবি-সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেব। কিছু দাবি আছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, কিছু দাবি আছে রাজ্য সরকারের কাছে।

কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার আজ সাম্রাজ্যবাদের ছোট অংশীদার হিসেবে কাজ করে চলেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের সরকারকে শুধু স্ট্রাটেজিক পার্টনার করার শর্ত চাপিয়ে দেয়নি, তারা আমাদের দেশে কৃষি গবেষণা সহ কৃষক ও কৃষকের স্বার্থের পরিপন্থী সমস্ত ক্ষেত্রেই শর্ত আরোপ করে চলেছে। সেই শর্ত মেনে এন ডি এ সরকারের মতো ইউ পি এ সরকার একটির পর একটি কৃষক-মারা নীতি নিয়ে চলেছে। তারই পরিণতিতে দেশের কয়েক হাজার কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। কৃষিতে সরকারী বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে কমেছে। এখন চুক্তিপ্রথায় চাষ, ১০০ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগ সহ কর্পোরেট প্রথায় চাষ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ না দেবার ঘটনা ঘটে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদ তোষণ নীতির ফলে ১ লক্ষ ১৬ হাজার মানুষ কাজ হারিয়েছে।

লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে বেসরকারীকরণের পথ প্রশস্ত করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ব্যাঙ্ক, বিমানবন্দর, বীমা ও টেলিকম ক্ষেত্রে বিদেশী লগ্নী বৃদ্ধির পথ থেকে সরকারকে সরানো যায়নি। ই পি এফ, জি পি এফ এবং স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার কমিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ এবং প্রবীণ নাগরিকদের স্বার্থহানি করছে।

শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও কন্ট্রিবিউটারী পেনসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিল গ্রহণ করে পেনসন তহবিলকে বেসরকারী পুঁজির স্বার্থে শেয়ার বাজারে পাঠাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেন্দ্রীয় সরকার। তাই সমিতির দাবি, অবিলম্বে সর্বনাশা কন্ট্রিবিউটারী পেনসন স্কীম প্রত্যাহার করতে হবে। গত ১৮ই

আগস্ট দিল্লিতে নয়া পেনসন ব্যবস্থা ও পেনসন বিল প্রত্যাহারের দাবিতে সংসদ অভিযানে সামিল হয়েছে সমিতি এস টি এফ আই-এর অন্তর্ভুক্ত সংগঠন হিসাবে। এস টি এফ আই-এর পক্ষ থেকে এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে ঐ সমাবেশে।

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন, কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্মচারী কনফেডারেশন, ডিফেন্স এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, ভারতের স্কুল টিচার্স ফেডারেশন এবং সারা ভারত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এই সংসদ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

ধর্মঘটের অধিকারও আর থাকবে না। শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-মেহনতী মানুষের সংগ্রামের এই গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারটি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তাই আমাদের সুস্পষ্ট দাবি, সরকারী কর্মচারী সহ সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীর ধর্মঘটের অধিকার নিশ্চিত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

আমাদের দাবি শিক্ষাকে রাজ্য তালিকাভুক্ত করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকায় রেখে দিয়েছে শুধু রাজ্যগুলির ওপর খবরদারি করার জন্য। শিক্ষার অধিকার বিল, ২০০৪, শিক্ষার অধিকার বিল, ২০০৫-এর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে রাজ্যগুলির সমর্থনের অভাবে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার সংসদকে না জানিয়ে তাড়াহুড়ো করে মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬ রাজ্যগুলিকে চুপি চুপি পাঠিয়ে দিয়েছে। ঐ প্রস্তাবে বলেছে কেন্দ্র এই সম্পর্কে আর কোনো আইন তৈরি করবে না। রাজ্যগুলিকেই আইন তৈরি করতে হবে। এই বিলে সর্বজনীন আবশ্যিক প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তার কোনো কথারই উল্লেখ নেই। রাজ্যগুলিকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, রাজ্য 'বাজেটে' করের প্রধান এবং প্রথম খাত হবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দ্বিতীয় প্রধান খাত হবে শিক্ষা। বর্তমানে রাজ্যগুলি তার বাৎসরিক ব্যয়-বরাদ্দের ১২ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ ধার্য করে শিক্ষার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান আর্থিক বছরে বরাদ্দ করেছে তার মোট ব্যয়-বরাদ্দের ৪.৩ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকার আজও জিডিপি-র ৬ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করলো না। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে আজ স্বাধীনতার ৬০ বছরেও সকলের কাছে সমমানের শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া গেল না।

উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখন টাকার টোপ ঝুলিয়ে দিয়ে সর্বজনীন শিক্ষার দায়টা রাজ্য সরকারগুলির কাঁধে চাপিয়ে দিতে চাইছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, যে রাজ্য কেন্দ্রের বর্তমান প্রস্তাব পুরোপুরি মান্য করবে না সেই রাজ্য একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্প বাবদ অনুমোদিত ব্যয়ের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাবে, আর যে রাজ্য অক্ষরে অক্ষরে কেন্দ্রীয় প্রস্তাব মেনে নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তারা ঐ প্রকল্প বাবদ অনুমোদিত ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ পাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে। এইসব অপমানজনক কথা রাজ্যগুলিকে শোনানো হচ্ছে।

আমাদের সুস্পষ্ট দাবি হল : অবিলম্বে মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬ কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকেই সর্বজনীন শিক্ষার প্রসারের জন্য সংসদে আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং এরজন্য সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকেই বহন করতে হবে। আমাদের দাবি, দরিদ্র মানুষের কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে 'সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচি'কে আন্তরিকভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০৬-০৭-এর রাজ্য বাজেটে মোট যে ৪৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে তার ৬৬৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে শিক্ষার জন্য। শত সীমাবদ্ধতা ও আর্থিক সংকটের মধ্যেও শিক্ষার জন্য সাধ্যমতো ব্যয়-বরাদ্দ করে চলেছে গত ২৯ বছর ধরে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনমুখী শিক্ষানীতির ফলে এ রাজ্যে সাক্ষরতার প্রসার যেমন ঘটেছে, তেমনই শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়ন ঘটে চলেছে ধারাবাহিকভাবে।

রাজ্য সরকার এখন আর্থিক সংকটও কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে। তাই রাজ্য সরকারের কাছেও আমরা কয়েকটি দাবি রাখছি। যেমন, শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ন্যূনতম ২০ শতাংশ করতে হবে, সর্বক্ষেত্রেই পূর্ণ সময়ের জন্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করতে হবে, কিদ্ওয়াই কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের আরো অগ্রগতি ঘটাতে হবে, প্রবীণ শিক্ষকদের বেতন নবীন অপেক্ষা কম হওয়ার ক্ষেত্রগুলির সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে, চতুর্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ৮-১৬-২৪ ক্রমান্বয়ী বছর অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধির সুযোগ দিতে হবে, প্রতিবন্ধী মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের খরচ দিতে হবে, নতুন শিক্ষাকর্মীদের পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং শূন্যপদে বিনাশর্তে নিয়োগের অনুমতি দিতে হবে, কেবলমাত্র মহার্ঘভাতা প্রাপক বিদ্যালয়গুলিকে গ্রান্ট ইন এডের অধীনে আনতে হবে প্রভৃতি।

গত ২৭শে জুলাই, ২০০৬ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় পার্থ দে মহোদয়কে সমিতির সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে ২৯ দফা দাবি-সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা

হয়েছে। সেই দাবিগুলি 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-এর আগস্ট, ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

এখানে ঐ দাবিগুলির দু'একটির উল্লেখ করছি।

মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সমাজের মূল প্রবাহের সাথে সমসুযোগের ভিত্তিতে অগ্রগতির ধারা উন্মুক্ত করতে হবে। এম এম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক সিনিয়র মাদ্রাসায় নিয়োগ পেলে শুরু থেকেই স্নাতকদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রম পান অথচ ঐ একই যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক জুনিয়র হাই মাদ্রাসা অথবা হাই মাদ্রাসায় নিয়োগ পেলে ৫ বছর পর স্নাতকদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রম পাচ্ছেন ; এটা বন্ধ করে সকলেই যেন শুরু থেকে ঐ বেতনক্রম পান তার ব্যবস্থা করা হোক।

শিক্ষাকর্মীরা বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। এঁদের কাজের নির্দিষ্ট কোনো পরিধি নেই। শুধু তাই নয়, আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাকর্মীদের সুনির্দিষ্ট কোনো করণীয় কর্মতালিকা তৈরি করা হয়নি। বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ বিদ্যালয়ের সময়ের মধ্যে এবং তার বাইরেও এঁদের করতে হয়। পূর্বে একবার অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ সরকারীভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাকর্মীদের (করণিক ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মী) রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় প্রতি ১০ বছর অন্তর উচ্চতর বেতনক্রম দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

কলকাতার উচ্চ আদালতের নির্দেশে রাজ্যের ৩৬টি বি এড এবং প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রের স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই ধরনের নতুন কলেজগুলিকে অনুমোদন দেওয়ার আগে রাজ্য সরকারকেও সতর্ক থাকতে হবে। খুঁটিয়ে দেখতে হবে এরা ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশনের (এন সি টি ই) শর্তগুলি যথাযথভাবে পালন করছে কিনা। এই সমস্ত কলেজের ভর্তি 'ফি'র বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন। ভর্তি ফি'র একটা ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন। এন সি টি ই আইন যাতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সংশোধিত হয়, এন সি টি ই-র অনুমোদনহীন বি এড কলেজের ডেপুটেড শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি যাতে না হয় এবং ৩৬টি বি এড কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যাতে ২০০৫-০৬-এর বি এড পরীক্ষায় বসতে পারে সেজন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অনুমোদিত বি এড কলেজগুলি সেশন শুরু করে দিচ্ছে। সমস্ত শিক্ষক তাতে স্থান পায়নি। অথচ ৫ বছর হয়ে গেছে এবং ঐ কয়েকটি কলেজে স্থান পায়নি এমন শিক্ষকদের যাতে আর্থিক ক্ষতি না হয় তা দেখতে হবে।

ইতোমধ্যে রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে পত্র দিয়ে ৫০ শতাংশ ডিএ মূল বেতনের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। ঐ পত্রে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শারদোৎসবের জন্য একস্‌গ্রেসিয়া হিসাবে চারশত টাকা করে দেবার জন্য দাবি জানানো হয়েছে।

এই সমস্ত দাবি ৩রা নভেম্বরের কেন্দ্রীয় সমাবেশে তুলে ধরা হবে।

ইতোমধ্যে ২২শে নভেম্বর এস টি এফ আই-এর নেতৃত্বে যে ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে দিল্লিতে সংসদ অভিযান হবে সে দাবিগুলি বুলেটিন মারফৎ প্রচার করা হয়েছে এবং সাধারণ সভাগুলিতে এই দাবিগুলি আলোচিত হয়েছে।

৩রা নভেম্বরের কেন্দ্রীয় সমাবেশে পুনরায় ঐ দাবিগুলি প্রচার করে ২২শে নভেম্বরের দিল্লি অভিযানকে সফল করার আহ্বান জানানো হবে। সমিতির পক্ষ থেকে ২০০ জন প্রতিনিধি ঐ অভিযানে অংশগ্রহণ করবেন।

যে ১৬ দফা দাবির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনসমূহ ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৬ দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছে ঐ দাবিগুলির প্রতিও সমর্থন জানাবে সমিতি ঐ সমাবেশে।

৩রা নভেম্বরের কেন্দ্রীয় সমাবেশে ১৪ই ডিসেম্বর দেশব্যাপী ধর্মঘটকে সফল করার শপথ গ্রহণ করা হবে।

সুতরাং এই কেন্দ্রীয় সমাবেশ গুরুত্বপূর্ণ। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে শারদোৎসব ও ঈদ উৎসবের ছুটির আগে ও পরে যে সময়টুকু পাওয়া যাবে তারমধ্যে প্রচার করে এই কেন্দ্রীয় সমাবেশে যাতে ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সমবেত করা যায় তার উদ্যোগ জেলাগুলিকে গ্রহণ করতে হবে। সফল করতে হবে সমিতির এই কর্মসূচিকে।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি জিন্দাবাদ

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-ছাত্র-অভিভাবক ঐক্য জিন্দাবাদ

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

Teachers' Journal

ORGAN OF THE ALL BENGAL TEACHERS' ASSOCIATION

Editor : Sri Bikash Mandal ★ Joint Editor : Smt. Aparna Sanyal (Banerjee)

VOL. LXXXV NO. 9 SEPTEMBER, 2006

Editorial

ELECTION COMMISSIONERS DO NOT HOLD POLITICAL POSTS

Etymologically democracy means the rule of the 'demos' or the people. Democracy does not refer to a particular form of government, it also implies a particular form of society. And equality is the keynote of democracy. According to prevailing concept, the essence of the system of this type of govt lies in the predominance of public opinion in the administration of the affairs of the state. Right to vote is a fundamental right of any citizen.

One of the striking features of our Constitution is the provision for adult suffrage. Indian Constitution prohibits any kind of discrimination. The main function of the Election Commission is superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls and conduct of all elections to the Parliament and to the Legislature of every state – elections to the offices of the President and Vice-President are vested in the Election Commission.

The Constitution of the country provides an independent Election Commission so that all elections may be free and fair – the Commission must also be an impartial agency for the interest of democracy. Independence and impartiality contain deeper significances. In a democratic set up norms and practices have much relevances. But the style of functioning of the Commission in recent years has raised some questions which point to some vital issues.

The experience of the last Assembly Elections of some states speaks that the same attitude was not displayed pertaining to preparation of voters' list, election schedule, conduct of the elections. Huge voters of the state could not exercise their franchise. In the final voters' list the name of many valid voters was deleted. Some stalwart persons could not exercise their democratic right since their names

had been deleted. The matter was informed to the competent authorities before the elections were held. The Commission accepted the truth, but said that the infrastructure was inadequate to correct the electoral rolls within a brief span of time. The name of nearly eight lakh ninetynine valid voters did not find space in the final list of West Bengal. In the election process, it is a mandatory duty of the Commission to ensure that nobody is denied of voting right.

In West Bengal, Observers were appointed much before the commencement of the elections which were held in five phases – it was something unique. The exact role of the Observers was not defined. Some of the Observers had paid scanty respect to the established democratic norms. Those Observers had yielded to almost all the allegations of an political party opposed to LF govt, paid no heed to the issues raised by the left forces. They had displayed their partisan attitudes.

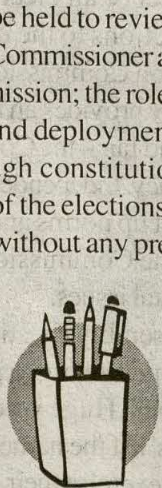
As per the Constitution the subject of law and order is in the state list. But the state govt was not at all consulted. The LF govt was not even apprised of the measures taken for maintenance of law and order during the period of elections. Para-military forces were stationed in the polling booths unable to speak the local language. State police personnel were debarred to enter into the arena of the booths. Such a situation was never witnessed before.

The education suffered a lot owing to unusually lengthy process of elections. School and College buildings were requisitioned to accommodate the para-military forces. The public exams were delayed and as a natural sequel, the publications of the results were much delayed causing great damages to the student community.

The developmental works come to halt for holding by-elections. Two assembly segments of another district are in Katwa constituency of the Parliament and hence, the developmental works can not be carried ahead in Hooghly district as well as in Burdwan. Is there any logic for such prohibition?

A national discussion should be held to review the issues like the appointment and removal of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners; well-defined powers of the Commission; the role and definitions of the Observers; and the issues of law and order and deployment of central forces. And all these issues are to be addressed through constitutional measures so as to maintain transparency and adept conduct of the elections. All the national political parties should seriously think about this without any prejudice.

13 September 2006



Call Of The Association

SIBAPRASAD MUKHOPADHYAY
General Secretary

The members of the Association had participated in the human chain programme accross the state in large numbers in favour of peace against imperialist aggressions on 1 September, 2006. The programme was organised by the Left Front and it had evoked tremendous response among the peace-loving people of the state. The greatest enemy of human civilisation is American imperialism. Under the leadership of George Bush, American imperialism is ceaselessly striving to keep the whole world under its hegemony. All the peace-loving people are to be united through sustained campaigns against the imperialist menace.

Some quarters are raising questions about the standard of education of the state. But reality speaks that all these so-called allegations are just canards. A report published by the NCERT has pointed to the achievements of the state in the field of education. The document opines that the standard of education of class III is much higher than national average. The report records that in class V level of learning in Environment Education, Arithmatic and Language the success rate is 58.65% (fifth place), 60.11% (third place) and 70.67% (third place), whereas the national picture of average is 50.30%, 46.51% and 58.57% respectively. The learners of class VIII standard have shown good level of learning in Science, Mathematics, Social Sciences and Language. The success average of the four subjects is 65.48% (first place), 59.26% (second place), 66.83% (first place) and 74.82% (first place) respectively, while the national average is 40.58%, 38.47%, 45% and 52.42% respectively. Completely govt- aided fifty thousand schools are housed in thirtysix thousand villages. There is no village without a school.

In West Bengal, the teacher-student ratio is 1 : 41.12 in primary stage and in secondary stage it is 1:47.37. Transparency is always maintained in the matter of appointment of teachers. The role of SSC stands as an example to other states.

The L F govt has been widening the scope of education without compromising the quality aspect. The survey report of 'Education For All' has also pointed to the picture of success. The members should actively come forward to bring the out-of-school children into the schools.

The literacy movement had started in 1990. Since then, complete literacy movement is heading forward in 17 districts in full swing and post-literacy programme are on. On International Literacy Day, the State Resource

Centre of West Bengal has won UNESCO award this year. The pro-people education policy of the LF govt has yielded laudable results in respect of enhancement of educational scope and uplift of the standard of education.

The Central govt has already sent Model Bill on Right to Education, 2006 to the states without apprising the Parliament. By doing this, the Central govt wants to shift the burden of universal compulsory free education to the states. The Union govt has said that no further law will be enacted in this regard. The states are to enact laws for this–the Model Bill on Right to Education should act as guidelines. But education is in Concurrent List. The Central govt cleverly wants to evade the responsibility of bearing the burden of compulsory free education of the children – the Central govt can not do it. Education Movement all over the country is to be initiated to force the Central govt to re-consider the decision and to place the Model Bill on Right to Education, 2006 in the Parliament. The Central govt is obliged to enshoulder the financial responsibility of universal education. For all these, Conventions are to be organised in all the districts of the state. Massive campaigns are to be initiated.

On 20 September, as per declared programme of STFI, campaign programmes are to be organised against the anti-people, anti-education policies of the UPA govt throughout the country – this programme will work for arousing awareness among the people and in support of the All India General Strike to be held on 14 December. This programme is to be made successful through organising Convention and Rally in the districts.

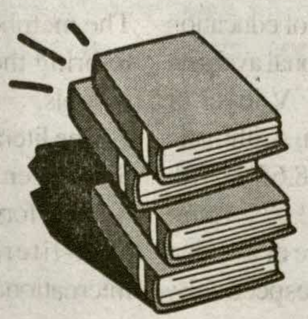
On 22 November, STFI will hold a rally of the member of the Federation to the Parliament with 15 point charter of demands – total plans are to be initiated to make it a grand success.

Central assemblage of the Association will take place on 3 November. Posters and other relevant papers will be sent soon. The units are to be apprised of this programme before the Puja Vacation starts.

A joint meeting, organised by eight leftist teachers-educational employees organisations will be held in Kolkata on 23 September. The topic of discussion is Model Bill on Right to Education, 2006. Relevant papers will very soon be sent.

The call ends bestowing best wishes for the autumnal and Id festivals.

ABTA Zindabad
Teachers-Educational Employees-
Students-Guardians Unity Zindabad



TEXT OF THE PRESIDENTIAL ADDRESS AT THE OPEN SESSION, 49TH ANNUAL GENERAL CONFERENCE, A.B.T.A. HELD ON 14.4.1974

Indian Planning has been pursuing a wrong line all through and as a result, even now when on the completion of the Fourth Plan we are now entering on the Fifth Five-Year Plan, we have not been able to reach the take-off point in development at any sector of our national life. Our economic growth has dwindled virtually to zero and consequently there has been no progress in other sectors of life. Education has suffered most seriously in our Plans where it has not figured as an independent head by itself but has been jumbled up under a miscellaneous Head of Social Services including Health, Culture and other items.

The greatest drawback of our national planning in Education is its rigid centralization. In the preparation of the plan there is no participation of the general public interested in education and educational advancement in the country. The Planning Commission set up by the Central Government generally fixes the allocation under this head in consultation with the Advisers and Secretaries of the Education Department, and the Union Minister of Education in consultation with the Central Advisory Board of Education fixes up the priorities in the wide field of education so far as development is concerned. The allocation made for education has been all through very meagre in a country which demands urgent and immediate expansion of education at all levels and improvement in their quality. When our British masters were forced to quit our country after about two hundred years of imperialistic exploitation the literacy percentage in our country was as low as 10 and the quality of education at all levels was so substandard. In free and independent India it was therefore our imperative task to fight on a war footing against widespread ignorance and illiteracy prevalent, in our country, even to-day only 2.9% of our G.N.P. are being spent on education while even in countries like Ceylon, Burma and Cumbodia more than 4% of the G.N.P. are being invested in the field of education.

In the Fifth Five-Year Plan the total outlay has been declared to be something to the tune of Rs. 53.000 crore and out of this big outlay, the Central Advisory Board of Education recommended an investment of Rs. 3,200 crore for Education. The National Development Council slashed down this recommendation to Rs. 2,250 crore and the Planning Commission reduced it still further to Rs. 1,726 crore meaning an investment of about Rs. 6/- per capita of population per year.

Illiteracy has been mounting at a terrible speed in our country. Out of 55 crore of people living in India about 39 crores are illiterate and this amounts to 50% of illiterate people inhabiting this planet of ours.

In spite of this miserable plight of education in our country, the approach paper to education prepared by the Central Advisory Board of Education, lays down that in the first four Five Year plans emphasis was laid on quantitative

expansion and so in the Fifth Five Year Plan it should be shifted to qualitative expansion for the picked few. In the field of education quality should not be pitted against quantity since they are complementary and integrally connected with each other. This reminds us of the remark made by an American educationist that snow-capped peaks like Mount Everest can raise their heads so high in the long Himalayan range of mountains while it would have been inconceivable in the unbroken plains of Bengal. Greater heights in the field of scholarship and knowledge can be attained only on the background of widespread literacy among the people.

This fact has been lost sight of in the recommendations of the Central Advisory Board of Education regarding the Fifth Five-Year Plan of setting up one Model Primary School in each community block and one Model Secondary School in each district and five per cent of existing colleges into autonomous colleges in a State and some three Universities in the whole country as Universities of comparable International standard. Even to-day there are different types of institutions to cater to the educational needs of different classes of people in this startified society of ours and this will have the formal sanction on a Governmental basis in the new set up recommended by the Central Board of Education of stratification of educational institutions according to the different state of people in the society. This recommendation violates the idea of a common school system for all kinds of people in a country and tries to perpetuate the class distinctions in the society. Better quality of education for the privileged few and lower quality for the teeming millions are obviously the basic idea behind such recommendations. Instead of discrimination and qualitative improvement at all levels of education, our immediate task should be to make elementary education in a common school system upto the age of fourteen free, universal and compulsory and to eradicate illiteracy from our country. This will strengthen the base of education and create the necessary background for qualitative improvement of education. The level of the educational and cultural development of a society is determined by a country's material production; its economic developments for education to expand and improve, the necessary social and political conditions must first exist. Our educational system still bears the legacy of the old colonial system introduced by the British Imperialists only because the production relations in our country have not undergone any fundamental change and it is still under the grip of big bourgeoisie and feudal land-lords. The basic production relationship remaining the same, fundamental changes are retarded in the sphere of education at the superstructure of the social system. As a result, a national system of education which will augment the interest of the masses can not be effectively introduced in our country.

The forces of production consist of (a) the instruments of production and (b) the people with their production experience and skill who use there instruments. In making and using the instruments of production, in acquiring and exercising their production-experience and skill, people enter into relation with one another, whereby they are associated and organised in the process of social production. People enter into relations simple and direct in the actual production process itself. They must need also enter into social relationship and build up the

social superstructure including views and institutions. The national system of education should, therefore, aim at improving the forces of production to accelerate changes towards introducing a new relation of production to supplant this capitalistic cum feudal system of exploitation.

Education should, therefore, be life-centred, production oriented, and science based. A camouflage of the real national system may be attempted from time to time but every such attempt is bound to fail in the absence of congenial social conditions conducive to its successful implementation. Secondary Education should be made polytechnical and more emphasis should be laid on technical and vocational education. But in our country we can not move very fast in the matter. Some attempt was made to expand technical and vocational education on the basis of the manpower needs that will be generated by the successive Five Year Plans for the economic regeneration of the country. Unfortunately, however, whatever little expansion of technical and vocational education was made for outstripped the slow rate of economic growth in our country and the consequent expansion of employment avenues. As a result, the All India Council of Technical Education recommended reduction of the existing provisions of technical education by more than 25% and notwithstanding this reduction, a large number of even highly trained technical personnel are out of employment for want of suitable jobs to utilise their training and skill. So when we think of Polytechnic education and technical and vocational education we must think of corresponding increase in the industrial expansion in our country and this may be possible only when we can bring about necessary changes in the production relationship in our country. The feudal mode of production should be supplanted, monopoly capitalism must be curbed to ensure necessary growth in the economic sector of our country. V.I. Lenin, founder of the Soviet State, in his article entitled, "The Immediate Tasks of the Soviet Regime," observed, "The task of State administration which has now become the first priority of the Soviet regime has this further special feature that – possibly for the first time in the modern history of civilized people –we have to tackle the problem of setting up a form of Government where preference in order of importance will be given not to politics but to economics." This is the need of our country now and socialistic means of production must be introduced in our country before we may think of planning education of national lines. Discussion of details in this connection will not be of much avail unless necessary changes in production relationship in the economic field are ushered in to bring about a revolutionary change in the field of education in our country. It is in such a revolutionary background that we may contemplate effective introduction of education on national, scientific and democratic lines.

Economic planning and Education planning should, therefore, be integrated and form part of one plan. In the background of planning for economic growth, reorientation of education on national, democratic and scientific lines should be planned. Education planning in this context requires a much longer discussion and wider participation by all sections of people.

Collected from Teachers' Journal/April,1974

Left Front Government in the Aim of Changing the Socio-Economic Condition

Dr. Suhas Bhattacharyya

India's socio-economic system is still a capitalist system in the true sense. India's political system is called parliamentary democratic system. The chief columns, on which this parliamentary democracy is set, are large amount of money power (of which a great percentage is black money), muscle power or mafia power and the power of demolishing the democracy of any state through tricks by the party in power at the Centre or the power of increasing pressure on the normal procedures through implementation of rules and regulations. This can't be termed democratic.

'Mondal Commission' was set up in the leadership of Bindheswari Mondal in 1979 after the Janata government came in power at the Centre. The report of the commission was recited in 1980 but the exertion to implement the recommendations was taken ten years later during the V.P. Singh's council of ministers. The statements of the commission included, 'If the slip-knot of the prevalent production relation in not cut through radical land reformation the dependence of the encumbered backward class on the higher class or tribe will continue to go on.' Now, we must know about the ship-knot of this production relation.

The characteristic of the present structure of agricultural production is, persons who are working in higher ranks of various government services, are somehow at a stage or lineage progenies of higher class or of a rich farmer's family. Consequently, the bondage of the ruling machine with the farmer's class or race is quite solid. Therefore, social and political equilibrium generally incline towards the rich farmers and the small farmers become compelle to accept the predominance of the rich farmers to keep their existence. If this structure or situation is considered as the slip-knot of the production relation, the government must take necessary steps to cut this slip-knot. Is this the nationalisation of agricultural production? Does the National Planning Commission have the thought? No.

On the other hand, in the process of land allotment, a few questions may arise in some cases as the transformation of the part condition is not being possible as because the marginal farmers and the small farmers can't keep the land due to ecomomic complexity, though they got lands. So, transference of lands must be prohibited after the land allotments. Can the brightness of the solvency of the farmers' family eradicate the social and the economic inequality if the transference of land is prohibited? No, it can't.

Bank loan, seeds of high price, irrigation department's procrastination in supplying water, being at the doorstep of the government to buy

manure, this all compels the farmer to think otherwise as they got into trouble.

If the guards administer the country keeping the interests of rich people and being in the constitutional limits, it is not possible for them to take up any programme in support of agricultural revolution. That is why, remarkable reservations of the 'Mondal Commission' are not permanent solution.

Independent India's constitution has been built on the base of the substitute structure which was constructed to reform the Indian administrative strategy by the British rulers in 1935. This was worked out by the then constitutional advisor Mr. B.N.Rao, Mr. K.M. Munshi and Mr. Moris Gayar, the chief justice of the Supreme Court, helped him.

So, it is understood that, our constitution is bringing up and carrying with the imperialist tradition. For this reason, an economic framework has been composed on the base of fundamental rights of personal property.

In our country, personal ownership right on production ingredients has been accepted quite certainly. In this connection, proprietors hold the right to enjoy interest and tax and to earn profit sufficiently. So, the right to enjoy land, production and ingredients is in the hands of some limited persons and a huge amount of wealth is piling up in their hands as they possess the right. So, the citizens can't enjoy the life, the freedom, the pleasure equally and social justice is not established to which the constitution is responsible. In this situation only, the stability is maintained and only the riches are enjoying the favourable results yielding from this stability. Left Front government was established in 1977 for the cessation of this stability. Thereafter, Left Front has helped to fulfil the demands of people on definite issues after constituting the council of ministers after participating in every assembly election. That very earnestness will be intact if the council of ministers is constituted in the forth coming days.

We have watched suicides of hundreds of farmers in Orissa, Andhra Pradesh and Maharashtra, the exploitation of labours in the tea-garden in West Bengal, death of unemployed farmers from fasting in villages like Amlasol.

So, our next agenda is the movement bared on the socio-economic development of people. Our demands in the movement are – universal distribution system, right of work and employment for all, lands for farmers, food, clothing, home, education, health, drinking water and good environment for all.

There was universal distribution system in India till 1977 in which everyone had the chance to have subsidised foodgrains. Whatever, this system was rejected in 1977 and a mass-distribution system with definite aim was started. In this system, families were divided into two types, based on different income 'the poor' and 'not poor' – the family below the poverty line (B.P.L.) and the family above the poverty line (A.P.L.). This 'poor' was divided too in 2000, accepting the World Bank's definition of 'poor' and 'very poor'. Now 'the poor' was divided into B.P.L. and 'Antodyay'.

B.P.L. families have to pay twice in case of wheat and at least two-third more money than the Antodyay families who pay three rupees and two rupees respectively for each kilogram of rice and wheat. The government now wants

to close the A.P.L. system.

Sanyukt Morcha government reduced the price of foodgrains by fifty percent by starting a mass-distribution system based on a definite aim in 1996. Then, sale of foodgrains in ration shops increased dramatically. Vajpayee government increased the price of foodgrains in ration by 80 times. Consequently, the whole amount of sale of foodgrains from the ration shops in 2000 became 1 crore 25 lakh ton which was 2 crore ton even a decade ago. The reason was not that the scheduled amount of subsidised foodgrains decreased. In fact, they couldn't because of high price. For that very reason, U.P.A.government has to reduce the price of foodgrains in mass distribution immediately.

In the financial year of 2004-'05, the amount of food subsidy has increased to 25,800 crore rupees. The government shows it as a huge money. They want to reduce it.But, during the same period the government has exempted the corporate sector 5 thousand crore rupees in a year. If we see the expenditure of food subsidy as a part of the Gross Domestic Product, India is one of the lowest countries in terms of ratio among the others in the world. The amount of food subsidy in India is still less than 1 percent of the G.D.P. According to the report of (2001) of the 'Task Force on Employment Opportunities' (the task force regarding employment opportunities), which was set up in 1999 by the present Deputy Chairman of the Planning Commission of the U.P.A. government, Mr. Montek Singh Ahluwalia, was the member of the planning commission during the NDA government regime, the number of unemployed individuals will go to 4 crore 6 lakh 5 thousand in 2007 and 5 crore 5 lakh 23 thousand from 4 crore 6 lakh 5 thousand in 1999-2000 if the labour power increases by 1.8 percent rate yearly. Each year 83 lakh new employment opportunities should be made to eradicate the unemployment which is mentioned in this report. In this respect, the increase in GDP by 6.5 percent yearly would create only 59 lakh new employments. If the yearly rate of increase in GDP be 8 percent and 9 percent, 71 lakh and 82 lakh new employments respectively might by created. Total number of unemployed individuals would go to 2 crore 59 lakh 40 thousand in 2007 if the real GDP and labour power increase by 1.8 percent yearly. Its chief two reasons are – 1. no increase in GDP at the rate expected and 2. no new vacancy at the rate proposed in the planning. To say, the rate of employment has gone down more than the increase in the rate of population and labour power. This is the consequence of implementing the new liberal economy.

2003 account shows, only the 1.6 percent of the total number of tenure-holders in the whole India possess 17.3 percent of arable lands,when 59.3 percent land owners of the total number of tenure-holders possess 15.1 percent of the whole arable lands. Food production – 183.17 lakh ton in 2002-'03. In other words, the country is approaching towards a food crisis. The account of 22 states and union territories upto 31st March, 2004 shows that 73 lakh 35 thousand 908 ekar arable lands were announced as surplus in the whole country. Of this, the government has possessed 64 lakh 96 thousand 897 ekar lands and 54 lakh 31 thousand 277 ekar land have been distributed. Inspite of that, it can't be said that,

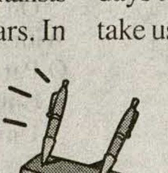
this land has been distributed among the landless. We know, from the newspaper, the incident of an ex-president of a political party, who had managed to have government's land acting as a landless. 92 percent of land of tenure-holders has come in the possession of small and marginal farmers and Vargadars.

The food production of the state in 1976 was 74 lakh ton, which has crossed 150 lakh ton today. At present, our country's population is 108 crore, of which 70 percent is dependent on agriculture somehow. 75 crore of the population or 15 crore families are dependent on agriculture. The total number of arable land in the whole country is 27 crore 66 lakh 50 thousand ekar. If this arable land had been distributed among the 15 crore families depending on agriculture by land reformation, each farmer family could have got 1 ekar 85 shatak or $5\frac{1}{2}$ bighas of land. The Sannyashi revolt, the Fakir revolt, the Neel revolt, the Saontal rebellion, the Tebhaga revolt of Bengal are somehow associated with this struggle for land. All India Farmer's Conference was staged on 11th April, 1936. Primarily, its name was All India Farmer's Congress.

The government could have got 6 crore 20 lakh ekar distributable land among landless or poor farmers if even land reformation had not been done. But the ruling political parties didn't take steps for the sake of keeping interests of the land owners. On the other hand, thousands of lands have been gifted to the native capitalists to make gardens during the last 5-7 years. In the states ruled by the B.J.P., the Congress and the other regional parties জমির উর্দ্ধসীমা আইন has been closed. West Bengal and Tripura are also being pressurised. Farmers, endangered because of less price of their crops, are being forced to make agricultural agreements with the multinational companies. Practically, the chariot of land reformation has started to move backwards.

In this case, more has been subsidized than which is given for the below poverty level. In some cases, the amount of subsidy is Rs. 5 to Rs. 6 each kilogram. In other words, it is exported to foreign countries with a subsidy of 12,500-15 thousand crore rupees.

Not being depressed at the present condition of India, people, who have real faith in the idealism of secularism, socialism and democracy, should come on with dedication in accordance with their self-power to materialise this idealism. Stalin used to say – 'the law of capitalism is to drive the backwards and weak people into a corner,' which is now going on in India too. It must be changed. There was Left Front in West Bengal in the past. Left Front has come in 1977. We will certainly protect it so that, socialist, economic process could be established. Because, it has no other way. We have watched that right and scientific principles taken up by the Left Front government have directed us to the right way. In the forth coming days too this right decision and planning will take us to the definite goal.



Poem

ODE TO THE SHEHNAI LORD

[On the demise of Bismillah Khan, the Shehnai-maestro (1916-2006)]

S.K. Samsuddin, Asstt. Teacher
Jamar K.C.P. High School, *Burdwan*

(1)

You play and Valmiki awakens
In his antic den,
Tansen with his sonorous lyre
In Akbar's reign.
You gently drive your holy air
Into thy auspicious pipe,
It illicits a solemn sound
From its sacred fountain
From whose deeps springs
The holy jom-jom water of Kaba Sharif,
As if, a holy sage is piping
On a yonder cliff.

(2)

You smile, Diana smiles.
Your tender lips quiver
Upon thy breathing pipe,
The Lord Shiva uncoils his hair –
At once a thousand rills rush
Down the Himalayan dales
To inundate our golden fields,
Our verdant vales.
A child, a father and a god
All caught in one –
A form divine in multifacets
Manifested by a metal rod.

(3)

Your palms hold India's heart,
Your cheeks inflated, lungs expanded
Hold our breath from the northern
Borne to the extreme southern end.
You play – our ancient sage,
Our heavy hearts drink upon thy art,
Your soul soaring heavenwards
Merged with an unknown star,
But the melting music of sublime
Thoughts sparkle upon us as a pearl
To demolish the apartheid wall
That hurls us into the fire of hell
Of caste, creed, sect and sex.
O Mediator of melodies!
We'll pursue thy track,
Thy sweet musical cadence,
Thy heart's sweet fragrance,
Thy power of vernal strains,
Thy sitar-violin-shehnai jugalbandi
To calm the sallies of our souls.

(4)

O parent of sweet solemn notes!
Dispel my gloom; scatter my evils,
O Master of tempestuous empyreal sounds!
O the Mahatma Gandhi of classical music!
O The Heralder of the first dawn of our land!
O the Polestar of Hindustan!
The temple, the mosque, the ever-infant!
O the Promoter of amity and peace!
Thy land-riot-ravaged, come and see.
I'm bleeding, come and tranquillize me.

(5)

Why you leave us forlorn
Here to wail and mourn?
Who'll crack the dawn
On the Balaji Ghat of the Ganga
With his riyaz of Hindustani raga?
O Parent! O God! O Saint! O Boy!
Unlock thy iron-gate of joy,
Unveil the casket of gold
To make us pay homage
To our departed sage.

ALL INDIA STATE GOVERNMENT EMPLOYEES' FEDERATION

KARMACHARI BHABAN
10 A, SHANKHARITOLA STREET, KOLKATA-700 014

Dear Comrade,

You will find in this Circular the details of our Programme of ***March to Parliament*** on 18 August, 2006. This is a very important document.

The entire contents of this Circular specially the discussion with the Prime Minister should be widely reported to the employees and teachers at all levels.

Glorious March to Parliament

More than thirty thousand employees in the Govt. sector and teachers organized a very successful ***March to Parliament*** at Delhi on 18 August, 2006 demanding total scrapping of Pension Privatization Bill (PFRDA Bill). Jointly All India State Government Employees' Federation (AISGEF), Confederation of Central Govt. Employees & Workers, All India Defence Employees Federation, School Teachers' Federation of India, All India Federation of University & College Teachers' Organizations – the trade unions under the Govt. sector. From AISGEF, huge number of employees and their leaders almost from all states participated not only with festoon and banners but even with body posters also. The colourful and slogan shouting demonstration started from Jantar-Mantar at Parliament Street at 10-30 AM on 18 August '06 and marched towards the Parliament and stopped by the heavily guarded police barricade.

From an impromptu dias on a Truck fitted with loud speakers and a big banner – ***March to Parliament*** the leaders of different organizations addressed the huge gathering.

Com. Sukomal Sen, General Secretary, AISGEF; Com. S.K. Vyas, Secretry General, Confederation of Central Govt. Employees & Workers; Com. C.C.Pillai, President of Confederation; Com. Sailo Bhattacharya, General Secretary AIDEF, Com. Rajendran, General Secretary, STFI; Dr. V.K. Tewari AIFUCTO and various other leaders addressed the gathering. Among them, from AISGEF, were Com. R.C. Jagga, Manjul Das, Asha Kalra, Girindra Mishra, R. Muthusundaram, Com. Smarajit Roy Chowdhury, Com. U.S. Rathore, Com. Punam Chand Rathi, Com. Sucha Singh Khatra, Com. Surendra Chowdhury, Com. Chandra Sekhar Tewari, Com. Ashesh Deb Roy, Ashok Thool, Com. B.L. Khuswa and Com. Janardan Reddy who addressed the gathering.

Extremely anti-employee nature of the Pension Bill

The leaders of AISGEF, Central Govt. Employees' Confederation, STFI, AIFUCTO and AIDEF told the gathering that the Govt. of India was adamantly trying to get the Bill for Privatization of Pension passed in the Parliament at this monsoon session in particular. Actually the Pension Bill (PFRDA) is the brainchild to NDA Govt. but this Govt. also ideologically

fully unanimous with the purpose and content of the Bill. It is only for the opposition of the Left parties, the Bill could not be passed as yet. But the Govt. has not abandoned all hopes to get the Bill passed. The main purpose of the Bill is to hand over the huge money to be deducted from the employees' contribution and Govt's matching grant to private financial players – indigenous or foreign and then in turn to invest the huge money in Share Market to boost and make it bullish.

In the existing scheme, which is a 'Defined Benefit' scheme, employees can know before hand how much pension he/she will be entitled to after retirement. But the proposed Bill is a 'Defined Contribution' with 10% cut in salaries from every employees for depositing the amount to a private company for investing it in stock market. It means employees will come to know how much they will have to contribute and would not know how much they will get. As a result the employees will have no guarantee to get any pension at all, though every month they will suffer a huge wage cut. In fact, for the so-called pension fund crisis, Govt. is solely responsible, as the Govt. did not care for building any pension fund from its budgetary allotments.

Discussion with the Prime Minister

The employee leaders consisting of Com. Sukomal Sen, General Secretary and Com. R.G. Karnik, Chairman, AISGEF; Com. S.K. Vyas, Secretary General Central Govt. Employees' Confederation; Com. K.K.N. Kutty Central Govt. Employees' Confederation; Com. Sailo Bhattacharya, General Secretary, AIDEF; Com. Kartick Mandal, President, STFI and Dr. V.K.Tewari, General Secretary, AIFUCTO met the Prime Minister on 18.8.2006 during the ***March to Parliament*** and had discussion with him for more than 30 minutes. Com. Basudev Acharya, MP and Com. Chittabrata Majumdar, MP, who is also General Secretary, CITU accompanied the delegation. The delegation presented a Memorandum to the Prime Minister strongly opposing the Bill.

While the delegation demanded withdrawal of the new Pension Bill, the Prime Minister told that in that case the Govt. would run into bankruptcy. The delegation reminded the Prime Minister that the existing pension scheme is in vogue since 1920 and so why suddenly such crisis arose is not explainable. Obviously under the pressure of World Bank and IMF the Govt. is trying to privatize the pension, which the Prime Minister disagreed.

The delegation reminded the Prime Minister that it is strange that without any Parliamentary sanction by an Act, the Govt. had introduced the new scheme for the new recruits since 1.4.2004 and the Govts are cutting 10% wage of these employees and they are not entitled to any GPF benefit. The delegation said that this is quite unlawful. The Prime Minister explained that this was done by NDA Govt. and unless the Bill is passed, the money deducted from the employees' salary cannot be properly utilized and that was another problem. The delegation then suggested that for the new recruits GPF account may be opened and the money accumulated can be transferred to the GPF account and then problem may be solved.

Prime Minister suggested that when the employees have objection to investment of the money in stock market, then as an alternative the money can be deposited with mutual fund or any Govt financial company.The delegation explained that this was an unacceptable

suggestion as in that case; the employees' pay-deduction will continue and mutual fund also invest the money in Share Market and the Govt. will not also give any guarantee for full pension. This is not at all acceptable to the employees.

The Prime Minister in a tone of despair said that he discussed the Bill with Left party leaders and they said that this new scheme is not saleable to the unions. Then the delegation added that it is not only unsaleable to the unions, the scheme is not at all acceptable to the employees. So, there is no body in the employees' community to buy this scheme and the Govt's proposal is really on unsaleable product.

Prime Minister said that all over the world, this scheme is being introduced. Delegation pointed out that against that attempt for introduction worldwide resistance is also continuing and all Govts are facing difficulty in introducing it. Delegation further pointed out that it is not only the tremendous opposition by the employees, many world famous economists are also strongly criticizing the scheme – the foremost among them is Dr. Joseph Stiglitz, a noble prize winner economist, who was earlier Chief Economic Advisor of US President Bill Clinton and later became Senior Vice President of World Bank and its Chief Economic Advisor and a friend of the Prime Minister himself. Delegation told that Dr.Stiglitz even warned all the Govts, by implication India Govt. also, that any Govt. introducing this scheme – the brainchild of President Bush, would face the same kind of economic collapse as Argentina had faced in 2001.

At this the Prime Minister smiled and said that he would have a look into our memorandum and will have further talks with us.

It appeared that pressure of our movement is working on the Prime Minister and the Govt. and so this pressure has to be intensified so that the Bill is ultimately abandoned.

On coming back from the deputation with Prime Minister, Com. Sukomal Sen reported to the waiting masses the main contents of the discussion with the Prime Minister and he and other leaders announced that this struggle against Privatization of Pension would continue and if even after this mighty demonstration and meeting with the Prime Minister, the Govt. dares to take up the Bill in Parliament for passing, the employees and teachers all over the country would organize total strike and the administration would come to a deadlock.

The participants in the demonstration gave a thunderous ovation at the above declaration for preparation of the strike.

Thereafter, the leaders on the dias made a bonfire of the PFRDA Bill with reverberating slogans from the marchers –Burn the Pension Privatization Bill.

Finally, the All India State Government Employees' Federation extends its warm greetings to all its affiliates and other organizations for making the programme a resounding success.

With greetings,

Comradely yours,
SUKOMAL SEN
General Secretary

23 August, 2006

To
All N.E. Members including Women Sub-Committee Members

ORGANISATIONAL REPORT

KOLKATA

The Annual General Meeting of Bhabanipore Zone of ABTA under the South Kolkata Sub-Division of Kolkata Dist. was held on 2nd September, 2006 at South Suberban School (Main). The prize distribution ceremony was also organised before commencement of the AGM. The meeting was presided over by Sri Amaresh Chakraborty, president of the Zone. The meeting was inaugurated by the assistant secretary of the sub-division Sri Subrata Chatterjee. Total Seventy Six Teaching and non-Teaching members participated the meeting. Eight of them spoke on the report. The printed report and statement of accounts were placed by the secretary Sri Maya Shankar Jha and the treasurer Sri Prafullya Chandra Panda. The members mainly spoke on anti-education role of UPA govt., difficulties and annamalies of H.S. syllabus, anxiety over gradation system of H.S. Exam., Examination system of class XI, Environment Education, staff shortage in the schools, propaganda of STEA about retirement age etc. Lutful Alam, working committee member of ABTA was the observer. He explained the present situation of India as well as the role of imperialist country and pressure of America on India and other countries to destabilize the economic position of the 3rd World Countries. He also explained, role of Left Front govt. and their education policy. Vote of thanks was given by the president Sri Amaresh Chakraborty.

Board Circular

West Bengal Board of Secondary Education

77/2, Park Street, Kolkata-700 016

Circular No : 715/O.S.D

Date : 24.08.06

NOTIFICA TION

From : The Secretary,
West Bengal Board of Secondary Education
77/2, Park Street, Kolkata-700 016

To : The Heads of recognised non-Govt. (Aided & Unaided) Secondary Schools

Sub : Conduct of Elecion for Constitution/Reconstitution of the Managing Committee in some secondary schools of the districts involved in the bye-election to be held on 16.9.06.

In exercise of the power conferred by Sub-Section 2 of Section 28 of the West Bengal Board of Secondary Education Act, 1963, (W.B. Act of 1963) the President is pleased to notify that in view of the declaration of bye-election to be held on 16th September, 2006 in Purulia (Purulia), Katwa (Burdwan), Malda (Malda) Lok Sabha Constituencies and in Bongaon (North 24-Pgs.) Assembly Constituency, the entire process of constitution or reconstitution of the Managing Committees of those Secondary Schools situated in the aforesaid districts (namely, Purulia, Burdwan, Malda and North 24-Pgs.) and also the adjoining districts involving any segment of Lok Sabha/Assembly Constituencies shall remain suspended upto 19th September, 2006, i.e. the date of declaration of result of bye-election.

This process may be started after 19th September, 2006 and election may be held on the basis of programme fixing the date of election after 19.9.2006 as per normal rules and procedure.

In case where elections of different categories other than office bearer, have already been completed prior to the declaration of dates for ensuing bye-election, the election of office bearer shall stand deferred upto 19.9.06 and shall be completed within 31.10.2006 in terms of Board's Notification No. S/OSD/50 dated 6.3.2006.

The above order is hereby issued without prejudice to any contrary order from the Hon'ble Court.

All concerned are being informed.

Sd/- **Illegible**
SECRETARY

Memo No................ Date. ....

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Principal Secretary, School Education Department, Govt. of West Bengal, Salt Lake City, Kolkata - 700 091.
2. The Director of School Education, West Bengal, Salt Lake City, Kolkata - 700 091.
3. The District Inspector of Schools (SE), Purulia, Malda, Burdwan and North 24-Parganas, for circulation of recognised Institutions of the Board.
4. The Deputy Secretary (Academic) for publication in the next issue of the "Parsad Varta."
5. The all recognised Secondary Teachers' Organizations.
6. O.S.D., WBBSE
7. P.A. to President, WBBSE
8. P.A. to Secretary, WBBSE
9. Meeting Section, WBBSE
10. All Deputy Secretaries, WBBSE
11. All Assistant Secretaries, General Section, WBBSE
12. All Regional Officers, WBBSE (Kolkata, Burdwan, Medinipur & North Bengal)
13. All Board Members, WBBSE
14. All Law Supervisors, WBBSE

Sd/- Illegible
Secretary

ALL BENGAL TEACHERS' ASSOCIATION

Satyapriya Bhaban

P-14, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata – 700 013

To

The Heads of all Higher Secondary Institutions in West Bengal

Dear Friends,

The All Bengal Teachers' Association will organise the Inter-School Evaluation Programme for the Students of Class -XII, who will appear for Higher Secondary Examination for the year 2007 also,

The Association hopes that an assessment of the students on the basis of its papers will help correct evaluation of their achievements.

We would, therefore, appeal to the Heads of all Higher Secondary Institutions to join the Inter-School Evaluation Programme of Students for Class-XII organised by the Association. Necessary information in this respect is given below :

(1) All the Schools and Colleges joining the Evaluation will have to follow a common programme as given in next page.

(2) Orders in enclosed printed form are kindly to be communicated to the Office of the Association so as to reach it on or before the 26th September, 2006 under signature of the Head of the Institution with seal of the Institution concerned and postal address clearly be indicated.

(3) The number of Students in each Language and Elective Subjects are to be clearly indicated in the orders so placed.

Yours fraternally,

Sibaprasad Mukhopadhyay

General Secretary

Dated : 5th August, 2006

SUBSCRIPTION PAYABLE

(Excluding Postage Charges)

Papers of all subjects for Every Student **Rs. 8/- (Eight) Only**

N.B. - To avoid postal disturbances, schools situated in the district of Kolkata, South & North 24 Parganas, Howrah, Hooghly, Purba & Paschim Medinipur and Nadia are requested collect their question packets from the Central Office and schools situated in North Bengal, Murshidabad, Purulia, Bankura, Birbhum and Burdwan are requested to collect their packets from the District Branch Office of A. B. T. A.

(Programme overleaf)

A. B. T. A. Higher Secondary Evaluation Programme, 2006

(12 CLASS)

PROGRAMME

Date	From 11 A.M. to 2 P.M.
21.11.2006	Bengali (Group-A), Hindi (Group-A), Urdu (Group-A) Nepali (Group-A)
22.11.2006	English (Group-B)
23.11.2006	Chemistry, Accountancy
24.11.2006	Philosophy
25.11.2006	Physics, Nutrition, Education, Business Organisation & Management
27.11.2006	Biological Sciences, Home Management & Home Nursing, Business Economics Including Business Mathematics.
28.11.2006	Statistics, Sanskrit, Agronomy
29.11.2006	Economics, Music
30.11.2006	History
01.12.2006	Psychology, Geography, Economic Geography
02.12.2006	Political Science, Sociology
04.12.2006	Mathematics
05.12.2006	Computer Science, Modern Computer Application

A. B. T. A. Inter-School Evaluation Programme, 2006

FOR STUDENTS OF CLASS-X

PROGRAMME

11.00 A.M. to 2.00 P.M.

21.11.2006	First Language (First Paper) Bengali / Hindi / Urdu / Nepali (Written Test 90 Marks)
22.11.2006	First Language (Second Paper) Bengali / Hindi / Urdu / Nepali (Written Test 90 Marks)
23.11.2006	English (Second Language) (Written Test 100 Marks)
24.11.2006	Life Science (Written Test 90 Marks)

11.00 A.M. to 2.00 P.M.

25.11.2006	Physical Science (Written Test 90 Marks)
27.11.2006	Geography (Written Test 90 Marks)
28.11.2006	History (Written Test 90 Marks)
29.11.2006	Mathematics (Compulsory) (Written Test 100 Marks)
30.11.2006	Additional Subjects (except WPS) (Written Test 100 Marks)

Any one of the following Additional Subjects

Academic :- Additional Mathematics / Physics / Chemistry / Biology / Mechanics / Geography/ Logic / Psychology / Pisciculture / Business Method and Correspondence / Book Keeping / Elements of Economics and Civics / Home Science including Home Nursing / Sanskrit / Music / Bengali (B-Level) / Computer Application / Elements of Agriculture and Horticulture.

Oral Examination on 02.12.2006

First Language	20 Marks
Physical & Life Science	10 + 10 = 20 Marks
History	10 Marks

SUBSCRIPTION PAYABLE

(Excluding Postage Charges)

Papers of all Subjects for Every Student Rs. 8.00 (Eight) Only

Sibaprasad Mukhopadhyay
General Secretary
All Bengal Teachers' Association
Satyapriya Bhaban
P-14, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata - 13

Dated : 5th August, 2006

A. B. T. A. Inter-School Evaluation Programme, 2006

(CLASS-X)

PROGRAMME

MORNING SET

06.45 A.M. to 09.45 A.M.

21.11.2006	First Language (First Paper) Bengali / Hindi / Urdu / Nepali (Written Test 90 Marks)
22.11.2006	First Language (Second Paper) Bengali / Hindi / Urdu / Nepali (Written Test 90 Marks)
23.11.2006	English (Second Language) (Written Test 100 Marks)
24.11.2006	Life Science (Written Test 90 Marks)

06.45 A.M. to 09.45 A.M.

25.11.2006	Physical Science (Written Test 90 Marks)
27.11.2006	Geography (Written Test 90 Marks)
28.11.2006	History (Written Test 90 Marks)
29.11.2006	Mathematics (Compulsory) (Written Test 100 Marks)
30.11.2006	Additional Subjects (except WPS) (Written Test 100 Marks)

Oral Examination on 02.12.2006

First Language	20 Marks
Physical & Life Science	10 + 10 = 20 Marks
History	10 Marks

SUBSCRIPTION PAYABLE

(Excluding Postage Charges)

Papers of all Subjects for Every Student Rs. 8.00 (Eight) Only

Sibaprasad Mukhopadhyay
General Secretary
All Bengal Teachers' Association
Satyapriya Bhaban
P-14, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata - 13

Dated : 5th August, 2006

A. B. T. A. Inter-High Madrasah Evaluation Programme, 2006

FOR STUDENTS OF CLASS-X

PROGRAMME

11.00 A.M. to 02.00 P.M.

21.11.2006	First Language (First Paper) Bengali (Written Test 90 Marks)
22.11.2006	First Language (Second Paper) Bengali (Written Test 90 Marks)
23.11.2006	Second Language – English (Written Test 100 Marks)
25.11.2006	Mathematics (Compulsory) (Written Test 100 Marks)
27.11.2006	Physical Science (Written Test 90 Marks)

11.00 A.M. to 02.00 P.M.

28.11.2006	Life Science (Written Test 90 Marks)
29.11.2006	History (Written Test 90 Marks)
30.11.2006	Geography (Written Test 90 Marks)
02.12.2006	Advance Paper in Arabic (Written Test 100 Marks)
04.12.2006	Third Language – Arabic (Written Test 100 Marks)
05.12.2006	Additional Subjects (Written Test 100 Marks)

Oral Examination on 06.12.2006

First Language	20 Marks
Physical Science	10 Marks
Life Science	10 Marks
History	10 Marks

SUBSCRIPTION PAYABLE

(Excluding Postage Charges)

Papers of all Subjects for Every Student Rs. 8.00 (Eight) Only

Sibaprasad Mukhopadhyay
General Secretary
All Bengal Teachers' Association
Satyapriya Bhaban
P-14, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata - 13

Dated : 5th August, 2006

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

সত্যপ্রিয় ভবন

পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলকাতা-১৩

তারিখ : ১৮.০৫.'০৫

সাথী,

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির 'সত্যপ্রিয় ভবন'-এ (পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩) থাকার নিয়মাবলী সদস্যদের অবগতির জন্য নিচে দেওয়া হলো ঃ

নিয়মাবলী

- প্রতিদিন মাথাপিছু রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাবদ ২০, (কুড়ি) টাকা কেন্দ্রীয় দপ্তরে জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করে সদস্যগণ কেন্দ্রীয় সমিতি ভবনে থাকতে পারেন।
  যখন সমিতির ওয়ার্কিং ও ফাইনান্স কমিটি এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে তখন এই সুযোগ দেওয়া সমিতির পক্ষে সম্ভব হবে না।
- কেবল সমিতির সংগঠন বিষয়ক কাজে, বিদ্যালয়ের কাজে, গণসংগঠনের কাজে এবং চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এলে সদস্যগণ কেন্দ্রীয় সমিতি ভবনে থাকতে পারেন। তবে কখনোই সাত দিনের বেশি থাকতে পারবেন না।
- অসুস্থ সদস্য এবং তাঁর সাহায্যকারী পরিবারের সদস্য/সদস্যাগণ কেন্দ্রীয় সমিতি ভবনে থাকতে পারেন।
- উপরিউক্ত প্রতিক্ষেত্রে জেলা সম্পাদকের অথবা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর কোন সদস্যের অথবা মহকুমা সম্পাদকের স্বাক্ষরিত (সীল সহ) কেন্দ্রীয় সমিতি ভবনে থাকতে দেওয়ার জন্য সুপারিশপত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরে পেশ করতে হবে। যাঁরা থাকবেন তাঁদের থাকার কারণ, নাম ও সংখ্যা পত্রে উল্লেখ করতে হবে।
- সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, ওয়ার্কিং ও ফাইনান্স কমিটির সদস্য এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যগণের ক্ষেত্রে কোন সুপারিশ ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ টাকা লাগবে না।
- সমিতির কেন্দ্রীয় ভবনে থাকাকালীন কোথাও গেলে রাত ৯-৩০ মিনিটের মধ্যে সমিতি ভবনে ফিরে আসতে হবে।

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

প্রকাশনার তারিখ ঃ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ Registered – SSRM/KOL/RMS/WB/RNP-225/2004-06

Printed by Sibaprasad Mukhopadhyay on behalf of All Bengal Teachers' Association, at the Ganashakti Printers (P) Ltd. 33, Alimuddin Street, Kolkata-700 016 and also Published by him at the A.B.T.A. Office, P-14, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-700 013.